প্রথম অধ্যায়
মানব ভূগোল

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ তানজিম বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ খ্যাত দেশের বাসিন্দা। সে সূর্যোদয়ের দেশে পড়াশুনা করতে গিয়ে সে দেশের বসতির ধরন ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা দেখে বিমোহিত হয়।

◀ *শিখনফল: ৩ [চা.বো., রা.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো., ২০১৭]*

ক. পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম মহাদেশের নাম কী? ১

খ. রাজনৈতিক অঞ্চল বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তানজিমের ভ্রমণকৃত দেশের বসতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তানজিমের নিজ দেশ ও ভ্রমণকৃত দেশের শিল্প পরিবেশের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশের নাম আফ্রিকা।

খ রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে এমন ভূখণ্ডই রাজনৈতিক অঞ্চলের মুখ্য উপাদান। এখানে ভূখণ্ড বলতে কেবল স্থলভাগকে বোঝায় না বরং জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষের (space and universe) বিভিন্ন পরিসরকে বোঝায়। সুতরাং রাজনৈতিক পরিচিতি রয়েছে ভূপৃষ্ঠের এমন অংশবিশেষকে রাজনৈতিক অঞ্চল বলে। যেমন: ভুটান, যুক্তরাষ্ট্র।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তানজিমের ভ্রমণকৃত দেশটি সূর্যোদয়ের দেশ হিসেবে পরিচিত অর্থাৎ জাপান। পৃথিবীর শিল্পোন্নত এ দেশটিতে নগর বসতির প্রাধান্য দেখা যায়। এরূপ বসতির বৈশিষ্ট্য–

i. অধিকাংশ অধিবাসী প্রত্যক্ষ ভূমি ব্যবহার ব্যতীত অকৃষিকাজে নিয়োজিত। যেমন- চাকুরি।

ii. অধিবাসীরা দ্রব্যাদির শিল্পজাতকরণ, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, প্রশাসন, শিক্ষা ও সেবা সংক্রান্ত প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত।

iii. পাকা রাস্তাঘাটের প্রাধান্য রয়েছে।

iv. পাকা দালানকোঠা ও আকাশচুম্বী অট্টালিকার অস্তিত্ব।

v. বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, নার্সিংহোম, পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্রের উপস্থিতি।

v. বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য বসতি নানা অংশে বিভক্ত। যেমন– কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা (CBD)।

ঘ তানজিমের নিজ দেশ হলো বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ খ্যাত বাংলাদেশ। তার ভ্রমণকৃত দেশ হচ্ছে জাপান।

বাংলাদেশ ও জাপানের শিল্প পরিবেশের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বস্তুত জাপান পৃথিবীর অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ উন্নয়নের নিমিত্তে শিল্পকে প্রাধান্য দিচ্ছে, যদিও দেশটি কৃষিপ্রধান। অন্যদিকে জাপানের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ স্থান পার্বত্যভূমির অন্তর্গত। [সূত্র: Wikipedia] সেখানে লোকসংখ্যার তুলনায় কৃষিকাজের উপযোগী ভূমির পরিমাণ কম। এ দুই ভৌগোলিক উপাদান (জনসংখ্যা ও ভূমির অপর্যাপ্ততা) জাপানকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করেছে। এছাড়াও এখানে রয়েছে শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ। যেমন– জলবিদ্যুৎ শক্তি, কঠোর পরিশ্রম উপযোগী নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, সমুদ্র সান্নিধ্য, ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের সহযোগী হিসেবে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প, দক্ষ কারিগর, সুলভ শ্রমিক, কারিগরি জ্ঞান প্রভৃতি।

বাংলাদেশ শিল্পের প্রসারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। কিন্তু অধিক জনসংখ্যা থাকলেও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে দেশ পিছিয়ে রয়েছে। উপরন্তু কৃষি অনুকূল ভূমি ও জলবায়ুর কারণে দেশটি কৃষিপ্রধান। তাই শিল্প স্থাপনের যথেষ্ট ভূমি এখানে সহজপ্রাপ্য নয়। এছাড়া খনিজ ও শক্তি সম্পদের অপর্যাপ্ততাও রয়েছে। তবে এতো প্রতিবন্ধকতার পরও দেশটি বর্তমানে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পে দেশটি ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছে। দেশটির শিল্পের বিকাশে অনুকূল যে পরিবেশ রয়েছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ, সমুদ্র পরিবহন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ, সুলভ শ্রমিক ইত্যাদি।

প্রশ্ন ▶২ সুতপা ঘোষ ভারত থেকে পার্শ্ববর্তী একটি দেশে মেডিকেল কলেজে পড়তে গিয়েছে যার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান।

◀ *শিখনফল: ৪ [সকল বোর্ড-২০১৬]*

ক. মানব ভূগোল কাকে বলে? ১

খ. মানব ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুতপার পড়তে আসা দেশের প্রশাসনিক বিভাগগুলো মানচিত্রে প্রদর্শন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইঙ্গিতপূর্ণ দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের কর্মকাণ্ড ও গুণাবলির সাথে ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি ও বিন্যাস নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে মানব ভূগোল বলে।

খ মানব ভূগোল পাঠের মাধ্যমে মানব সমাজের স্থানভিত্তিক বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন সংস্কৃতি, পরিবেশ, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক, জীবনযাত্রা, জনস্যংখ্যার অভিগমনের প্রকৃতি ও ধরন, অর্থনীতি, জনমিতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। তাই মানব ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ সুতপার পড়তে আসা দেশটি হলো বাংলাদেশ।

শাসনকাজের সুবিধার জন্য কোনো একটি দেশকে কয়েকটি প্রশাসনিক ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশকেও শাসনকার্যের সুবিধার্থে ৬৪টি জেলা ও ৮টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

নিচে বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগগুলো মানচিত্রে প্রদর্শন করা হলো—

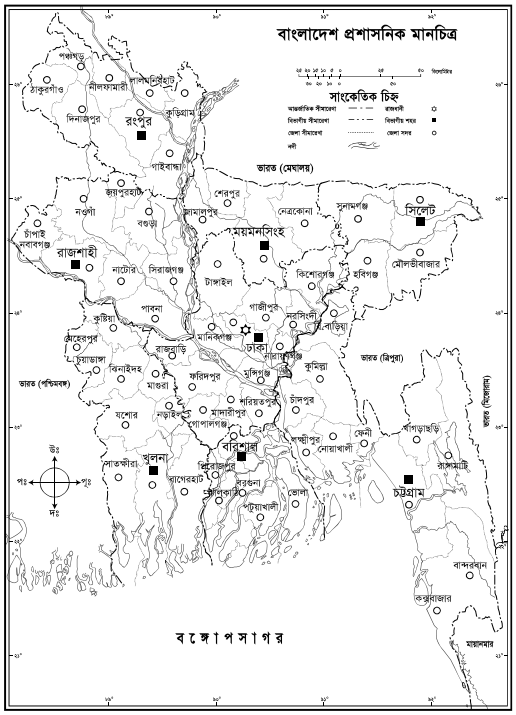

চিত্র: বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্র

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দেশটি হলো বাংলাদেশ। কারণ এটি ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ এবং এর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এটি বিশ্বের বৃহৎ ব-দ্বীপগুলোর মধ্যে অন্যতম। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী যথাক্রমে পশ্চিম-উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বাংলাদেশের মধ্যে প্রবেশ করে বিশাল বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে। তাই বাংলাদেশের অবস্থানকে সমুদ্র উপকূলীয় অবস্থান বলা যায়।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মায়ানমার এবং এক দিকে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা মিজোরাম রাজ্য এবং মায়ানমার; পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশ ২০°৩৪′ হতে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৮৮°০১′ হতে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রশ্ন ▶৩ 'ক' কলেজের আশপাশে এক সময় কিছুই ছিল না। বিগত ১০ বছরের মধ্যে সেখানে অনেক আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এতে করে কলেজের একাডেমিক পরিবেশ প্রায়ই বিঘ্নিত হয়, যা সকলকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

◀ *শিখনফল: ১*

ক. মানব ভূগোল বলতে কী বোঝ? ১

খ. মানব ভূগোলের ধারণা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণনা মানব ভূগোলের বিষয়বস্তুর সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মানব ভূগোলের সব শাখা নির্দেশ করে না-মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো নিয়ে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়, তাই হলো মানব ভূগোল।

খ মানব ভূগোলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে ভূগোলবিদগণ দেখিয়েছেন মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের উপর নির্ভরশীল। যথা: ১. নিমিত্তবাদ ২. সম্ভাবনাবাদ।

নিমিত্তবাদ পরিস্থিতি সম্পর্কীয় মতবাদ, যেখানে প্রকৃতি নির্ধারণ করে মানুষ প্রকৃতির কোন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবে। আর সম্ভাবনাবাদ সেই পরিস্থিতি সম্পর্কীয় মতবাদ, যেখানে মানুষ নির্ধারণ করে প্রকৃতির কোন সম্ভাবনাকে সে কাজে লাগাবে।

গ উদ্দীপকের বর্ণনা মানব ভূগোলের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত। কেননা মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু হলো— মানুষ, পরিবেশ এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতা; যা উদ্দীপকের বর্ণনায় তুলে ধরা হয়েছে।

মানব ভূগোলে মানুষ হলো প্রধান ভৌগোলিক নিয়ামক। মানুষ তার প্রয়োজনে স্থানভেদে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তাই মানব ভূগোলের অন্যতম আলোচনার বিষয়বস্তু হলো মানুষ। অতঃপর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়, তা প্রধানত নির্ভর করে পরিবেশের পার্থক্যের ওপর। মানুষ সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণের জন্য তার চারপাশের উপযোগী প্রাকৃতিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কাজে লাগায়। যা মানব ভূগোলের অন্যতম বিষয়বস্তু। উপরন্তু পরিবেশের প্রভাব মূলত মানুষের সংস্কৃতি দ্বারা নির্দেশিত হয়। মানুষ তার সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিশ্লেষণ করে এবং নিজ প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত কলেজ ও এর আশেপাশে দশ বছরে গড়ে ওঠা আবাসিক ও বাণিজ্যিক পরিবেশ মানব ভূগোলের আলোচিত বিষয়। সুতরাং বলা যায়, মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু উদ্দীপকের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে মানব ভূগোলের বিস্তৃত শাখার মধ্যে কয়েকটি বর্ণিত হয়েছে, সব নয়। মানব ভূগোলে যেসব শাখা আলোচনা করা হয় তার মধ্যে রয়েছে- সাংস্কৃতিক, জনসংখ্যা, বসতি,

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, আঞ্চলিক, সামাজিক, নগর, পরিবহন, চিকিৎসা, প্রশাসনিক, জেন্ডার ভূগোল ইত্যাদি। মানব ভূগোলের এসব শাখাগুলোর মধ্যে উদ্দীপকে যে শাখাগুলো নির্দেশ করে তা হলো– সাংস্কৃতিক, বসতি, অর্থনৈতিক, নগর, সামাজিক ভূগোল। অর্থাৎ উদ্দীপকের আলোচনা মানব ভূগোলের সব শাখা নির্দেশ করে না।

সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকের বর্ণনা মানব ভূগোলের কয়েকটি শাখাকে নির্দেশ করে, সব শাখাকে নির্দেশ করে না।

প্রশ্ন ▶৪ ফারদিন একটি বই পড়ছিল। ফারদিন বইটি পড়ে মানবসমাজ ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন দিক জানতে পারে। পৃথিবীর সভ্যতাগুলো কেন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল, তার যৌক্তিক কারণ জানতে পারে বইটি পড়ে। পল্লিবসতি, নগরবসতি, তাদের অবস্থান অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অভিগমন ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারে সে।

◀ শিখনফল: ১

ক. বিশ্বের তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিচিত কোন দেশ? ১

খ. যুক্তরাজ্যের অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ফারদিন কোন বইটি পাঠ করেছে? তার পরিচিতি নিরূপণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফারদিন যে বইটি পাঠ-করেছিল তার পাঠের ক্ষেত্র ফারদিনের অর্জিত জ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বের তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিচিত দেশ হচ্ছে জাপান।

খ ইউরোপ মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে যুক্তরাজ্য অবস্থিত।

গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ড নিয়ে যুক্তরাজ্য গঠিত। এটি ৪৯° উত্তর থেকে ৬১° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯° পশ্চিম থেকে ২° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। সমগ্র যুক্তরাজ্যের মোট আয়তন ২,৪৩,৬১০ বর্গ কি.মি.।

গ উদ্দীপকে ফারদিন মানবিক ভূগোল বইটি পাঠ করেছে। মানবিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে মানবসমাজ ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন দিক জানা যায়।

মানবিক ভূগোল হচ্ছে ভূগোলের সেই শাখা যেখানে মানুষ ও পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক আলোচনা করা হয়। মানব সম্প্রদায়ের অবস্থান, গঠনবিন্যাস, ক্রমবৃদ্ধি, অভিগমন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে মানবিক ভূগোল। ভূমিরূপ, জলবায়ু, মাটি, উদ্ভিদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের খাদ্য, পোশাক, আবাসন, পেশা প্রভৃতির বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আর মানুষের কর্মকান্ডের উপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে আলোচনাই হচ্ছে মানবিক ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ, বসতি স্থাপন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতা প্রভৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় মানবিক ভূগোল থেকে।

যেহেতু ফারদিন-বইটি পড়ে মানবসমাজ ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারে; সুতরাং বলা যায় যে, ফারদিন মানবিক ভূগোল বইটি পাঠ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত ফারদিন মানবিক ভূগোল বইটি পাঠ করেছিল। কারণ ফারদিনের পঠিত বই থেকে সে মানব ভূগোলের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে।

ফারদিন তার পাঠের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানবজাতির বৈশিষ্ট্য ও বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করে যা মানব ভূগোলের একটি অন্যতম ক্ষেত্র। এছাড়া সে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, ধরন এবং জনসংখ্যার বিস্তার ও ঘনত্ব, মানবজাতির অভিগমনের ধারা ও বিন্যাস সম্পর্কে ধারনা লাভ করে।

ফারদিন তার পঠিত বইয়ে মানব ভূগোলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতার কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতা সম্পর্কে সে জ্ঞান লাভ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা নদীর তীরে গড়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে সে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে। বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতিগত পার্থক্য, বসতি বিন্যাস, গ্রামীণ বসতি, নগর বসতি প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারে এই মানব ভূগোল পাঠের মাধ্যমে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প, বাণিজ্য, ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কেও ফারদিন স্পষ্ট ধারণা অর্জন করে।

সুতরাং বলা যায় যে, ফারদিন মানব ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে। কারণ সে বইটি পড়ে মানব ভূগোল পাঠের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন : কোনো অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পেরেছে।

প্রশ্ন ▶৫ রবি ও রাশেদ মানব ভূগোলের পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে রবি রাশেদকে বলল, দিন দিন ভূগোলের পরিধি ও ব্যাপকতা বৃদ্ধির কারণ কী? রাশেদ বলল বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতির ফলেই ভূগোলের পরিধির সম্প্রসারণ হচ্ছে।

◀ শিখনফল: ১

ক. বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল কয়টি? ১

খ. দক্ষিণ কোরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মানব ভূগোলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতির ফলে ভূগোলের পরিধির সম্প্রসারণ হয়েছে।" উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল মোট ৮টি।

খ দক্ষিণ কোরিয়া ৩২°২০′ থেকে ৩৮° উত্তর অক্ষরেখা এবং ১২৪° থেকে ১৩২° পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত। মূল ভূভাগ থেকে দূরবর্তী টেথা-ডোংগো এবং টেক-শিমা নামক দ্বীপদ্বয় এ রাষ্ট্রের অন্তর্গত।

এ দেশের উত্তরে উত্তর কোরিয়া, পূর্বে জাপান সাগর, দক্ষিণে কোরিয়া প্রণালি এবং পশ্চিমে পীত সাগর অবস্থিত।

গ মানব সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড যা প্রকৃতি ও পরিবেশের অনেক বৈচিত্র্য এনে দেয় তাই মানব ভূগোলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভূগোলশাস্ত্রের সুদীর্ঘ ইতিহাসের আদিপূর্ব থেকেই মানবীয় বিষয়াবলি লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের ভূগোলবিদগণ রাজনীতি, সমাজ, জাতি, স্থান, জনসংখ্যা, শহর, জনপদ ও সামাজিক বিবর্তন, উৎপাদন, পরিবহন, বাণিজ্য ইত্যাদি পার্থিব বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে ভূগোলে মানবীয় বিষয়াবলির সংযুক্তি ঘটিয়েছেন। তাছাড়া মানব ভূগোল, ভূগোল শাস্ত্রের একটি অন্যতম প্রধান শাখা হওয়ায় মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক, মানবগোষ্ঠীর অবস্থানিক বিন্যাস ও বণ্টন প্রকৃতি, উৎপাদন ও উপজীবিকা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রভৃতি মানব ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারার যে পার্থক্য দেখা যায় তাদের চিন্তাধারায়, মননশীলতায়, শিক্ষায় ও সংস্কৃতির বিকাশে যে ভিন্নতা তার কারণ অনুসন্ধান করাই মানব ভূগোলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ঘ বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতির সাথে পাল্লা দিয়ে ভূগোলের পরিধিও সম্প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ যত বেশি বিজ্ঞানের আধুনিকায়ন ঘটছে ভূগোলের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো তত বেশি বিস্তৃত হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এখন মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত। জ্ঞানের প্রতিটি শাখাকে তা স্পর্শ করে। এ প্রেক্ষিতে ভূগোল স্বাভাবিকভাবে মানুষ ও পরিবেশের বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মানুষের জন্ম, মৃত্যু, আচার-ব্যবহার, বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, উপজীবিকা, বর্ণ, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা ভূগোলের আওতা বা পরিধির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং জীবন প্রণালিকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। পরিবেশ ও এর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আলোচনা করাও ভূগোলের পরিধির আওতাভুক্ত। আর এই সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিজ্ঞান যত বেশি আধুনিক হচ্ছে মানবীয় বিষয়গুলোর উপর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রয়োগ তত অধিক হচ্ছে। যার ফলে ভূগোলের পরিধিও ব্যাপক বিস্তার লাভ করছে।

তাই বলা যায় যে বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতির ফলে ভূগোলের পরিধির সম্প্রসারণ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ মতিউর রহমান একজন প্রান্তিক চাষী। সম্প্রতি তিনি তার তিন ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেন। মেজো ছেলে মাহমুদ পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত পুকুর ভরাট করে বাড়ি বানায়। তার ছোট ভাই বাজারের জমিতে মার্কেট তৈরি করে। তাদের বড় ভাই জমি বিক্রি করে শহরে বসবাস করছে। *◀ শিখনফল-২*

ক. ভূগোল কী? ১

খ. প্রাকৃতিক ও মানব ভূগোলের পার্থক্য লেখো। ২

গ. মাহমুদের কর্মকাণ্ডটি ভূগোল শাস্ত্রের কোন দিকটির পরিচয় তুলে ধরে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মাহমুদ ও তার ভাইদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড কোন ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক বিশ্লেষণই ভূগোল।

খ প্রাকৃতিক ও মানব ভূগোলের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমন:

i. প্রাকৃতিক ভূগোল হলো প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের স্থান ও কাল ভিত্তিক বিশ্লেষণ। পক্ষান্তরে মানুষ ও স্থান সম্পর্কিত জ্ঞানই হলো মানব ভূগোল।

ii. ভূমিরূপবিদ্যা, জলবায়ুবিদ্যা, সমুদ্র বিজ্ঞান, মৃত্তিকা ভূগোল, জীবভূগোল ইত্যাদি প্রাকৃতিক ভূগোলের ক্ষেত্র বা পরিধি। পক্ষান্তরে, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভূগোল এবং পরিবহন ও সামাজিক ভূগোল প্রভৃতি মানব ভূগোলের ক্ষেত্র বা পরিধি।

গ মাহমুদ পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত পুকুর ভরাট করে বাড়ি তৈরি করেছে। তার এ কর্মকাণ্ডটি মানব ভূগোলের সামাজিক কর্মকাণ্ডের দিকটি তুলে ধরে।

মানব ভূগোলের প্রধান উপাদান মানুষ। মানুষ প্রতিনিয়ত পৃথিবীর সম্পদ ও ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। মানব ভূগোল মানুষ এবং তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের স্থানভিত্তিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

যেহেতু মাহমুদ প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ বসতি উন্নয়ন করেছে সেহেতু তার এ কাজটি মানব ভূগোলের সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিষয়টি তুলে ধরে।

ঘ উদ্দীপকে মাহমুদ ও তার ভাইদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড মানব ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত।

মানব ভূগোলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অর্থনীতি ও সম্পদ সমীক্ষা। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপরে ভূমি সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ভূমি ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

মানব ভূগোলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ এবং বসতির বিকাশ ও বণ্টনের ধারার উপর ভূমির প্রভাব সমীক্ষা করে থাকে। এছাড়াও নগরের স্থানিক বণ্টন ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ মানব ভূগোলে আলোচনা করা হয়।

উদ্দীপকে মাহমুদ ও তার ছোট ভাইয়ের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং নাগরিক সুযোগ সুবিধার আশায় তাদের বড় ভাইয়ের শহরে বসবাস সবকিছুই মানব ভূগোলে আলোচনা করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনন্ত শিক্ষাসফরে আগ্রার তাজমহল যায়। সেখানে সে তাজমহলের অপূর্ব কারুকাজ ও সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়। *◀ শিখনফল: ৩*

ক. মানব পরিবেশ কাকে বলে? ১

খ. রাজনৈতিক ভূগোল বলতে কী বোঝ? ২

গ. ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উক্ত দেশটিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অনন্তর ভ্রমণকৃত দেশটির জলবায়ুর সাথে বাংলাদেশের জলবায়ুর তুলনা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মানুষ বসবাস করে তাকে মানব পরিবেশ বলে।

খ যে ভূগোল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও পরিবেশের ওপর এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে তাকে রাজনৈতিক ভূগোল বলে।

পৃথিবীর ভূ-রাজনীতি, রাজনৈতিক অবস্থা, সরকার, শাসন ব্যবস্থা, সরকার পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জাতিসংঘের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে রাজনৈতিক ভূগোলে।

গ অনন্ত আগ্রার তাজমহল ভ্রমণে যায়। তাজমহল ভারতে অবস্থিত। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভারতকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা–

১. উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, ২. গাঙ্গেয় সমভূমি এবং ৩. মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি।

নিচে এ ভূমিরূপগুলোর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

১. **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল:** হিমালয় পর্বত ও এর শাখা-প্রশাখা অর্ধচন্দ্রাকারে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশে বিস্তৃত। হিমালয়ের গড় উচ্চতা ৫,৪৮৬ মিটার। জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তর ভাগে কারাকোরাম পর্বত অবস্থিত। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গডউইন অস্টিন (৮,৬২০ মিটার) পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শৃঙ্গ। গঙ্গা ও এর উপনদী যমুনা, গোমতী, গোগরা, কুশী হিমালয় পর্বত থেকে নির্গত হয়ে সমভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করেছে।

২. **গাঙ্গেয় সমভূমি :** পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও এদের শাখা-প্রশাখা দ্বারা পরিবাহিত পলল দ্বারা বিস্তীর্ণ সমভূমির সৃষ্টি করেছে। একে গাঙ্গেয় সমভূমি বলে। সমগ্র ভারতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এ সমভূমির অন্তর্গত।

৩. **মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি:** সমভূমি অঞ্চলের দক্ষিণে পর্বত ও মালভূমি অঞ্চল। এ অঞ্চলের পর্বতগুলোর মধ্যে রাজস্থানের আরাবল্লি, মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্যা ও সাতপুরা এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ও পূর্বঘাট পর্বত উল্লেখযোগ্য।

ঘ অনন্তর ভ্রমণকৃত দেশটি হলো ভারত। ভারত এবং বাংলাদেশের জলবায়ুর ধরন অনেকটা কাছাকাছি। নিচে তা তুলনা করা হলো।

প্রায় সমগ্র ভারত মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত, এখানে গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকাল মৃদু শীতল ও শুষ্ক থাকে। ভারতে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এখানে শীতকালে বাতাস উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়, ফলে প্রায় বৃষ্টিশূন্য থাকে। অপরদিকে বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস এপ্রিল। এসময় কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে। তখন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে ৩৮° সেলসিয়াস। জুন মাসের প্রথম দিকে মৌসুমি বায়ুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে বর্ষাকাল শুরু হয়। বর্ষাকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আসার সময় প্রচুর জলীয়বাষ্প নিয়ে আসে। এ জলীয়বাষ্প শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় (Orographic) বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। বাংলাদেশে জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন থাকে। এ সময় বাংলাদেশে শীতকাল বিরাজ করে। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত শীতল মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডটি উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত। এটা ছাড়া বহির্সমুদ্রেও এর অনেকগুলো দ্বীপাঞ্চল রয়েছে। এ দেশের মূল ভূ-খণ্ডটি পশ্চিম গোলার্ধে উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. উক্ত দেশের ভৌগোলিক অবস্থান কী? ১

খ. উদ্দীপকের ভূপ্রকৃতিগুলো কী কী? ২

গ. উদ্দীপকের দেশটির যেকোনো একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উপর্যুক্ত দেশের খনিজ সম্পদের ও কার্পাস শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তরে ৪৯° উত্তর অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে ২৩°৫০´ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং পূর্বে ৬৬.৫° পশ্চিম দ্রাঘিমা থেকে পশ্চিমে ১২৫° পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

খ উদ্দীপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূপ্রকৃতিকে প্রধানত ৫টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: ১. অ্যাপোলেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চল বা উচ্চভূমি, ২. মধ্যভাগের বৃহৎ সমতলভূমি, ৩. পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল, ৪. উপকূলীয় সমতল ভূমি ও ৫. আলাস্কা অঞ্চল।

গ যুক্তরাষ্ট্রের ভূপ্রকৃতিকে প্রধানত ৫টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অঞ্চল-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল অন্যতম। নিচে যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অঞ্চল-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল বর্ণনা করা হলো–

রকি পার্বত্য অঞ্চল হতে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তীর্ণ অঞ্চলসমূহ নিয়ে পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের পর্বতমালা তিনটি পৃথক পর্বতশিরায় বিভক্ত। সর্বপূর্বের পর্বতমালার নাম রকি পর্বত। পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলকে ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী ৬ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

i. প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলীয় সমতলভূমি;
ii. উপকূলীয় পার্বত্য অঞ্চল;
iii. ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকা;
iv. সিয়েরা নেভাদা পার্বত্য অঞ্চল;
v. ইন্টারম্যান্টম মালভূমি;
vi. রকি পার্বত্য অঞ্চল।

ঘ উপর্যুক্ত দেশটি যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ সম্পদ ও কার্পাস শিল্পের গুরুত্ব বিশ্বের একটি উন্নত দেশ হিসেবে অপরিসীম।

খনিজ সম্পদ: যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম প্রধান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। এ দেশের পূর্ব এবং পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে সর্বাধিক খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। এছাড়া দক্ষিণের টেক্সাস ও

ওকলাহামা রাজ্যে প্রচুর খনিজ তেল, পঞ্চ হ্রদের আশপাশে কয়লা ও আকরিক লৌহ এবং আলাস্কায় স্বর্ণ, রৌপ্য, খনিজ তেল, কয়লা প্রভৃতি খনি আবিষ্কৃত হয়েছে।

কার্পাস শিল্প: কার্পাস শিল্পে যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বিশ্বে তৃতীয়। ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৩২০ কোটি ৭৫ লক্ষ বর্গমিটার কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন করে। যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের বস্ত্র আমদানি করত সেসব দেশে কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতি হওয়ায় বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে এর উৎপাদন যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। ১৮৭০ সালে এ দেশে সর্বপ্রথম কার্পাস শিল্প গড়ে ওঠে। বর্তমানে অ্যাপোলেশিয়ান পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলে, উত্তরে মেইল হতে দক্ষিণে আলবামা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাস বয়ন শিল্প প্রসার লাভ করেছে।

প্রশ্ন ▶৯ বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম এবং জনসংখ্যার দ্বিতীয় প্রধান দেশ। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এরা স্বাধীনতা লাভ করে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হতে এই দেশ ক্রমশ উন্নত হচ্ছে।

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. উপর্যুক্ত দেশের ভৌগোলিক সীমানা কত? ১
খ. এর রাজনৈতিক কাঠামো কীরূপ? ২
গ. চিত্রের আলোকে ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ শনাক্ত করো। ৩
ঘ. অর্থনৈতিক অবস্থান ও খনিজ সম্পদের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপর্যুক্ত দেশটি হচ্ছে ভারত। ভারতের ভৌগোলিক সীমানা ৮°৪ উত্তর অক্ষাংশ হতে ৩৭°৬ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৫৮°৭ পূর্ব দ্রাঘিমা হতে ৯৭°২৫ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

খ গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো দ্বিস্তর বিশিষ্ট তথা বহুকেন্দ্রিক।

গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে ২৯টি রাজ্যপাল শাসিত এবং ৭টি কেন্দ্রশাসিত রাজ্য।

গ উদ্দীপকের দেশটি হলো ভারত।

নিচে ভারতের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল মানচিত্রে শনাক্ত করা হলো—

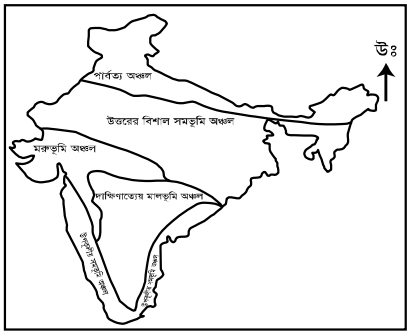

উপরিউক্ত চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলকে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. পার্বত্য অঞ্চল, ২. উত্তরের বিশাল সমভূমি অঞ্চল, ৩. উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল, ৪. দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল, ৫. মরুভূমি অঞ্চল।

ঘ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিকার্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ভারতের জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগের অধিক উপার্জিত হয় কৃষি থেকে। কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এ দেশের কৃষকরা অত্যন্ত দরিদ্র। প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যগুলো হলো— ধান, গম, ভুট্টা, যব ইত্যাদি।

ভারতের খনিজ সম্পদ এ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। খনিজ সম্পদে ভারত সমৃদ্ধশালী দেশ। তবে দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যার তুলনায় সঞ্চিত খনিজ সম্পদের পরিমাণ অধিক নয়। ভারতের খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা, খনিজ তেল, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, স্বর্ণ, তামা ইত্যাদি প্রধান। ভারতের প্রধান তেজস্ক্রিয় খনিজ সম্পদগুলো হলো টাইটেনিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থান ধীরে ধীরে সুদৃঢ় হচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

প্রশ্ন ▶১০ জোশেফ ও তার স্ত্রী কানাডার অধিবাসী। সম্প্রতি জোশেফ তার স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশে ঘুরতে এলেন। যে দেশটি ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এই দেশটি বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপগুলোর মধ্যে অন্যতম।

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. যুক্তরাজ্যের রাজধানী কোন নদীর তীরে অবস্থিত? ১
খ. জাপানের ভূপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জোশেফের ভ্রমণকৃত দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত দেশটির জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন টেমস নদীর তীরে অবস্থিত।

খ জাপানের ভূপ্রকৃতির অধিকাংশই পার্বত্যভূমির অন্তর্গত।

জাপানের পর্বতগুলো দুটি সমান্তরাল শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে উত্তর-দক্ষিণে ধনুকের আকারে বিন্যস্ত রয়েছে। এর একটি শ্রেণি পূর্বপ্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের এবং অপরটি পশ্চিমপ্রান্তে জাপান সাগরের উপকূল বরাবর অবস্থান করছে। আর এদের মাঝে রয়েছে নিম্ন উপত্যকা ও সমতলভূমি।

গ জোশেফের ভ্রমণকৃত দেশটি হলো বাংলাদেশ। কারণ বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ এবং দেশটি ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এটি বিশ্বের বৃহৎ ব-দ্বীপগুলোর মধ্যে অন্যতম। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী যথাক্রমে পশ্চিম-উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বাংলাদেশের মধ্যে প্রবেশ করে বিশাল বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে। তাই বাংলাদেশের অবস্থানকে সমুদ্র উপকূলীয় অবস্থান বলা যায়।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মায়ানমার এবং এক দিকে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা মিজোরাম রাজ্য এবং মায়ানমার; পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশ

২০°৩৪′ হতে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৮৮°০১′ হতে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

ঘ জোশেফের ভ্রমণকৃত দক্ষিণ এশিয়ার দেশটি হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ।

বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমি জলবায়ু এদেশের ওপর এতো অধিক প্রভাব ফেলে যে সামগ্রিকভাবে এর জলবায়ু 'ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু' নামে পরিচিত। মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো এক একটি ভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব। একটি হতে আর একটি ঋতুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতে পার্থক্য দেখা যায়।

জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বছরে তিনটি ঋতু দেখা যায়। যথা: শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। শুষ্ক ও আরামদায়ক শীতকাল এবং উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। জানুয়ারি বাংলাদেশের শীতলতম এবং এপ্রিল উষ্ণতম মাস। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ২৬.০১° সেলসিয়াস ও ২০৩ সে. মি.।

সুতরাং বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, এদেশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন এবং বসবাসের জন্য আদর্শস্বরূপ।

প্রশ্ন ▶ ১১

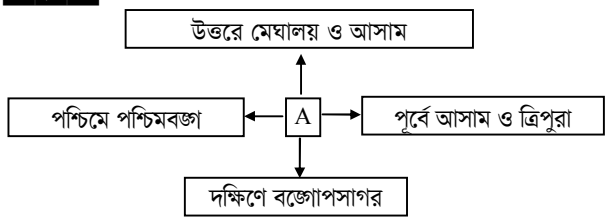

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা] ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. যুক্তরাজ্যের রাজধানীর নাম কী? ১

খ. উত্তর আমেরিকার অবস্থান ও আয়তন লেখো। ২

গ. 'A' দেশটির সীমারেখা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাজ্যের রাজধানীর নাম লন্ডন।

খ উত্তর আমেরিকা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। মহাদেশটি কিছুটা ত্রিভুজাকৃতির। এর আয়তন প্রায় ২,৪৩,৪৫,৯০৬ বর্গ কি.মি.।

এটি ৮৩° থেকে ৮° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৫২° হতে ১৭০° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মহাদেশটির উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর, পশ্চিমে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ এবং পূর্বে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত।

গ উদ্দীপকে 'A' চিহ্নিত দেশটি হলো বাংলাদেশ।

১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. আয়তনবিশিষ্ট বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪,৭১১ কিলোমিটার।

দুইটি দেশের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে। যেমন- ভারত ও মায়ানমার। এর মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫ কিলোমিটার এবং মায়ানমারের সাথে ২৮০ কিলোমিটার। বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কিলোমিটার। এ দেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

ঘ উদ্দীপকের দেশটির নাম বাংলাদেশ।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। দেশটি ২০°৩৪ থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশের প্রায় মাঝ বরাবর কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে।

বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য। পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও বিহার রাজ্য এবং মায়ানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গা নদী এবং দক্ষিণ-পূর্বে নাফ নদী যথাক্রমে ভারত ও মিয়ানমারের সীমানায় অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪,৭১১ কি.মি.।

প্রশ্ন ▶ ১২

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. বিশ্বমানচিত্র কী? ১

খ. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' ও 'খ' দেশের মধ্যে জনসংখ্যার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'খ' দেশে জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির জন্য কোন ধরনের নিয়ামকের ভূমিকা রয়েছে বলে তুমি মনে করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সব দেশের সীমানা চিহ্নিত করে অঙ্কিত পুরো পৃথিবীর মানচিত্রই বিশ্বমানচিত্র।

খ বাংলাদেশের ভৌগোলিক ভাবে ২০°৩৪ থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশের প্রায় মাঝ বরাবর কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে।

বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য। পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও বিহার রাজ্য এবং মায়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট সীমারেখা প্রায় ৪,৬৮৫ কি.মি.।

গ উদ্দীপকের 'ক' ও 'খ' দেশ দুটি যথাক্রমে যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশ। ৭টি মহাদেশের মধ্যে যুক্তরাজ্য পড়েছে ইউরোপে এবং বাংলাদেশ পড়েছে এশিয়া মহাদেশে।

UNFPA-২০১১ এর জরিপ অনুযায়ী যুক্তরাজ্যের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ১৯ লক্ষ। যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৫%। এখানে জনসংখ্যার গড় আয়ু ৭৮.৮ বছর। অন্যদিকে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। বাংলাদেশের মোট পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০০.৩ ঃ ১০০। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০১৫ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%।

যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশ অতি জনবহুল দেশ। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যা আয়তনের তুলনায় কম। জীবনযাত্রার মান বাংলাদেশের তুলনায় উন্নত। এছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত "খ" চিহ্নিত দেশটি বাংলাদেশ। দেশটির জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু নিয়ামকের ভূমিকা রয়েছে।

আমি মনে করি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ হলো পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ না করা। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ সুপরিকল্পিত উপায়ে নিজেদের আর্থিক সংগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবারের সদস্য সংখ্যা পূর্ব হতে নিয়ন্ত্রণ করে না। ফলে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে।

শিক্ষা মানুষকে পরিকল্পনা মাফিক চলতে সহায়তা করে। আমাদের দেশের বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষার সুযোগ না থাকায় তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে অজ্ঞ। উপরন্তু নারীদের কর্মসংস্থানের অভাববোধ থেকে জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে। নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকলে তারা ব্যস্ততার কারণে কম সন্তানে আগ্রহী হবে। এছাড়া আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ গ্রামকেন্দ্রিক এবং কৃষি নির্ভরশীল। গ্রামে টিভি, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যার কুফল প্রচারণা না করায় জনগণ এ বিষয়ে অজ্ঞ। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপরিউক্ত নিয়ামকগুলো ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরো কিছু কারণ রয়েছে। সেগুলো হলো বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, চিত্তবিনোদনের অভাব, জাতীয় আয়ের সুষ্ঠু বণ্টনের অভাব ইত্যাদি।

প্রশ্ন ▶ ১৩ **প্রথম বন্ধু:** একটি দেশের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র বাহিনী বোমা নিক্ষেপ করেছিল।

দ্বিতীয় বন্ধু: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশটি বর্তমান বিশ্বের তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি। দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান ২৪° উত্তর থেকে ২৬° উত্তর অক্ষাংশ এবং ১২২° পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ১৪৬° পূর্ব-দ্রাঘিমাংশ। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে পৃথক করেছে কোন উপসাগর? ১

খ. ভারতের অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোচনায় যে দেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেই দেশটির মানচিত্র অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোচনায় যে দেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেই দেশটি সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে পৃথক করেছে এডেন উপসাগর।

খ ভারত ৮°৪′ উত্তর থেকে ৩৭°৬′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৮°৭′ পূর্ব থেকে ৯৭°২৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ভারত। মোট ২৯টি প্রদেশের সমন্বয়ে এটি গঠিত। দেশটির মোট আয়তন প্রায় ৩২,৮৭,২৬৩ বর্গ কি. মি.। ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বত, চীন, নেপাল ও ভুটান; পূর্বে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও বঙ্গোপসাগর; দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও শ্রীলঙ্কা এবং পশ্চিমে পাকিস্তান ও আরব সাগর।

গ উদ্দীপকের আলোচনায় জাপানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিচে জাপানের মানচিত্র অঙ্কন করা হলো :

মানচিত্র: জাপান

ঘ উদ্দীপকে দুই বন্ধুর আলোচনায় পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান ২৪° থেকে ২৬° উত্তর অক্ষাংশ এবং ১২২° থেকে ১৪৬° পর্ব দ্রাঘিমাংশ। দেশটির মোট আয়তন প্রায় ৩,৭৭,৯৪৪ বর্গ কি. মি.।

জাপান একটি অপ্রশস্ত পর্বতসংকুল দেশ। এর উপকূলভাগ সংকীর্ণ নিম্নভূমি দ্বারা গঠিত। ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত জাপানের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এ অঞ্চলে প্রায় ১০৮টি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এ অঞ্চলের জলবায়ু মূলত নাতিশীতোষ্ণ ও মেরুদেশীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। গ্রীষ্মকালে জাপানের পূর্বাঞ্চলে ও শীতকালে পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ২৫.২° এবং শীতকালীন গড় তাপমাত্রা ৫.১° সে.। বনভূমি ও পর্বতময় ভূপ্রকৃতি হওয়ায় জাপানের শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ ভূমি কৃষিকাজের অনুপযোগী। তবে এটি পৃথিবীর প্রধান রেশম উৎপাদনকারী দেশ। বর্তমানে পৃথিবীর শিল্পপ্রধান দেশসমূহের মধ্যে জাপান অন্যতম।

সুতরাং বলা যায় যে, পর্বতসংকুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও কৃষি, খনিজ ও শিল্পে জাপানের অবস্থান উল্লেখযোগ্য এবং বর্তমান বিশ্বের তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে দেশটি পরিচিতি লাভ করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জনসংখ্যা

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১

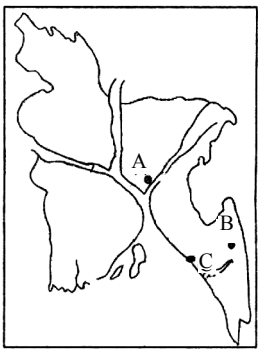

◀ *শিখনফল: ৬ [ঢা.বো., রা.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো., ২০১৭]*

ক. CDR এর পূর্ণরূপ কি? ১

খ. জনসংখ্যার ঘনত্ব কীভাবে নির্ণয় করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'A' অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্বের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'B' ও 'C' অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্যের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CDR এর পূর্ণরূপ হলো Crude Death Rate (স্থূল মৃত্যুহার)।

খ জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত জন লোক বাস করে তা বোঝায়।

কোনো দেশের মোট জনসংখ্যাকে সে দেশের আয়তন দ্বারা ভাগ করলেই প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বসবাসকারী জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়। জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্রটি নিম্নরূপ:

$$\text{জনসংখ্যার ঘনত্ব} = \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট আয়তন}}$$ ।

গ চিত্রের 'A' চিহ্নিত স্থানটি ঢাকা অঞ্চলকে নির্দেশ করে।

ঢাকা অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাংলাদেশে সর্বাধিক। এ অঞ্চলে অধিক জনঘনত্বের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী বেশ কয়েকটি নিয়ামক রয়েছে। যেমন–

i. ঢাকা অঞ্চলের সমতল ভূপ্রকৃতিতে কৃষি ও শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, যা মানুষের বসবাসকে আকৃষ্ট করে।

ii. নদী তীরবর্তী ঢাকা অঞ্চলে (নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর) মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য কৃষিকাজের অনুকূল হওয়ায় এখানে নিবিড় বসতি গড়ে উঠেছে।

iii. ঢাকা অঞ্চলে পানি সহজলভ্য। নদী ছাড়াও গভীর মৃত্তিকা স্তরে পানির মজুদ রয়েছে।

iv. এখানে দেশের যেকোনো অঞ্চলের তুলনায় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি রয়েছে। ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

v. বর্তমান সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ঢাকা অঞ্চলে বেশ কয়েকটি শহরের যেমন- (নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর) অবস্থান, আধুনিক প্রগতিশীল সংস্কৃতির বিকাশে সহায়ক হয়েছে। ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

vi. ঢাকা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন ও নগরায়ন ঘটেছে। যেমন– এ অঞ্চলে দেশের সিংহভাগ তৈরি পোশাক শিল্পের অবস্থান। আবার ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরে শিল্পের পাশাপাশি নগরায়ন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল। ফলে জনঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

vii. সর্বোপরি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এ অঞ্চলে অবস্থিত। এ অঞ্চলে শিক্ষা, প্রশাসনিক কাজ, চিকিৎসা এবং সেবাখাতের সর্বোচ্চ সুবিধা রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়ামকের আনুকূল্যে ঢাকা অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক হয়েছে।

ঘ মানচিত্রে 'C' ও 'B' যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নির্দেশ করে। এ দুই অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্বে বেশ তারতম্য রয়েছে। এর পিছনে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণ ক্রিয়াশীল।

সমুদ্রতীরবর্তী চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেশ বিস্তৃত সমভূমি (তীর ভূমি) রয়েছে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বন্ধুর ভূপ্রকৃতির অঞ্চল। উঁচু পার্বত্য এলাকায় মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কষ্টকর বলে জনসংখ্যার ঘনত্ব সেখানে অনেক কম। এছাড়া চট্টগ্রাম অঞ্চলের জলবায়ু সমুদ্র সান্নিধ্যের কারণে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ও উঁচু পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে আরামদায়ক। ফলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে অধিক জনঘনত্ব দেখা যায়।

সমুদ্রের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে চট্টগ্রামে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং প্রধানতম সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠেছে। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে

ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগরায়ন ঘটেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, সেবা সুবিধাও এখানে অনেক বেশি। তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানে জনঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম এদিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে। সেখানে যোগাযোগ ও পরিবহনও কষ্টসাধ্য। তাই বনজ সম্পদে বেশ সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে পারেনি এবং স্বাভাবিকভাবেই এ অঞ্চলে জনঘনত্ব কম।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, নানা প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ অনুকূল না হওয়ায় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনঘনত্বে ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২

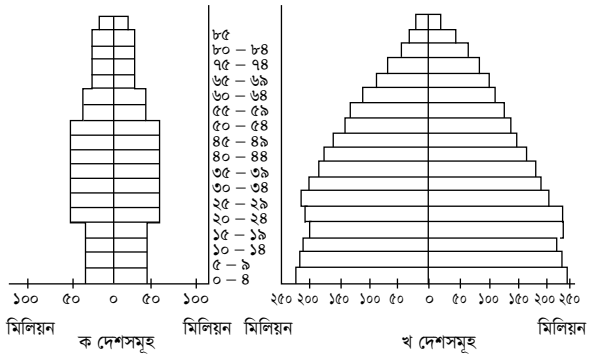

◀ *শিখনফল: ৫/দি. বো. ২০১৭/*

ক. অভিগমনের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. শিল্পোন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ অভিগমন ঘটে– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'ক' দেশসমূহের জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদান ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'খ' দেশসমূহের বয়স-লিঙ্গ কাঠামো 'ক'-এর অনুরূপ আনতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে গমন করাকে অভিগমন বলে। যেমন- ঢাকা থেকে রাজশাহী গমন।

খ শহর এলাকায় শিল্পের উন্নয়নের ফলে অভ্যন্তরীণ অভিগমন ঘটে থাকে।

শিল্পের উন্নতি একটি দেশের অভিগমনের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উপাদান। শহর এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং কৃষিভিত্তিক নয় (যেমন- সেবা, বিনোদন, শিক্ষা সুবিধা) এমন সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ গ্রাম থেকে শিল্প এলাকায় অভ্যন্তরীণ অভিগমন করে থাকে।

গ চিত্র 'ক' এ উন্নত বিশ্বের দেশ সমূহের জনমিতিক উপাদান দেখানো হয়েছে।

জনমিতিক উপাদান বলতে কোনো দেশের বয়স কাঠামো, উৎপাদনশীলতা, জন্মহার, মৃত্যুহার, লিঙ্গ অনুপাত প্রভৃতিকে বোঝানো হয়। উপরিউক্ত উপাদানগুলোর ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের কারণেই একটি দেশের উন্নত বা অনুন্নত হওয়া নির্ভর করে থাকে।

'ক' তথা উন্নত দেশসমূহের চিত্রটি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, চিত্রটির নিম্ন ও উপরের দিক কম প্রশস্ত এবং এর মাঝামাঝি অংশটি তুলনামূলক প্রশস্ত বা স্ফীত। অর্থাৎ চিত্রটির ভূমি কম প্রশস্ত, মাঝের দিকে প্রশস্ততা বৃদ্ধি পেয়ে উপরের দিকে আবার হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, এ অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে এবং জনসংখ্যা তুলনামূলক স্থিতিশীল। উন্নত দেশসমূহে নারী ও পুরুষের শতকরা বৃদ্ধির হারে খুব বেশি পার্থক্য দেখা যায় না। এখানে নির্ভরশীল জনসংখ্যার (১৮ বছরের নিচে এবং ৬৫ বছরের উর্ধ্বে) হার কম এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যার (১৮ থেকে ৬৫ বছর) পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে তারা যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে।

ঘ চিত্রে 'ক' ও 'খ' এ যথাক্রমে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বয়স-লিঙ্গ কাঠামো লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

উন্নত দেশসমূহে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই কম। অন্যদিকে অনুন্নত দেশে মৃত্যুহার কম থাকলেও জন্মহার অনেক বেশি। এছাড়াও 'ক' ও 'খ' দেশগুলোতে নারী-পুরুষের অনুপাত, কর্মক্ষম ও নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত প্রভৃতিতে তারতম্য দেখা যায়। তাই চিত্র 'খ' দেশসমূহের বয়সলিঙ্গ কাঠামো 'ক' এর অনুরূপ আনতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশসমূহ তাদের জনসংখ্যার পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার হ্রাস করার জন্য কিছু নীতি গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা সংকোচন প্রধানত দুইভাবে কার্যকর করা যেতে পারে। যেমন–

১। জন্মহার হ্রাস করার মাধ্যমে এবং

২। উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ অথবা বহির্গমন বৃদ্ধি করে।

প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত কোনো দেশের জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব নয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে কোনো দেশের জন্মহার স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। এছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির ব্যাপক প্রচার ও জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রীসমূহ জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করা প্রয়োজন। এ ছাড়াও অন্যান্য আরও কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

১। আইন করে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করা।

২। সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখার জন্য জনগণের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা।

৩। সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৪। মহিলাদের জন্য অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫। বৃদ্ধ বয়স, সংকট ও দুর্দশার সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা।

উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশসমূহ তাদের জনসংখ্যাকে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় রাখতে সক্ষম হবে। এ অবস্থায় 'খ' দেশগুলোর বয়স-লিঙ্গ কাঠামো 'ক'- এর অনুরূপ হবে।

প্রশ্ন ▶৩

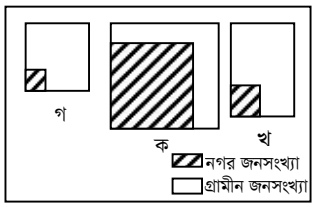

◀ শিখনফল: ৬ ও ৭ [দি. বো. ২০১৭]

ক. BADC-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. অভিগমনের সাথে সংস্কৃতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষণীয়– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'খ' চিত্রের জনসংখ্যার ধরন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' ও 'গ' চিত্রের জনসংখ্যার ধরনের পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BADC-এর পূর্ণরূপ– Bangladesh Agricultural Development Corporation.

খ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে অভিগমনের ফলে সংস্কৃতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। যেমন– ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, রীতিনীতি। অভিগমনের ফলে সামাজিক আচার-আচরণের আদান-প্রদান হয়। সামাজিক অনেক রীতিনীতি এক দেশ থেকে অন্যদেশে স্থানান্তরিত হয়।

গ উদ্দীপকের 'খ' চিত্রটিতে গ্রামীণ জনসংখ্যার আধিক্য দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। তবে এদেশের সব জায়গায় জনসংখ্যা সমভাবে বণ্টিত হয়নি। এদেশে গ্রামীণ জনসংখ্যা শহরের তুলনায় বেশি।

সামাজিক, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ জনসংখ্যার ঘনত্ব বণ্টনে ভূমিকা রাখে। পলল গঠিত সমতল ভূমি অঞ্চলে গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠায় গ্রামে জনসংখ্যা বেশি হয়। আবার গ্রামের মানুষের মাঝে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ এবং বিভিন্ন কুসংস্কারের প্রচলন থাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হয়ে থাকে। এখানে অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিকাজের সাথে জড়িত থাকায় নিজ জমিতে ফসল আবাদের সুবিধার জন্য অধিক সন্তান নিয়ে থাকে। তাই গ্রামে জনসংখ্যা তুলনামূলক বেশি।

সুতরাং আমরা বলতে পারি 'খ' চিত্রটিতে গ্রামীণ জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, যা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লক্ষ করা যায়। মূলত এসব দেশের বিভাগীয় বা জেলা পর্যায়ে জনসংখ্যার ধরন এরূপই; যেখানে গ্রামীণ জনসংখ্যা নগরের তুলনায় অত্যধিক।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' ও 'গ' অঞ্চলে যথাক্রমে শহুরে ও গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রাধান্য লক্ষণীয়।

বাংলাদেশের সর্বত্র জনসংখ্যার ঘনত্ব সমান নয়। এদেশের শহরগুলোর তুলনায় গ্রামে জনসংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম। সাধারণত কোনো স্থানের ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, নগরায়ণ প্রভৃতি নিয়ামকগুলো বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে জনসংখ্যার বণ্টনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

নিচে গ্রামীণ ও নগর জনসংখ্যার ধরনের পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ করা হলো-

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ওপর একটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্য দেখা যায়। সাধারণত নগরসমূহে শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠায় এখানে জনসংখ্যা গ্রামের তুলনায় বেশি। যেমন- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ। আবার কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা যেখানে বেশি সেখানেও মানুষ অধিক হারে বাস করে। শহুরে এলাকায় গ্রামের তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি থাকায় লোকজন শহরে আগমন করে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যেমন- চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা। নগরায়ণের ওপরও কোনো স্থানের জনসংখ্যার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। নগরে মানুষের জীবনধারণের উপযোগী সকল প্রকার সুবিধা বিদ্যমান থাকায় লোকবসতি গ্রামের তুলনায় বেশি। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার কারণেও মানুষ নগরমুখী হয়। এছাড়াও শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, সেবা, বিনোদন, দর্শনীয় স্থান প্রভৃতির আধিক্যের কারণে নগরের জনসংখ্যা গ্রামের তুলনায় অধিক হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত কারণগুলোই 'ক' এবং 'গ' অর্থাৎ নগর ও গ্রামীণ জনসংখ্যার ধরনের পার্থক্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶৪ নাবিলের পূর্বপুরুষ এক সময় বরিশালের কীর্তনখোলা নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দা হলেও বর্তমানে তারা ঢাকা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এভাবে প্রতিনিয়ত ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরটি নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে।

[সকল বোর্ড ২০১৬] ◀ শিখনফল: ২

ক. অভিগমন বলতে কী বোঝায়? ১

খ. ভূপ্রকৃতি কীভাবে জনসংখ্যার বণ্টনে প্রভাব বিস্তার করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অভিগমনের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নাবিলদের অভিগমনের ফলে নতুন বসতি এলাকার বিরূপ প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের অভ্যন্তরের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বা দেশের বাইরে এক দেশে থেকে অন্যদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আগমন বা নির্গমনকে অভিগমন বলে।

খ ভূপ্রকৃতি জনসংখ্যার বণ্টনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ভূপ্রকৃতির পার্থক্যের কারণেই কোনো স্থানে জনসংখ্যা বেশি আবার কোনো স্থানে কম হয়।

সমভূমি অঞ্চলে যেখানে কৃষি, শিল্প গড়ে তোলা সহজ হয় সেখানে মানুষ বসবাস করতে চায়। তাই সমভূমি অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। যেমন- ঢাকা। আবার পাহাড়ি, জলাময় অঞ্চলে জীবনধারণ অনেক কষ্টকর বলে ঐ সকল স্থানে জনঘনত্ব কম থাকে। যেমন-বান্দরবান।

গ উদ্দীপকে অভ্যন্তরীণ অভিগমনের শহর থেকে শহরে অভিগমনকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশের বহু মানুষ বিভিন্ন জেলা থেকে জেলায়, জেলা থেকে বিভাগীয় শহরে এমনকি রাজধানীতে অভিগমন করে। এভাবে দেশের ভেতরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বাসস্থান পরিবর্তন করাকে অভ্যন্তরীণ অভিগমন বলে।

নাবিলের পূর্বপুরুষ বরিশালের কীর্তনখোলা নদীর তীরে বসবাস করলেও বর্তমানে তারা ঢাকা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। স্বভাবত বড় শহরে সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকায় ছোট শহর থেকে মানুষ এখানে অভিগমন করে। এছাড়াও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ না হওয়ার কারণেও বড় শহরে এ ধরনের অভিগমন দেখা যায়। মূলত এসব কারণেই নাবিলের পূর্বপুরুষ বরিশাল থেকে ঢাকা শহরে অভিগমন করে। যেহেতু এটি দেশের অভ্যন্তরে এক শহর থেকে অন্য শহরে বাসস্থান পরিবর্তন সেহেতু এটি অভ্যন্তরীণ অভিগমনের শহর থেকে শহরে অভিগমন।

ঘ নাবিলদের বরিশাল থেকে ঢাকায় আসা শহর থেকে শহরে অভিগমন যা মূলত অভ্যন্তরীণ অভিগমন।

বড় শহরগুলোতে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলক বেশি হওয়াতে গ্রাম বা ছোট শহর থেকে মানুষ বড় শহরে পাড়ি জমায় এবং স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসবাস করে। এতে বড় শহরের অভ্যন্তরীণ কাঠামো ভেঙ্গে যাওয়াসহ বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

নাবিলদের নতুন বসতি তথা ঢাকা শহরে এরূপ অভিগমনের ফলে যেসব বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো–

১. ঢাকা শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শহরবাসী আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন– বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, নিরাপত্তা পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি।
২. শহরে অভিগমনের ফলে জনসংখ্যার ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়। এসব মানুষ কাঙ্ক্ষিত সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় বস্তিতে বসবাস শুরু করে। যা শহরের পরিবেশ নষ্ট করে।
৩. ঢাকা শহরে এভাবে অভিগমনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কর্মসংস্থান তৈরি সম্ভব হয় না। ফলে শহরে বেকারত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পায়।
৪. শহরে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে। এতে শহরে যানজট, সড়ক দুর্ঘটনা প্রভৃতি সমস্যা বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত সমস্যাগুলো ছাড়াও অভিগমনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত আরও বিভিন্ন সমস্যা যেমন– হত্যা, ছিনতাই, অসামাজিক কার্যকলাপ, জলাবদ্ধতা, বিভিন্ন দুর্ঘটনা ইত্যাদি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶৫ দুই বোন সালমা ও সাবিনা কিছুদিন আগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে বসবাস করতে শুরু করে। ঐ সময় তাদের বাবা-মা আমেরিকায় চলে যায়। তাদের বাবা-মা ঐ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জনবৈশিষ্ট্যগত অবস্থা বিবেচনা করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। *◀ শিখনফল: ২*

ক. অভিগমন কাকে বলে? ১
খ. অভিগমনের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সালমা ও সাবিনার চট্টগ্রামে বসবাস কোন ধরনের অভিগমনের আওতায় পড়ে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সালমা ও সাবিনার বাবা-মা আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করাকে অভিগমন বলে।

খ মানুষ বিভিন্ন কারণে অভিগমন করে থাকে। এ কারণ হতে পারে আকর্ষণমূলক অথবা বিকর্ষণমূলক।

মানুষ কখনও অর্থনৈতিক, কখনও রাজনৈতিক, কখনও শিক্ষাগত আবার কখনও রোগব্যাধির চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে অভিগমন করে থাকে। এসব আকর্ষণজনিত কারণ ছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষ অভাব, যুদ্ধ, দাঙ্গা প্রভৃতি বিকর্ষণজনিত কারণেও অভিগমন করে থাকে।

গ সালমা ও সাবিনার ঢাকা ছেড়ে চট্টগ্রামে বসবাস করাকে অভ্যন্তরীণ অভিগমন বলা হয়।

মানুষ কখনও কখনও একই দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অন্য কোনো স্থানে নিজ জেলার বাইরে বসবাস করে। মানুষ যখন নিজ দেশের মধ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অভিগমন করে তখন তাকে অভ্যন্তরীণ অভিগমন বলে। আর এ ক্ষেত্রে সালমা ও সাবিনার অভিগমনটি অভ্যন্তরীণ অভিগমনের আওতায় পড়ে। মানুষ প্রায়ই এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর বা অভিগমন করে থাকে কোনো নতুন চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈবাহিক সম্পর্ক কিংবা শিক্ষার প্রয়োজনে।

যেহেতু সালমা ও সাবিনা নিজ দেশেই ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে গমন করেছে সেহেতু তাদের গমন অভ্যন্তরীণ অভিগমনের আওতায় পড়ে।

ঘ সালমা ও সাবিনার বাবা-মায়ের আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার পিছনে রয়েছে আন্তর্জাতিক অভিগমনের আকর্ষণমূলক কারণ।

মানুষ যখন এক দেশ হতে অন্য দেশে অভিগমন করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক অভিগমন বলে। অর্থাৎ একটি স্বাধীন দেশের লোক তার নিজ জন্মভূমি ছেড়ে যদি অন্য কোনো স্বাধীন দেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত হয় তাহলে তাকে আন্তর্জাতিক অভিগমন বলে।

এক্ষেত্রে সালমা ও সাবিনার বাবা-মা নিজ দেশ ত্যাগ করে আমেরিকায় আন্তর্জাতিক অভিগমন করেন। এর পেছনে কিছু আকর্ষণমূলক কারণ কাজ করেছে। আমেরিকার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জনবৈশিষ্ট্যগত উন্নত ব্যবস্থার কারণে অর্থাৎ সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মস্থলে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা থাকার কারণেই সালমা ও সাবিনার বাবা-মা এ ধরনের অভিগমন করেছেন।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি অভিগমনের আকর্ষণমূলক কারণেই সালমা ও সাবিনার বাবা-মা আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

প্রশ্ন ▶ ৬ আফরিন ও তার বন্ধুরা উচ্চ শিক্ষার্থে 'ক' স্থান হতে 'খ' স্থানে গমন করে। এতে 'ক' ও 'খ' স্থানে জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। *◀ শিখনফল: ২*

ক. এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমনকে কী বলে? ১

খ. জনসংখ্যার জনমিতির উপাদান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত জনমিতিক উপাদানটি জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যে যে পরিবর্তন ঘটায় তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকে নির্দেশিত জনমিতিক উপাদানটি নিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট- তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমনকে আন্তর্জাতিক অভিগমন বলে।

খ যে কোনো নির্দিষ্ট জনসংখ্যায় বিভিন্ন দিক পরিমাপের মাধ্যমে উপস্থাপন করাকেই জনমিতি বলে। যেমন : মৃত্যুহার নির্ণয়। তাই একটি নির্দিষ্ট জায়গার জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য, বৃদ্ধি, আকার, বিস্তৃতি, বণ্টন সবকিছুই জনমিতির উপাদান।

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত জনমিতিক উপাদানটি অভিগমন।

সাধারণত স্থান পরিবর্তন বা আবাসস্থল পরিবর্তনকে অভিগমন বলা হয়।

জীবন ধারণের মৌলিক ও অন্যান্য প্রয়োজনে বহু লোক বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে, এক শহর থেকে অন্য শহরে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে অভিগমন করে থাকে। অভিগমনে গ্রাম বা শহরের মোট জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি, কাঠামোগত পরিবর্তন, আবাসিক এলাকার পরিবর্তন, সমগ্র দেশের জনসংখ্যা বণ্টনে পরিবর্তন দেখা দেয়।

আফরিন ও তার বন্ধুরা উচ্চ শিক্ষার্থে 'ক' স্থান হতে 'খ' স্থানে গমন করে। এরূপ গমনকে অভিগমন বলে। এরূপ স্থানান্তরের ফলে 'ক' স্থানের জনসংখ্যা হ্রাস পাবে এবং 'খ' স্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত জনমিতিক উপাদানটি হলো অভিবাসন। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট নয়।

কোনো দেশের জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি ঐ দেশের জন্মহার, মৃত্যুহার, অভিবাসন দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। জন্মহার, মৃত্যুহার ও অভিবাসন প্রত্যেকটি বিষয় একটি অপরটির সাথে সম্পর্কিত।

অধিক জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য জনসংখ্যার পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার হ্রাস করার জন্য কিছু নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে। আবার কোনো দেশের জনসংখ্যা সংকোচন প্রধানত দুইভাবে কার্যকর করা যেতে পারে। যেমন:

১. জন্মহার হ্রাস অথবা মৃত্যুহার বৃদ্ধি করে।

২. উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ অথবা বহির্গমন বৃদ্ধি করে।

প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত কোনো দেশের জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব নয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে যে কোনো দেশের জন্মহার স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাবে। এছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর ব্যাপক প্রচার ও জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রীসমূহ জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করাও প্রয়োজন। সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিলি বণ্টনের সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করা ছাড়াও আরো কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন— আইন করে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করা, সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখার জন্য জনগণের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার আইন প্রণয়ন করা, মহিলাদের জন্য অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, বৃদ্ধ বয়সে সঙ্কট ও দুর্দশার সময় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে শুধুমাত্র অভিবাসন নিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট নয় বরং জন্মহার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই জনসংখ্যা কমানো সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৭ পরিসংখ্যানের ছাত্রী রাবেয়া পত্রিকায় একটি প্রতিবেদনে লক্ষ করল একটি দেশ সবচেয়ে বেশি জনবহুল (আয়তন ৯,৫৭১,৩৪৫ বর্গ কি.মি এবং জনসংখ্যা ১,৩৩১,৪০০,০০০ জন) হওয়া সত্ত্বেও সে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত। প্রতিবেদনটি থেকে সে বুঝতে পারল, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করলেই জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব। *◀ শিখনফল: ৬*

ক. বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কি.মি. এ জনসংখ্যার ঘনত্ব কত? ১

খ. কীভাবে মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করো। ৩

ঘ. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমেই জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব। উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কি.মি. এ জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় ১,০১৫ জন।

খ প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে বছরে বিভিন্ন বয়সের যতজন লোক মারা যায় তাকে মৃত্যুহার বলে।

$$\text{অর্থাৎ মৃত্যুহার} = \frac{\text{এক বছরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা}}{\text{দেশের মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন ২০১৮ অনুযায়ী, বাংলাদেশে জনসংখ্যার মৃত্যুহার ৫.১ জন।

গ উদ্দীপকে আলোচিত জনবহুল দেশটি চীন।

একটি দেশের প্রতি বর্গকিলোমিটারে যতজন লোক বাস করে তাকে ঐ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে। জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র-

$$\text{জনসংখ্যার ঘনত্ব} = \frac{\text{দেশের মোট জনসংখ্যা}}{\text{দেশের মোট আয়তন}}$$

চীনের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করতে হলে চীনের লোকসংখ্যা এবং ভূমির আয়তন প্রয়োজন হবে।

উদ্দীপকে চীনের মোট জনসংখ্যা দেওয়া আছে ১,৩৩১,৪০০,০০০ জন এবং আয়তন আছে ৯৫৭১৩৪৫ বর্গ কি.মি.।

$$\text{সুতরাং, চীনের জনসংখ্যার ঘনত্ব} = \frac{\text{চীনের মোট জনসংখ্যা}}{\text{চীনের মোট ভূমির আয়তন}}$$

$$\therefore = \frac{১,৩৩১,৪০০,০০০}{৯,৫৭১,৩৪৫}$$

= ১৩৯.১০ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)

সুতরাং বলা যায়, চীনে প্রতি বর্গ কি.মি. এ ১৩৯ জন লোক বাস করে।

ঘ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমেই জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব, উক্তিটি যথার্থ বলে আমি মনে করি। কোনো দেশে জনসংখ্যা অধিক হলেও যদি তারা দক্ষ হয় তবে ঐ অতিরিক্ত জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হয় এবং সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারলে প্রত্যেক জনগণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়।

জাতীয় উন্নয়নের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জনসংখ্যা ও সম্পদ। সম্পদের অবস্থান, পরিমাণ ও গুণগত পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে মানুষের অবদান রাখার সুযোগ খুবই সীমিত। তাই জনসংখ্যার যথাযথ সমন্বয় সাধন করার জন্য জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করা হয়। উপযুক্ত নীতির মাধ্যমে জনসংখ্যা ও সম্পদের মাঝে সমন্বয় সাধন করে যে কোনো দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখা যায়। চীন জনবহুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যা ও সম্পদের যথাযথ সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়েছে বলেই জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হয়েছে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের অর্থাৎ চীনের ক্ষেত্রে তাই উক্তিটি যথার্থ বলে আমি মনে করি ।

প্রশ্ন ▶ ৮ মাহমুদ মিয়ার বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলায়। নদী ভাঙনের কারণে সে তার পরিবার নিয়ে এখন ঢাকা শহরের বস্তিতে বসবাস করে। একই সাথে তিনি কৃষিজমি হারিয়ে এখন শহরে রিকশা চালিয়ে জীবনযাপন করেন।

[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ] ◀ ***শিখনফল: ৮***

ক. অভিগমন কী? ১

খ. মাহমুদ মিয়ার সিরাজগঞ্জ থেকে ঢাকায় অভিগমন কোন ধরনের অভিগমন? ২

গ. মাহমুদ মিয়ার অভিগমনের ফলে অর্থনীতির ওপর কী প্রভাব ফেলে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অভিগমনের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করাই অভিগমন।

খ মাহমুদ মিয়ার সিরাজগঞ্জ থেকে ঢাকায় অভিগমন হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অভিগমন।

দেশের ভেতরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বাসস্থান পরিবর্তন হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অভিগমন। মাহমুদ মিয়া সিরাজগঞ্জ থেকে ঢাকায় অভিগমন করেছেন। তাই এটা অভ্যন্তরীণ অভিগমন।

গ মাহমুদ মিয়ার অভিগমনের ধরন অভ্যন্তরীণ অভিগমন। এ ধরনের অভিগমনের ফলে দেশের অর্থনীতির ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব পড়ে।

মাহমুদ মিয়ার অভিগমন অর্থনীতির ওপর যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে তা বিশ্লেষণ করা হলো—

ইতিবাচক প্রভাব: মাহমুদ মিয়ার অভিগমন সিরাজগঞ্জের সাথে ঢাকা শহরের একটি সংযুক্তি সম্পর্কের প্রকাশ ঘটিয়েছে। তার পেশার পরিবর্তন হওয়ার আগে যেখানে সে হয়তো দু-তিন দফায় আয় করত সেখানে বর্তমান পেশায় তার প্রতিদিনের আয়ে তার সংসারের জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় ভিন্নতা এসেছে। আর স্বাভাবিকভাবেই অর্থনীতিতে তার আয় ভিন্নমাত্রায় যোগ হচ্ছে।

নেতিবাচক প্রভাব: মাহমুদ মিয়ার মতো প্রতিবছর বহু মানুষ নদীভাঙনের শিকার হয়ে ঢাকা শহরের বস্তিতে আশ্রয় নিচ্ছে। ফলে শহরের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, অপরাধপ্রবণতা বেড়েছে, আবার নদীভাঙনের সাথে সম্পৃক্ত কৃষিশ্রমিক অন্য পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। ফলে অর্থনীতির কৃষিখাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অন্যদিকে ঢাকা শহরে এই অভিগমনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাহমুদ মিয়ার মতো বহু মানুষ এরূপ অভিগমনে পেশা পরিবর্তন করে বিধায় অর্থনৈতিক জরিপে সব তথ্য সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এরূপ অভিগমন অর্থনৈতিক উন্নতিতে বাধাস্বরূপ।

ঘ মাহমুদ মিয়ার মতো বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে জেলায়, জেলা থেকে বিভাগীয় শহরে এমনকি রাজধানীতে অভিগমন করে বহু মানুষ।

বাংলাদেশের অভিগমন পরিস্থিতি লক্ষ করলে দেখা যায়— বহু মানুষ গ্রাম থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে অভিগমন করে থাকে। গ্রাম থেকে যারা শহরে অভিগমন করেছে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে যারা অভিগমন করেছে, তাদের কারণে ঢাকা শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সামাজিক কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন: বস্তি সমস্যা, বেকার সমস্যা, চুরি, ছিনতাই ইত্যাদি। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ অভিগমনের ফলে সংস্কৃতির ওপর প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন: উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ বা অন্য জেলা থেকে আসা মানুষ পুরান ঢাকায় বসবাস করায় পুরান ঢাকার সংস্কৃতি ও ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় গ্রামগঞ্জে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা হলেও গ্রামের মানুষ শহরে অধিক সুবিধা পাওয়ার আশায় অভিগমন করছে। প্রতিদিন ঢাকা শহরে যে

তৃতীয় অধ্যায়
বসতি

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১

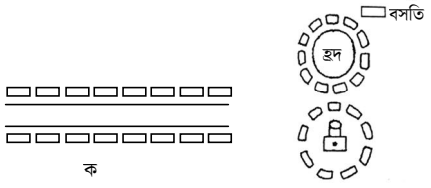

◀ *শিখনফল: ২ [ঢা.বো., রা.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো., ২০১৭]*

ক. গ্রামীণ হাট কাকে বলে? ১

খ. ভূ-প্রকৃতি বসতি গঠনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' অঞ্চলে বসতি গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' বসতির বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে গ্রামের কোনো স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ পণ্য বিনিময়ের উদ্দেশ্যে মিলিত হলে তাকে গ্রামীণ হাট বলে।

খ জনবসতি গড়ে ওঠার পেছনে ভূপ্রকৃতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন: গাঙ্গেয় বদ্বীপের সমভূমি উর্বর হওয়ায় সেখানে ঘনবসতি গড়ে উঠেছে।

সমতলভূমিতে কৃষিকাজ করা যত সহজ অসমতল ভূমিতে ততটা নয়। এছাড়াও সমতল ভূমিতে যাতায়াতের সুবিধা বসতি গড়ে ওঠার অনুকূলে কাজ করে। অন্যদিকে বন্ধুর ভূপ্রকৃতিতে খুব কমই বসতি গড়ে ওঠে। যেমন: বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে জনবসতি কম।

গ 'ক' অঞ্চলে সারিবদ্ধ বসতি গড়ে উঠেছে।

যে বসতিগুলো পাশাপাশি অবস্থিত হয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন সারি (Line) সৃষ্টি করে তাকে সারিবদ্ধ বসতি বলে। এ ধরনের বসতি পাঁচ থেকে ছয় মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। প্রধানত প্রাকৃতিক এবং কিছুক্ষেত্রে সামাজিক কারণে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে।

নদীর প্রাকৃতিক বাঁধ বা কিনারা, রাস্তার ধারে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে। বন্যামুক্ত ভূমি এ ধরনের বসতি গড়ে তোলার জন্য সুবিধাজনক। এ কারণেই দেশের মৃতপ্রায় বদ্বীপ অঞ্চলে এ ধরনের বসতি দেখা যায়। বড় রাস্তার ধারে ও গ্রামাঞ্চলে রৈখিক বসতি দেখা যায়। যেসব নদী সক্রিয় নয় সেগুলোর তীরেও সারিবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠে, যেমন– রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চল।

ঘ 'ক' ও 'খ' যথাক্রমে রৈখিক বা সারিবদ্ধ ও গোলাকার বসতি নির্দেশ করে। সারিবদ্ধ বসতি পাশাপাশি অবস্থিত হয়ে সরলরেখায় গড়ে ওঠে। অন্যদিকে গোলাকার বসতি প্রাকৃতিক সুবিধা বা আকর্ষণীয় কোনো স্থানের চারপাশে বৃত্তাকারে গড়ে ওঠে।

নদীর প্রাকৃতিক বাঁধ বা কিনারা, রাস্তার ধারে সারিবদ্ধ বসতি দেখা যায়, যেমন– কক্সবাজারের উপকূলবর্তী বসতি। শুষ্ক অঞ্চলে কোনো ঝরনা, বিল বা হ্রদ ইত্যাদির চারপাশে গোলাকার বসতি গড়ে ওঠে, যেমন– রাজশাহীর চলন বিল এলাকার বসতি।

সারিবদ্ধ বসতি সাধারণত নিবিড় হয়ে থাকে। এখানে গড়ে ওঠা পুঞ্জীভূত বসতিগুলোর মধ্যে কিছুটা ফাঁকা থাকে যেখানে খামার অথবা অন্য কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। এ ধরনের বসতিতে সামাজিক যোগাযোগ কঠিন, কেননা প্রান্তস্থিত (marginal) বসতিগুলো একটি থেকে আরেকটি অনেক দূরে অবস্থিত। আবার বিভিন্ন সেবা সুবিধার ক্ষেত্রেও তা প্রতিবন্ধক হয়। তবে এ ধরনের বসতিতে যাতায়াতের সুবিধা রয়েছে।

অন্যদিকে গোলাকার বসতি ততটা নিবিড় হয় না কেননা এর সেবা সুবিধাপ্রাপ্তির একটি কেন্দ্র আছে। এ বসতিতে যাতায়াত ব্যবস্থার বিন্যাসও সুবিধাজনক হয় না। তবে গোলাকার বলে এ বসতির অধিবাসীদের সামাজিক যোগাযোগ নিবিড় হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সারিবদ্ধ ও গোলাকার বসতির বাহ্যিক রূপে যেমন ভিন্নতা রয়েছে তেমন এর ভিতরগত (internal) বৈশিষ্ট্যেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য।

প্রশ্ন ▶ ২

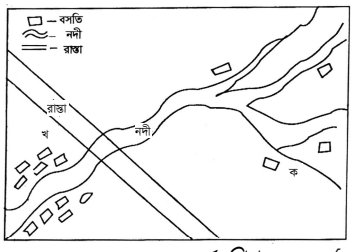

◀ *শিখনফল: ২ [সকল বোর্ড-২০১৬]*

ক. বসতি কাকে বলে? ১

খ. শিল্পাঞ্চলে পুঞ্জিভূত বসতি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' স্থানের বসতি গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' স্থানের বসতির বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি স্থানে মানুষ একত্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যে অবস্থার তৈরি করে তাকে বসতি বলে।

খ যে অধিবাসীদের বসত বাড়িগুলো খুব কাছাকাছি এবং ঘন বা নিবিড়ভাবে গড়ে ওঠে তাকে পুঞ্জিভূত বসতি বলে।

কোনো স্থানে শিল্প স্থাপিত হলে সে অঞ্চলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধার (যেমন– কর্মসংস্থানের পাশাপাশি শিক্ষা, বিনোদন, চিকিৎসা প্রভৃতি) কারণে মানুষ শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে বসতি স্থাপন করতে চায়। উক্ত কারণে শিল্পাঞ্চলে পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে, যেমন– ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বসতি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বসতি হলো রৈখিক বসতি।

প্রধানত প্রাকৃতিক ও কিছু সামাজিক কারণে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে আছে পানীয়জলের প্রাপ্যতা, অনুকূল আবহাওয়া, নদী অববাহিকার উর্বর অঞ্চল, বন্যামুক্ত এলাকা ইত্যাদি।

নদী, খাল, রেললাইন ও রাস্তার দু পাশে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠার প্রবণতা বেশি। এর কারণ এ ধরনের এলাকা সাধারণত বন্যামুক্ত হয়। প্রাকৃতিক বন্ধুরতার জন্যে রৈখিক বসতি সর্বদা সোজা হয় না। নদী অববাহিকা ও হাওর এলাকায় পানীয়জলের প্রাপ্যতার কারণে রৈখিক বসতি গড়ে ওঠে। রৈখিক বসতি গড়ে ওঠার সামাজিক কারণের মধ্যে আছে সামাজিক সম্পর্ক, হাট-বাজারের উপস্থিতি, পেশাগত সাদৃশ্য ইত্যাদি।

সুতরাং বলা যায় যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে রৈখিক বসতি গড়ে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' এবং 'খ' স্থানে যথাক্রমে বিক্ষিপ্ত এবং রৈখিক বসতি দেখা যায়।

'ক' স্থানে মাত্র একটি বা দুটি বসতি দূরে দূরে অবস্থান করায় এটি বিক্ষিপ্ত বসতি এবং 'খ' স্থানে কয়েকটি বসতি পাশাপাশি সরলরেখায় অবস্থান করায় এটি রৈখিক বসতি নির্দেশ করে।

নিচে বিক্ষিপ্ত ও রৈখিক বসতির বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো–

i. বিক্ষিপ্ত বসতিতে একটি পরিবার অন্যটি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। আর রৈখিক বসতিতে একটি পরিবার অন্যটির কাছাকাছি এবং সরলরেখায় অবস্থান করে।

ii. বন্ধুর ভূপ্রকৃতিতে বিক্ষিপ্ত বসতি দেখা যায়। অপরদিকে, নদীর প্রাকৃতিক বাঁধ, নদীর, রাস্তার কিনারা প্রভৃতি স্থানে রৈখিক বসতি গড়ে ওঠে।

iii. বিক্ষিপ্ত বসতিতে অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়। পক্ষান্তরে রৈখিক বসতির অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন অনেক দৃঢ় হয়।

iv. বিক্ষিপ্ত বসতির যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত হলেও রৈখিক বসতির যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই ভালো।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বসতি দুটিতে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা থেকে সহজে এদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়।

প্রশ্ন ▶৩ হান্নান সাহেব রাঙামাটি বেতারকেন্দ্রে চাকরি করেন। সেই সুবাদে তিনি রাঙামাটি এলাকায় বাস করেন। তিনি ছুটিতে তার গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জে আসেন। এই দুই এলাকার বসতির মধ্যে তিনি অনেক তারতম্য খুঁজে পান।

◀ *শিখনফল: ১*

ক. নগর কাকে বলে? ১

খ. নগর গড়ে ওঠার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দুটি এলাকায় কোন ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এলাকা দুটিতে বসতির ভিন্নতায় ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে তোমার নিজস্ব যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষিবিহীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পুঞ্জিভবনকে নগর বলে।

খ নগরায়ণের উৎপত্তিতে ভূমির অবস্থান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন সামাজিক সুবিধাজনক অবস্থা (যেমন: স্কুল, কলেজ) এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে সুন্দর বাসোপযোগী পরিবেশে (যেমন: নদীর অবস্থান) নগর গড়ে ওঠে। আবার যেসব অঞ্চলের জলবায়ু পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে ভালো, খনিজ ও কৃষি সম্পদ সহজলভ্য এবং সাগর, নদী বা অনুরূপ পানিপথে অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে সেখানেই নগর গড়ে উঠেছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি এলাকা অর্থাৎ রাঙামাটি ও সিরাজগঞ্জে যথাক্রমে বিচ্ছিন্ন ও অনুকেন্দ্রিক বসতি গড়ে উঠেছে।

রাঙামাটি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। এখানে যেসব উপজাতীয় বসতি গড়ে উঠেছে সেগুলো বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির। এই সমস্ত বসতি ঝরনা বা পানির উৎসের কাছাকাছি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছে।

সিরাজগঞ্জে সারিবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ বসতি গড়ে উঠেছে। সিরাজগঞ্জ যমুনা নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত। নদীর পাড়ে এ অঞ্চলে সারিবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু ভাঙনপ্রবণ হওয়ার কারণে সর্বক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক এ প্রতিকূলতাকে জয় করে সিরাজগঞ্জে সংঘবদ্ধ বসতিও গড়ে উঠেছে। ফলে অধিবাসীরা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে সংঘবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে পারবে আবার সামাজিক সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করতে পারবে। সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে তাই সংঘবদ্ধ বসতি এবং কিছু সারিবদ্ধ বসতি গড়ে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত এলাকা দুটি অর্থাৎ রাঙামাটি ও সিরাজগঞ্জে বসতির যে ভিন্নতা রয়েছে তাতে ভৌগোলিক পরিবেশই প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে বলে আমি মনে করি।

পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন ধরনের বসতি রয়েছে। প্রতিটি বসতির ধরনে যে ভিন্নতা তা ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের কারণেই হয়ে থাকে। উদ্দীপকের রাঙামাটি ও সিরাজগঞ্জের বসতির ধরনের ভিন্নতার ক্ষেত্রেও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট। এ দুইটি অঞ্চলে ভূমিরূপগত ভিন্নতা, জলবায়ুর পার্থক্য এবং জীবিকা অর্জনের ধরন বসতির মধ্যে ভিন্নতা এনেছে।

বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার ভূমিরূপ পাহাড়ি বন্ধুর প্রকৃতির। সেখানে পানির উৎস ঝরনাও বিক্ষিপ্ত অবস্থানে রয়েছে। প্রচুর বৃষ্টিপাত, বনভূমির অবস্থান সেখানে বসতি গড়ে তোলার প্রতিবন্ধক। রাঙামাটিতে জীবিকার জন্য ভালো কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থাও নেই। ফলে পাহাড়ের ঢালে পানির উৎসের নিকটে যেখানে কিছু কৃষিকাজ বা পশুপালন সম্ভব সেখানে বিচ্ছিন্ন বসতি গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে সিরাজগঞ্জের ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। যমুনা নদীর তীরবর্তী সিরাজগঞ্জে উর্বর পলল মৃত্তিকার কৃষিভূমি বিস্তৃত। বিস্তীর্ণ সমভূমিতে মৌসুমি বৃষ্টিপাতের আশীর্বাদে কৃষির ফলনও প্রচুর। জীবিকার সংস্থান করা খুব সহজ। নদীর ধারে অথবা সামাজিক যোগাযোগের প্রয়োজনে বিভিন্ন সুবিধা (যেমন– হাট) কে কেন্দ্র করে এখানে সারিবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ বসতি গড়ে উঠেছে।

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে এ দুটি অঞ্চলে বসতির ধরনে ভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ টিপুর পাশের গ্রাম কুমারপাড়া। সেখানে কয়েকটি পরিবার একত্রে বসবাস করে। তাদের বাড়িগুলোর মধ্যে দূরত্ব কম। টিপুদের গ্রামের অধিকাংশ লোক তাদের পাশের গ্রামে উৎপাদিত পণ্যগুলোর পরিবহন ও বাজারজাতকরণের কাজ করে।

◀ শিখনফল: ২

ক. বিচ্ছিন্ন বসতি বাংলাদেশের কোথায় দেখা যায়? ১

খ. রৈখিক বসতি গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. টিপুদের পাশের গ্রামের বসতি কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. টিপুদের গ্রামের বসতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন অনুযায়ী পৌর বসতির অন্তর্ভুক্ত– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় বিচ্ছিন্ন বসতি দেখা যায়।

খ যেসব বসতি অঞ্চলের ঘরগুলো পাশাপাশি অবস্থান করে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে রৈখিক বসতি বলে। সাধারণত নদীর তীরে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে।

বন্যামুক্ত উচ্চভূমি, নদী অববাহিকা, হাওর এলাকা, অনুকূল আবহাওয়া ইত্যাদি রৈখিক বসতি গড়ে ওঠার জন্য সহায়ক।

গ টিপুদের পাশের গ্রামটি হলো কুমারপাড়া।

সাধারণত পেশার প্রাধান্য অনুসারে গ্রামীণ বসতিগুলো চিহ্নিত করা যায়। যেমন– জেলে বসতি, কুমার বসতি ইত্যাদি। টিপুদের পাশের গ্রামের অধিবাসীরা কুমার পেশার সাথে জড়িত।

কুমারদের তৈরিকৃত পণ্য মৃৎশিল্প নামে পরিচিত। এ শিল্পের কাজ সরাসরি কৃষিকাজের সাথে সম্পর্কিত না হলেও এটি অকৃষিজাত প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যারা জড়িত থাকে তারা সাধারণত গ্রামে থাকে। কুমারপাড়ার বাড়িগুলোর মধ্যে দূরত্ব কম থাকায় এবং একই রকম পেশায় নিয়োজিত বলে একে গ্রামীণ বসতির গোষ্ঠীবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ বসতি বলা যায়।

ঘ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন অনুযায়ী টিপুদের গ্রামটি পৌর বসতির অন্তর্ভুক্ত।

টিপুদের গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিকাজের সাথে জড়িত নয়; বরং তারা নিজেদের পাশের গ্রামে উৎপাদিত মৃৎশিল্পের পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত যা পৌর বসতির বৈশিষ্ট্য।

টিপুদের গ্রামের অধিবাসীরা প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, পরিবহন ও বণ্টনের সাথে যুক্ত যা তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। যেসব বসতির বেশির ভাগ লোক কৃষি ছাড়া অন্যান্য পেশাতে অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ের কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে তাকে পৌর বসতি বলে। এ ধরনের বসতিতে বাড়িগুলো একসাথে অবস্থান করে, পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হয়, বিভিন্ন বিনিময় কেন্দ্র থাকে এবং বসতিগুলোর সুনির্দিষ্ট আকৃতি ও অবস্থান দেখা যায়। পৌর বসতি নির্ধারণে সাধারণত দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়; যেমন– অধিবাসীদের উপজীবিকা এবং জনসংখ্যার আকার। উদ্দীপকে টিপুদের বসতিটি তাদের উপজীবিকা তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন অনুযায়ী টিপুদের গ্রামের বসতি পৌর বসতির অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৫ বিশালের গ্রামের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে। একটি বড় পুকুরের পাশে তাদের বাড়িসহ চারদিকে আরও অনেকগুলো বাড়ি রয়েছে। এবার ঈদে বিশাল তার পরিবারের সাথে সেন্টমার্টিন ভ্রমণ করতে যায়। সেখানে তারা তাঁবু টানিয়ে রাত্রি যাপন করে।

◀ শিখনফল: ২

ক. বসতি বলতে কী বোঝ? ১

খ. বিশালদের গ্রামের বসতি কীরূপ বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. সেন্টমার্টিনে রাত্রি যাপনের জন্য যে ধরনের বসতি গড়ে তোলা হয়েছিল সে অনুযায়ী বসতির শ্রেণিবিভাগ করো। ৩

ঘ. বিশালদের গ্রামীণ বসতিসহ বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ সংক্ষেপে লিখো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বসতি বলতে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য তৈরি আবাসস্থলকে বোঝায়।

খ বিশালদের গ্রামের বসতি অনুকেন্দ্রিক বসতি।

বিশালদের বাড়ি যেহেতু একটি বড় পুকুরের পাশে এবং তাদের বাড়িসহ আরও অনেকগুলো বাড়ি পুকুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাই এটি একটি অনুকেন্দ্রিক বসতি। অনুকেন্দ্রে এমন একটি সুবিধা বা প্রতিষ্ঠান থাকে যাকে কেন্দ্র করে বসতি গড়ে ওঠে।

গ সেন্টমার্টিনে রাত্রি যাপনের জন্য বিশালরা যে বসতি গড়ে তুলেছে তা ক্ষণস্থায়ী বসতি।

স্থায়িত্বের ভিত্তিতে বসতিকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. ক্ষণস্থায়ী বসতি, ২. অস্থায়ী বসতি, ৩. স্থায়ী বসতি।

ক্ষণস্থায়ী বসতি: অতীতে শিকারি ও খাদ্য সংগ্রাহক মানবগোষ্ঠীর বসতির প্রকৃতি ছিল ক্ষণস্থায়ী। এ বসতিতে বসবাসরত লোকের

সংখ্যা খুব কম। ছোটখাটো ১০ থেকে ১০০ জনের একটি দল হতে পারে। বর্তমানে অনেকে বিনোদনের জন্য বিভিন্ন স্থানে এরূপ বসতি গড়ে তোলে।

অস্থায়ী বসতি: অস্থায়ী বসতির অধিবাসীরাও ক্ষণস্থায়ী বসতির লোকদের মতো জায়গা বদল করে তবে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদি। এ বসতির জনগোষ্ঠীরা যাযাবর নামে পরিচিত। অস্থায়ী বসতিতে বসবাসকারী শিকারি, খাদ্য সংগ্রাহক ও কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিপ্রধান অঞ্চলে দেখা যায়।

স্থায়ী বসতি: স্থায়ী বসতি বহুদিনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। সময়ের বিবর্তনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের একই জমিতে উপর্যুপরি ফসল ফলানোর কৌশল আয়ত্ত করার সুফল হিসেবে স্থায়ী বসতির সূত্রপাত হয়।

ঘ বিশালদের গ্রামের বসতি হলো সংঘবদ্ধ অনুকেন্দ্রিক বসতি।

বসতি বলতে বসবাসের জন্য কোনো আবাসস্থলকে বোঝায়। বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতিকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায় যথা: ক. বিক্ষিপ্ত বসতি খ. সংঘবদ্ধ বসতি ও গ. বিচ্ছিন্ন বসতি। এসব বসতিকে আকৃতির ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিচে তা আলোচনা করা হলো—

ক. **বিক্ষিপ্ত বসতি:** বিক্ষিপ্ত বসতি বলতে এমন একটি একককে বোঝায় যা ২/৩টি ঘরের সমষ্টি অথবা ১/২টি পরিবারের ৫/৭ জনের আবাসস্থল।

খ. **সংঘবদ্ধ বসতি:** একটি বসতি অন্য একটি বসতি থেকে খুব কাছে অবস্থিত হয়ে যখন একটু বড় রূপ নেয় তখন একে সংঘবদ্ধ বসতি বলে। এরূপ বসতির সংঘবদ্ধ রূপকে ভিত্তি করে বসতির বিন্যাসকে আরও কতকগুলো বিভাগে বিভাজিত করা যায়। যেমন— (১) সারিবদ্ধ, (২) পুঞ্জীভূত ও (৩) অনুকেন্দ্রিক।

সারিবদ্ধ: যেসব বসতি অঞ্চলের ঘরগুলো পাশাপাশি অবস্থিত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত একটি দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন আকারে বর্তমান থাকে তাকে সারিবদ্ধ বা রৈখিক বসতি বলে। এ ধরনের বসতি কখনো কখনো ৮-১০ কিমি. পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

পুঞ্জীভূত: প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে যখন অনেকগুলো ঘরবাড়ি পরস্পর খুব কাছাকাছি অবস্থিত হয়ে একটি সম্মিলিত রূপ লাভ করে তখন এ বসতিকে পুঞ্জীভূত বসতি বলে।

অনুকেন্দ্রিক বসতি: এ ধরনের বসতিতে পরস্পর গোষ্ঠী, একটি উঠান বা অন্যান্য সুবিধা নিয়ে অনেকগুলো ঘরবাড়ি গড়ে তোলে যা অনুকেন্দ্রিক বসতি হিসেবে পরিচিত হয়ে থাকে।

গ. **বিচ্ছিন্ন বসতি:** বিক্ষিপ্ত বসতির একটি ভিন্ন মাত্রা হলো বিচ্ছিন্ন বসতি। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় যে সব উপজাতীয় বসতি গড়ে উঠেছে সেগুলো বিচ্ছিন্ন বসতি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গ্রামীণ বসতির মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ করা যায় যার ভিত্তিতে গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ তমা জামালপুর তার মামার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে যায়। সে দেখল সেখানকার বাড়িগুলো নদীর ধার ঘেঁষে লাইনের মতো গড়ে উঠেছে। প্রিতমের নিজ এলাকার বাড়িগুলো এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি অনেক দূরে অবস্থিত এবং সেথায় ভূ-প্রকৃতি উঁচু-নিচু। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. পল্লি বসতি কী? ১

খ. বসতির ভিন্নতায় ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তমার মামার গ্রামে যে ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে তার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তমার নিজ এলাকার বসতিগুলো গড়ে ওঠার পিছনে শুধু ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতাই কি দায়ী- যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৩-৫ টি ক্ষুদ্রাকাকার বসতি বাড়ি নিয়ে কোনো পাহাড়িয়া বা চর এলাকার যে ক্ষুদ্রাকায় বসতি গড়ে ওঠে তাকে পল্লি বসতি বলে।

খ বেঁচে থাকার জন্য মানুষ বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে সেখানকার সব ভৌগোলিক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বসতি স্থাপন করে থাকে। বসতি স্থাপনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণেই বসতির পার্থক্য লক্ষ করা যায়; যেমন- মেরু অঞ্চলে বরফের তৈরি দরজা, জানালাবিহীন নিচু গামলার মতো ইগলুর ঘর, মোচাকৃতি বনাঞ্চলে কাঠের ঘর, উষ্ণ মরু অঞ্চলে কাদার ঘর, নিরক্ষীয় আর্দ্র বনাঞ্চলে পাতা ও খড়ের ঘর ইত্যাদি।

গ তমার মামার গ্রামে যে ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে তা হলো সারিবদ্ধ বা রৈখিক বসতি। নিচে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করা হলো-

যে বসতি নদীর তীরবর্তী উঁচু ভূমি, রাস্তা বা রেলপথের উভয় পাশে সরলরেখার ন্যায় গড়ে ওঠে তাকে সারিবদ্ধ বা রৈখিক বসতি বলে। এ ধরনের বসতি ৫-৬ মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। বাংলাদেশের ছোট-বড় সব নদীর তীরে বড় বড় রাস্তার পাশে এ ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে। অন্যভাবে বলা যায়, যে বসতির ঘরবাড়িগুলো পাশাপাশি অবস্থান করে একটি অবিচ্ছিন্ন মালার মতো সৃষ্টি করে তাকে রৈখিক বা সারিবদ্ধ বসতি বলে।

নদী বা প্রশস্ত সড়ক পথের উভয় পাশে নিচু ও বন্যা কবলিত ভূমি থাকলে বসতি বাইরের দিকে প্রসার লাভের জায়গা পায় না বলে নদীর প্রাকৃতিক বাঁধ বা রাস্তার পাশের জায়গায় সারিবদ্ধ বসতি বিকাশ লাভ করে। নদী, রেলপথ ও প্রশস্ত রাস্তা এ ধরনের বসতির পরিবহনে সহায়তা করে থাকে। নদী থেকে মিষ্টি পানি, সেচের পানি ও প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। নদী তীরবর্তী অঞ্চল পলিমাটি সমৃদ্ধ বলে উর্বর এবং সেখানে অল্প পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রচুর ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব। এসব কারণে নদী ও রাস্তার পাশে রৈখিক বা সারিবদ্ধ বসতি দেখা যায়।

পরিশেষে বলা যায় তমার মামার বাড়ি সিরাজগঞ্জে যে বসতি দেখেছে তা সারিবদ্ধ বা রৈখিক বসতি এবং নদীর প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাকে কেন্দ্র করেই এ ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে।

ঘ তমার নিজ এলাকার বসতিগুলো বিক্ষিপ্ত বসতির অন্তর্গত। এ ধরনের বসতিগুলো গড়ে ওঠার জন্য শুধু ভূ-প্রকৃতির বন্ধুরতাই দায়ী। নিচে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করা হলো-

যে বসতি বিশেষ কোনো নিয়ম মেনে গড়ে ওঠে না তাকে বিক্ষিপ্ত বসতি বলে। এ জাতীয় বসতি কৃষিভূমির উর্বরতা,

কৃষি পণ্যের প্রাপ্যতা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন নদী অববাহিকা অঞ্চল, পার্বত্য এলাকা ও সুন্দরবন এলাকার অধিকাংশ বসতি ও এ ধরনের বসতি। এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠার পশ্চাতে ভূপ্রকৃতি ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। পাহাড়ি এলাকার উঁচুনিচু অসমতল ভূমির জন্য বসতি বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। সাধারণত ভূমি অসমতল হওয়ায় কৃষিকাজের জন্য ভূমি একত্রে পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কৃষি জমির নিকটে জনবসতি তৈরি হয় এবং এ কারণেই বসতিগুলো পৃথক পৃথক স্থানে গড়ে ওঠে। আবার মাটি অনুর্বর হলে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠে। যে সব এলাকায় পানির কোনো অভাব হয় না সেসব এলাকায় বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে ওঠে। যেসব এলাকায় বন যত বেশি গভীর হয় বসতি তত বেশি বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ভূ-পৃষ্ঠের ওপর কোনো স্থানে যদি বসতিগুলো পাশাপাশি না থেকে আলাদা আলাদাভাবে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় থাকে তবে তাকে বিক্ষিপ্ত বসতি বলে। তাই বলা যায়, তমার নিজ এলাকার বাড়িগুলো বিক্ষিপ্ত বসতি এবং এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠার জন্য ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতাই দায়ী।

প্রশ্ন ▶ ৭ পলাশের বাড়ি গাইবান্ধা। তাদের এলাকায় কৃষিজমির মাঝে বসতি গড়ে ওঠেছে। অন্যদিকে জুলফিকারের বাড়ি টাঙ্গাইলের মধুপুরে। তাদের এলাকায় অনেকগুলো পরিবার একত্রে বসবাস করে। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. বসতি গড়ে উঠার প্রাকৃতিক কারণগুলো কী কী? ১

খ. হাট ও বাজারের মধ্যে পার্থক্য লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের পলাশের বসতির চিত্র অঙ্কন করে দেখাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশে জুলফিকারের বসতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বসতি গড়ে উঠার প্রাকৃতিক কারণগুলো হলো ভূপ্রকৃতি, মাটির বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু, সূর্যালোক, পানির সহজলভ্যতা ইত্যাদি।

খ সাধারণত যে স্থানে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বা আদান-প্রদান করা হয় তাকে হাট-বাজার বলে।

হাট ও বাজারের মধ্যে পার্থক্য হলো—

i. হাট সপ্তাহে ১/২ দিন অথবা সর্বোচ্চ তিন দিন পর্যন্ত বসে থাকে। অন্যদিকে বাজার প্রতিদিন বসে।

ii. বেশির ভাগ হাটে অস্থায়ী ছাউনী দেখা যায়। পক্ষান্তরে বাজারে স্থায়ী ছাউনী থাকে।

iii. হাট সাধারণত গ্রামে এবং বাজার শহরে দেখা যায়।

গ পলাশ গ্রামীণ বিক্ষিপ্ত বসতির বাসিন্দা।

তাদের এলাকায় বসতিগুলো কৃষিজমির ফাঁকে ফাঁকে গড়ে ওঠেছে। যা বিক্ষিপ্ত বসতি নির্দেশ করে। বিক্ষিপ্ত বসতি বলতে ২/৩টি ঘরের সমষ্টি বা ১/২ পরিবারের ৫/৭ জনের আবাসস্থলকে বোঝায়।

নিচে বাংলাদেশের বিক্ষিপ্ত গ্রামীণ বসতির চিত্র অঙ্কন করা হলো:

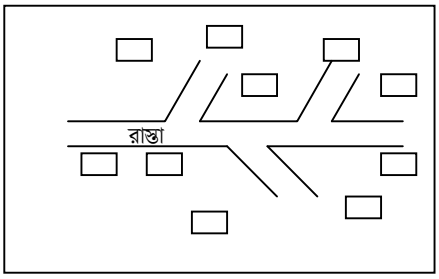

চিত্র : বিক্ষিপ্ত বসতি

ঘ জুলফিকারের বাড়ি টাঙ্গাইলের মধুপুরে। তাদের এলাকায় অনেকগুলো পরিবার একত্রে বসবাস করে, যা পুঞ্জীভূত বসতি নির্দেশ করে।

কোনো বিশেষ সুবিধার (পানীয়জল, মৃত্তিকা) জন্য যখন কোনো স্থানে অনেকগুলো বাড়ি একত্রে অবস্থান করে তখন তাকে পুঞ্জীভূত বসতি বলে। এ বসতিকে নিবিড় বসতিও বলা হয়।

নিচে পুঞ্জীভূত বসতির কতগুলো বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো—

১. এ বসতির বাড়িগুলো খুব কাছাকাছি থাকে।
২. এ বসতির আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে পৌর বসতিতে রূপান্তরিত হয়।
৩. উদ্বৃত্ত ও সঞ্চিত সম্পদ বসতির আয়তন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
৪. এ ধরনের বসতিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অধিক থাকে।
৫. উন্নত যোগাযোগ, জীবিকা নির্বাহের সুযোগ ইত্যাদি এ বসতি গড়ে তুলতে সহায়তা করে।
৬. সাধারণত কৃষিভূমি বসতি এলাকা থেকে অনেক দূরে থাকে।
৭. প্রতিটি বসতি আধাপাকা বা কাঁচা রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত থাকে।
৮. বাংলাদেশের সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চল, মধুপুর গড়, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এ বসতির আধিক্য দেখা যায়।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে এ ধরনের বসতির প্রাধান্য দেখা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৮ নয়নদের গ্রামের স্কুলের খোলা মাঠে প্রতি শনিবার আশপাশের গ্রাম থেকে ক্রেতা ও বিক্রেতারা মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনিময় করে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এবং নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতার এ ধরনের সমাবেশ একটি বিশেষ নামে পরিচিত। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. নগরায়ণ কী? ১

খ. হাট ও বাজারের মধ্যে পার্থক্য লেখো। ২

গ. নয়নদের গ্রামে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের এ ধরনের সমাবেশ কী নামে পরিচিত ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বাজার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি স্থানে মানুষ একত্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যে অবয়ব তৈরি করে তাই বসতি।

খ সাধারণত যে স্থানে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বা আদান-প্রদান করা হয় তাকে হাট-বাজার বলে।

হাট ও বাজারের মধ্যে পার্থক্য হলো–

i. হাট সপ্তাহে ১/২ দিন অথবা সর্বোচ্চ তিন দিন পর্যন্ত বসে থাকে। অন্যদিকে বাজার প্রতিদিন বসে।
ii. বেশির ভাগ হাটে অস্থায়ী ছাউনি দেখা যায়। পক্ষান্তরে বাজারে স্থায়ী ছাউনি থাকে।
iii. হাট সাধারণত গ্রামে এবং বাজার শহরে দেখা যায়।

গ নয়নদের গ্রামে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের এ ধরনের সমাবেশ গ্রামীণ হাট নামে পরিচিত।

গ্রামীণ হাট এমন একটি সুনির্দিষ্ট স্থান যেখানে নির্দিষ্ট এলাকার কিছুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনিময় করে। অন্যভাবে বলা যায়, হাট হলো নির্দিষ্ট সময় অন্তর এবং নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতার একটি সমাবেশ। নির্দিষ্ট দিন ছাড়া তা সাধারণত শূন্য পড়ে থাকে। এখানে দ্রুত পচনশীল পণ্যের সরবরাহ লক্ষ করা যায়।

হাট বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো। গ্রামীণ মানুষের স্থানীয় চাহিদা পূরণে গ্রামীণ হাট বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ঘ নিচে বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট গড়ে ওঠার সম্ভাব্য কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা হলো:

নদ-নদীর অবস্থান: নদীপথ হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন পরিবহন মাধ্যম। এই পথে সহজে ও সস্তায় মালামাল পরিবহন করা যায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামীণ হাট-বাজার নদীর তীরে অবস্থিত।

আন্তঃবিনিময় প্রবাহ: যেসব পণ্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন হয় না সেসব পণ্যদ্রব্যের চাহিদা পূরণের জন্য আন্তঃবিনিময় প্রবাহের কারণে গ্রামীণ হাট গড়ে ওঠে।

উদ্বৃত্ত পণ্য: বাংলাদেশের অধিকাংশ হাট উদ্বৃত্ত পণ্যের সমাবেশের জন্য এবং ঘাটতি পণ্যের চাহিদা পূরণের জন্য উদ্ভব হয়ে থাকে।

বিশেষ পণ্যের চাহিদা পূরণ: গ্রামীণ ব্যবসায়ীদের কল্যাণে ক্রেতাদের বিশেষ পণ্যসামগ্রীর চাহিদা পূরণের জন্য গ্রামীণ হাট গড়ে ওঠে।

প্রশাসনিক কেন্দ্র: সামাজিক জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য বিশেষ স্থান হাট। পণ্য বিনিময়, যোগাযোগ, জমি-জমা সংক্রান্ত কাজ করা, প্রভৃতির জন্য প্রশাসনিক কোনো অবকাঠামোর পাশে গ্রামীণ হাটবাজার গড়ে ওঠে।

উপরিউক্ত কারণগুলো ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ বাজার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন ▶ ৯

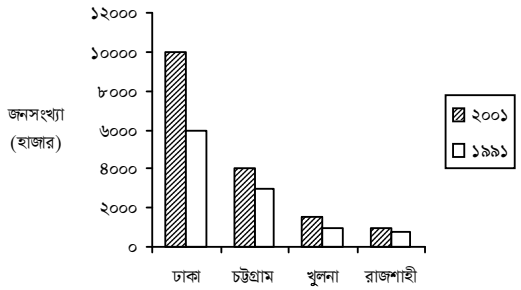

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. হাওর অঞ্চলে কোন ধরনের বসতি দেখা যায়? ১
খ. দুর্যোগমুক্ত এলাকায় বসতি গড়ে ওঠে কেন? ২
গ. উপরের লেখচিত্র থেকে উক্ত দুটো সময়ে নগরায়নের ধারা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. লেখচিত্রের আলোকে ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে নগরায়ন বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাওর অঞ্চলে সংঘবদ্ধ বসতি দেখা যায়।

খ দুর্যোগমুক্ত এলাকাকে মানুষ বসতি স্থাপনের জন্য উপযুক্ত বলে নির্বাচন করে থাকে।

মানুষ ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাকে বসতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করে থাকে। কারণ, ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে বসতি নির্মাণ করলে ক্ষয়ক্ষতিসহ, প্রাণনাশের ব্যাপক আশঙ্কা থাকে। এজন্য দুর্যোগমুক্ত এলাকায় বসতি গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকের লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নগরায়নের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

উক্ত দুটো সময়ের নগরায়নের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে ১৯৯১ সালে নগর জনসংখ্যা ছিল ৬০ লাখের উপরে যা ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগে ১৯৯১ সালে নগর জনসংখ্যার প্রায় ২৫ লাখ যেখানে ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪২ লাখের উপরে। ১৯৯১ সালে খুলনা বিভাগ ও রাজশাহী বিভাগে নগর জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে প্রায় ১৫ লাখ ও ৮ লাখ যা ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে খুলনা শহরের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৮ লাখ এবং রাজশাহী শহরের জনসংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। যেহেতু নগর জনসংখ্যা দ্বারা নগরায়নের ধারা মূল্যায়ন করা হয় তাই ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে প্রতিটি বিভাগে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নগরায়নের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১ সালের পর নগর জনসংখ্যা বার্ষিক ৩.১৫% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৬ মিলিয়নে উন্নীত হয়। এ সময় নগরায়নের হার ছিল ২৩.১০%।

সুতরাং বলা যায় যে, উপরের লেখচিত্র অনুযায়ী দুটো সময়ে নগরায়নে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে।

ঘ কোনো একটি নগরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে সেই নগরের নাগরিকে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে নগরায়ন বলে।

লেখচিত্রের আলোকে ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে নগরায়ন বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করা হলো—

নগর কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি: ১৯৯১ সালে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে যে পরিমাণ নগর কেন্দ্র ছিল ২০০১ সালে তা বৃদ্ধি পাওয়ায় নগরায়নও বৃদ্ধি পেয়েছে।

নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি: উপরের লেখচিত্রে প্রতিটি বিভাগেই দেখা যাচ্ছে ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন: ঢাকা বিভাগে ১৯৯১ সালে নগর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ লাখ যা ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১ কোটিতে দাঁড়িয়েছে।

নগরায়নের হার বৃদ্ধি: ১৯৯১ সালের তুলনায় যেহেতু ২০০১ সালে প্রতি বিভাগে নগরকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তাই স্বাভাবিকভাবে ২০০১ সালে নগরায়নের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন: ১৯৯১ সালে নগরায়নের হার ছিল ১৯.৬৩% যা ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.১০% এ দাঁড়ায়।

উপরিউক্ত নগরায়ন বৃদ্ধির কারণগুলো ছাড়াও ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, সুবিস্তৃত সমতলভূমি, যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল, অর্থনৈতিক অগ্রসরমান অঞ্চল এবং অধিক নিরাপত্তাবেষ্টিত স্থান হওয়ায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা রাজশাহী অঞ্চলের কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে নগরায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶১০ 'ক' অঞ্চলে আগে কৃষিকাজ হতো। আস্তে আস্তে এখানে অনেক শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠে। এছাড়াও বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট, পার্ক ইত্যাদি নির্মাণের ফলে এখানকার কৃষি জমিগুলো ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসে। এখানকার আধিকাংশ জনগণ এখন অকৃষি পেশায় নিয়োজিত। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. বৃত্তাকার বসতি কাকে বলে? ১

খ. দাবার ছক আকৃতির (Chess board pattern settlement) বসতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' অঞ্চলের প্রক্রিয়াকে কী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের মতো স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে এই প্রক্রিয়ার বিস্তৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বিন্যস্ত বসতির সামগ্রিক নকশাটি বৃত্তের মতো হলে, তাকে বৃত্তাকার বসতি বলে। উদাহরণ: আফ্রিকার জুলু উপজাতির বসবাস বৃত্তাকার।

খ যে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি সমকোণ বা আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত রাস্তাগুলোকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠার ফলে লোহার জালের মতো খোপ-খোপ আকার ধারণ করে, তাকে দাবার ছক আকৃতির বা জালিকাকার বসতি বলে। ইংরেজি পরিভাষায় এই প্রকার জনবসতিকে 'চেসবোর্ড' বা 'গ্রিড আয়রন' (Chess board or Grid iron)-ও বলা হয়। গন্ডকি নদীর সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত সারণ (Saran) জেলার অন্তর্গত সারিয়া (Srea) নামের গ্রামটি দাবার ছক আকৃতির গ্রামীণ বসতির একটি উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের প্রক্রিয়াকে 'নগরায়ণ' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নিচে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো-

নগরায়ণ হলো একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো একটি অঞ্চলে বা দেশে নগর বা শহর গড়ে ওঠে। গ্রাম থেকে শহরে এবং শহর থেকে শহরে মানুষের অভিগমনের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির মাধ্যমেও নগরায়ণ হয়। এর মাধ্যমে নগরের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়। সর্বোপরি এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জাতির সামাজিক পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, গ্রামীণ এলাকা অপেক্ষা শহর এলাকায় বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রক্রিয়াই হচ্ছে নগরায়নণ। সুতরাং অকৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড পুঞ্জীভূতভাবে গড়ে ওঠায় নগরের উদ্ভব। উদ্ভূত এ নগরের বিকাশ সাধনই নগরায়ণ।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' অঞ্চলের মতো স্বাধীনতা পরবর্তী সময় বাংলাদেশে নগরায়ণের প্রক্রিয়ার বিস্তৃতি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো–

১৯৭৪ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সময়ের নগরায়ণ : ১৯৭৪ সালের পর নগর সংজ্ঞার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এবং বিভিন্ন উপজেলা শহর এ সময় নগরকেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৮১ সালে নগর জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১ সময়ের মধ্যে ৩০% নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩.২৮ মিলিয়নে। এ সময় নগরায়ণের হার ছিল ১৫.১%। নগরকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৪৯২। উক্ত সময়ে গ্রাম-নগর অভিগমন এবং জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির মাধ্যমে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

১৯৯১ সালে নগরায়ণের হার আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯.৬৩%। নগরকেন্দ্রের সংখ্যা ৫২২ এবং নগর জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ২০.৮৭ মিলিয়ন। এ সময়ে নগর জনসংখ্যা প্রতিবছর ৪.৫৬% হারে বৃদ্ধি পায়।

১৯৯১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সময়ে নগরায়ণ : ১৯৯১ সালের পর নগর জনসংখ্যা বার্ষিক ৩.১৫% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৬ মিলিয়নে উন্নীত হয় এবং নগরায়ণের হার এ সময় ছিল ২৩.১০%। বর্তমানে দেশে নগরকেন্দ্রের সংখ্যা ৫৩২টি (আদমশুমারি-২০১১)। এ সময় জনসংখ্যার আকারের ওপর ভিত্তি করে ঢাকা মহানগরীকে মেগাসিটি (জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ-এর অধিক) হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। জনসংখ্যার আয়তনের দিক থেকে এরপর চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট ও বরিশালের স্থান। ২০১১ সালের শুমারি অনুযায়ীও নগরায়ণের ক্রমধারা ২০০১ সালের মতোই।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্রতম অংশ নগরে বসবাস করে। তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তুলনায় বাংলাদেশে নগরায়ণের হার বেশ উচ্চ।

প্রশ্ন ▶ ১১ তপু একজন মেধাবী ছাত্র। উচ্চ শিক্ষার সযোগ পেয়ে সে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের এমন একটি শহরে পড়তে গেল যে শহরটি শিক্ষানগরী হিসেবে পরিচিত। শিক্ষাজীবন শেষে জীবিকার প্রয়োজনে সে তার নিজ এলাকায় ফিরে এলো যেটি পূর্বে গ্রাম হিসেবে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে একটি ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে শহর হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. অভিগমন কী? ১

খ. নগর গড়ে ওঠার কারণ বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে তপুর গ্রাম থেকে শহরে আসার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তপুর গ্রামটি শহরে পরিণত হওয়ার পিছনে উদ্দীপকে কোন কারণ দেখানো হয়েছে? একটি শহর গড়ে ওঠার পেছনে উল্লেখিত বিষয়টি কতটুকু ভূমিকা পালন করে থাকে? বিশ্লেষণ করো ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করাই অভিগমন। যেমন– ঢাকা থেকে রংপুর অথবা বাংলাদেশ থেকে রাশিয়া গমন।

খ নগর গড়ে উঠতে ভূমির অবস্থান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

যে সমস্ত স্থান প্রকৃতিগত দিক থেকে বাসোপযোগী তথা জলবায়ু তুলনামূলকভাবে পার্শ্ববর্তী জলাবায়ু অপেক্ষা আরামদায়ক, খনিজ ও কৃষি সম্পদ সহজলভ্য এবং সাগর, নদীপথে তথা প্রাকৃতিক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে সেখানেই নগর গড়ে ওঠে।

গ তপুর গ্রাম থেকে শহরে আসার কারণ শহরের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা।

শহরে মানুষ শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করে। কারণ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি শহরে গড়ে ওঠে। তপুও উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য শহরে আসে। শহরে গ্রামের তুলনায় যাতায়াতের জন্য অধিকসংখ্যক রাস্তা গড়ে ওঠে। ফলে মানুষ সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিভিন্ন ধরনের পরিবহন ব্যবহার করে যাতায়াত করতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার সেবা-বুবিধা যেমন- বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও পয়ঃপ্রণালি ইত্যাদি শহরে অপরিহার্যভাবে গড়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায়, শহরে গ্রামের তুলনায় পড়াশুনার সযোগ-সুবিধা বেশি থাকার কারণে তপু গ্রাম থেকে শহরে আসে।

ঘ উদ্দীপকে তপুর গ্রামটি শহরে পরিণত হওয়ার পিছনে ইপিজেড (EPZ – Export Processing Zone) গড়ে ওঠার কারণটি দেখানো হয়েছে।

তপুর শহরটি পূর্বে গ্রাম ছিল। যেখানে একটি ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখন তা শহর হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে কোনো স্থানে ধীরে ধীরে জনবসতি ঘন হয়ে ওঠে। তারা শিল্পকারখানার আশপাশে বিভিন্ন দোকানপাট গড়ে তোলে। শিল্পকারখানাকে কেন্দ্র করে অনেক ছোট ছোট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এছাড়াও বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন– গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি সহজলভ্য হয়। এভাবে ধীরে ধীরে কোনো স্থানে গড়ে ওঠা শিল্পকারখানাকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও জনবসতি বৃদ্ধি পায়। যা পরবর্তীতে শহরে পরিণত হয়। সুতরাং বলা যায়, একটি শহর গড়ে ওঠার পিছনে ইপিজেড খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১২ মোহর আলী গ্রামে কোনো কাজ না পেয়ে ঢাকা শহরে পরিবার নিয়ে চলে আসে। এখানে এসে সে বস্তিতে বসবাস শুরু করে। তার বস্তিতে বিশুদ্ধ খাবার পানি পাওয়া যায় না। এখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। পরিবারের সদস্যদের অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গেলে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কাজের সময় চলে যায়।

◀ *শিখনফল: ৬*

ক. প্রাথমিক হাট কাকে বলে? ১

খ. হাটবাজার গড়ে ওঠার দুটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মোহর আলীর পরিবারের আলোকে নগরের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধানে তোমার সুপারিশ পেশ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাম অঞ্চলের ছোট ছোট হাটকে প্রাথমিক হাট বলে।

খ হাটবাজার গড়ে ওঠার দুটি কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

i. গ্রামীণ হাটবাজার গড়ে ওঠার মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক। কারণ কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির অন্যতম মাধ্যম হাট। তাই কৃষক তার সুবিধা অনুযায়ী নির্দিষ্ট হাটে পণ্য বেচাকেনা করে থাকে।

ii. গ্রামীণ এলাকায় পরিবহন সুবিধার অপ্রতুলতার কারণে নির্দিষ্ট দূরত্বে হাটবাজার গড়ে ওঠে, যেখানে সহজে মানুষ যাতায়াত করতে পারে।

গ উদ্দীপকে মোহর আলীর পরিবারের আলোকে নগরের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হলো-

i. বাংলাদেশের নগরসমূহে বাসস্থান সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করছে। গ্রামের একজন দরিদ্র মানুষ যখন শহরে বসবাসের জন্য আসে, তখন সে তার অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে শহরের উন্মুক্ত স্থানে বসবাস শুরু করে।

ii. নগরে জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে পাকা স্থাপনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি ও গৃহস্থালির পানি রাস্তার উপর দিয়ে চলাচল করে নগরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে।

iii. উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যহীনতার কারণে গ্রামীণ দরিদ্র্যতা থেকে নগর দারিদ্র্যতা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়।

iv. নগরের অতিরিক্ত জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ ট্যাক্স দিতে না পারায় তারা পৌর সুবিধাদির অনেকগুলো থেকে বঞ্চিত হয় এবং নগর পরিবেশকে দূষিত করে।

v. নগরের অতিরিক্ত জনসংখ্যা গৃহস্থালিতে জ্বালানি পোড়ানো এবং ধূমপানের মাধ্যমে নগরকে দূষিত করে।

vi. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশে প্রতিবছর ৩.২ মিলিয়ন শিশু ডায়রিয়াজনিত রোগে মারা যায়, এর প্রধান কারণ পানি দূষিত হওয়া।

vii. নগরের অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সবার পক্ষে স্বাস্থ্যসেবা লাভ সম্ভব হয় না।

viii. নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রয়োজনে বাড়িঘর নির্মাণ প্রয়োজন হয়, যাতে শব্দ দূষণের সৃষ্টি হয়।

এভাবে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশের নগরসমূহে বিশেষত বড় নগরসমূহে জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য নিচে আমার সুপারিশ পেশ করা হলো-

i. প্রতিটি নগরকে মহাপরিকল্পনা অনুসারে গড়ে তুলতে হবে। নগরে মহাপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন হলে প্রতিটি ভূমির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

ii. নগরে সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (যেমন- পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, বর্জ্য অপসারণ) মধ্যে সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে পারলে পরিবেশগত অনেক সমস্যা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব।

iii. নগরের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। বাজেটের পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা ট্যাক্স সংগ্রহের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

iv. নগরীর পানি নিষ্কাশন প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য খাল ও পুকুরসমূহ পুনঃখনন এবং অবৈধ দখল রোধ করতে হবে।

v. নগরীর পরিবেশ দূষণে বর্জ্য প্রভাব ফেলে। তাই জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং আইন করে নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা-আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা যথাসময়ে অপসারণ করতে হবে।

vi. নগর সরকার ব্যবস্থা চালু হলে নগরের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানে টাস্কফোর্স গঠন করে সমষ্টিগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

vii. সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণে দৃঢ় হতে হবে এবং সবার কাছে নগরের বিভিন্ন সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে।

সুতরাং আমরা যদি উপরের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারি তাহলে নগরসমূহে অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত সমস্যাসমূহ দূর করা সম্ভব হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ১৩ অপুদের গ্রামের বিদ্যালয়ের খোলা মাঠে প্রতি শুক্রবার তাদের গ্রামসহ আশপাশের গ্রাম থেকে ক্রেতা ও বিক্রেতারা মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনিময় করে। তাদের গ্রামে নির্দিষ্ট সময় অন্তর এবং নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতার এ ধরনের সমাবেশ একটি বিশেষ নামে পরিচিত। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. বসতি কী? ১

খ. গ্রামীণ বসতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. অপুদের গ্রামে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের এ ধরনের সমাবেশ কী নামে পরিচিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বাজার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি স্থানে মানুষ একত্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যে অবয়ব তৈরি করে তাই বসতি।

খ যে স্থানে সমষ্টিগত মানুষ তার নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ভূমি থেকে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকে সেই স্থানকেই গ্রামীণ বসতি বলে।

নিজ জমিতে অথবা পরের জমিতে কৃষি কাজ করা, ফসল কাটা, গোলাজাতকরণ, বাজারজাত করা, মাছ ধরা, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন, কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি গ্রামীণ বসতির মানুষের প্রধান কাজ।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বাংলাদেশের গ্রামীণ হাটের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট গড়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ১৪

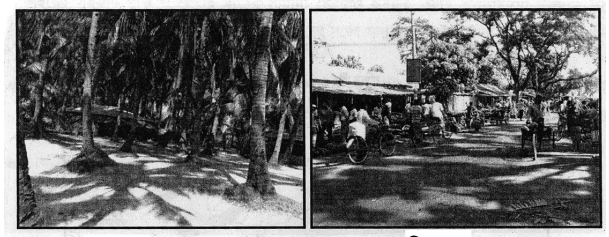

চিত্র-১ চিত্র-২

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. গ্রামীণ বসতি কাকে বলে? ১

খ. গ্রামীণ বসতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি কী? ২

গ. ২ নম্বর চিত্রে হাটবাজার গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গ্রামীণ হাটবাজার কীভাবে গড়ে ওঠে? বিশ্লেষণ করো। ৪

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষি

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ বাংলাদেশের ছেলে অভীক মিসিসিপি-মিসৌরী নদীবাহিত দেশে বেড়াতে গিয়ে দেখলো, ওখানকার মানুষের প্রধান খাদ্যশস্যটি তার নিজ দেশে শীতকালে চাষ হয় এবং ঐ খাদ্যশস্যটির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

◀ শিখনফল: ১ ও ২ [ঢা.বো., রা.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো., ২০১৭]

ক. এশিয়ার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যশস্য কোনটি? ১

খ. স্থানান্তরিত কৃষি কাকে বলে?– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অভীকের ভ্রমণকৃত দেশের প্রধান খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অভীকের নিজ দেশ ও ভ্রমণকৃত দেশের প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনে জলবায়ুগত নিয়ামকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এশিয়ার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যশস্য ধান।

খ নিরক্ষীয় ও আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলের অরণ্যভূমি এলাকায় মানুষ বন পরিষ্কার করে চাষাবাদ করে থাকে। এভাবে পরিষ্কারকৃত কৃষিভূমি দুই বা তিন বছর আবাদের পর চাষের অযোগ্য হয়ে পড়লে কৃষকরা অন্যত্র একইভাবে জমি তৈরি ও আবাদ করে। এ ধরনের কৃষি ব্যবস্থাকে স্থানান্তরিত কৃষি (Shifting Cultivation) বলে।

যেমন– বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মিয়ানমারের পাহাড়ি অঞ্চলে স্থানান্তরিত কৃষি দেখা যায়।

গ অভীক মিসিসিপি-মিসৌরী নদীবাহিত দেশ যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে যায়। সেখানে মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য গম।

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে গম মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য। ফলে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দানাদার শস্যের মধ্যে গম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বর্তমান বিশ্বের মোট উৎপাদিত গমের প্রায় ১৬ শতাংশ বিশ্ববাজারে প্রবেশ করে। সূত্র- United States Department of Agriculture-2017। গমের বিশ্ব বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উন্নত দেশগুলো গম রপ্তানি করে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো তা আমদানি করে।

সারণি : প্রধান প্রধান দেশের গমের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ-২০১৭ (হাজার মেট্রিক টন)

অবস্থান	দেশ	রপ্তানির পরিমাণ	অবস্থান	দেশ	আমদানির পরিমাণ
১.	রাশিয়া	৩৩,০০০	১.	মিশর	১২,০০০
২.	ইউরোপীয় ইউনিয়ন	২৮,৫০০	২.	ইন্দোনেশিয়া	১০,৫০০
৩.	যুক্তরাষ্ট্র	২৭,২১৬	৩.	আলেজেরিয়া	৮,২০০
৪.	কানাডা	২১,০০০	৪.	ব্রাজিল	৭,৫০০
৫.	অস্ট্রেলিয়া	১৭,৫০০	৫.	বাংলাদেশ	৬,৫০০

(Source : United States Department of Agriculture-2017)

রপ্তানিকারক দেশ : রাশিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, ইউক্রেন প্রধান গম রপ্তানিকারক দেশ। দেশগুলো নিজেদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ব বাজারে গম রপ্তানি করে থাকে।

আমদানিকারক দেশসমূহ : গম আমদানিকারক দেশগুলো অনিয়মিতভাবে বা অনির্ধারিতভাবে গম আমদানি করে থাকে। যেমন— ভারত, পাকিস্তান, কিউবা প্রভৃতি দেশে গম আমদানির পরিমাণ বাড়ছে। আবার আলজেরিয়া, চীনে কমছে। ২০১৭ সালে প্রধান গম আমদানিকারক দেশের মধ্যে রয়েছে মিশর, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়া, ব্রাজিল, জাপান, বাংলাদেশ, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি দেশ।

ঘ অভীক বাংলাদেশের অধিবাসী। এখানে প্রধান খাদ্যশস্য ধান। তার ভ্রমণকৃত দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খাদ্যশস্য গম। এ দুটি ফসলের উৎপাদনে জলবায়ুগত নিয়ামকের ভিন্নতা রয়েছে।

ধান চাষে জলবায়ু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। জলবায়ুর উপাদানগুলোর মধ্যে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা এ দুটির উপর ধান চাষের উৎপাদন নির্ভর করে। অন্যদিকে গম উৎপাদনের প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহের মধ্যেও জলবায়ু প্রধান।

i. **বৃষ্টিপাত :** ধান চাষের জন্য বার্ষিক গড় ১০০-২৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাতের দরকার। তবে যেসব স্থানে বৃষ্টিপাত ১৭৫-২২৫ সে.মি. সেসব স্থানে ধানের ফলন ভালো হয়। গম চাষের জন্য অবস্থান অনুসারে বার্ষিক গড়ে ৩০-১০০ সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

ii. **তাপমাত্রা :** ধান চাষের জন্য সাধারণত ১৮°-২৭° সে. তাপমাত্রার প্রয়োজন। ধান বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য ১৬° সে. অপেক্ষা অধিক তাপমাত্রা প্রয়োজন। চারা বৃদ্ধিকালীন সময় তাপমাত্রা ২২°-২৪° সে. এর মধ্যে থাকা আবশ্যক। অপরদিকে গম চাষের আদর্শ তাপমাত্রা হচ্ছে ১৫°-২০°সে.। গম চাষের প্রাথমিক অবস্থায় কম এবং ফসল পাবার সময় বেশি তাপমাত্রা (১৮°সে.-২২°সে.) থাকা প্রয়োজন।

বিশ্বের প্রায় ৯৫ শতাংশ ধান উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। যেমন– ভিয়েতনাম, চীন, থাইল্যান্ড। আর গম মূলত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শস্য। যেমন– আমেরিকা ও কানাডার প্রেইরি অঞ্চল। সুতরাং বলা যায়, ধান ও গম উৎপাদনে জলবায়ুর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২ শাকির গ্রীষ্মের ছুটিতে মামা বাড়ি বেড়াতে গিয়ে সবুজে আচ্ছাদিত বাগানের মাঝে উঁচু উঁচু বৃক্ষ দেখতে পায়। ব্যাপক এলাকায় চাষ হলেও সেখানকার ভূমিরূপ সমতল নয়। কারণ জানতে চাইলে তার মামা জানালেন যে, উক্ত ফসলের জন্য মাঝে মাঝে ছায়া এবং কিছু উঁচু জমির প্রয়োজন। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে উক্ত কৃষিপণ্যের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ◀ *শিখনফল: ৪ [চা.বো., রা.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো., ২০১৭]*

ক. কৃষির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. ভূমিরূপ কীভাবে ধান চাষকে প্রভাবিত করে?– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষিপণ্যটি বরিশাল অঞ্চলে কেন হয় না? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতপূর্ণ কৃষিপণ্যটির বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমি কর্ষণ বা চাষ করার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করাই হচ্ছে কৃষি। যেমন– গম চাষ।

খ ভূমিরূপ ধান চাষকে প্রভাবিত করে থাকে।

উচ্চভূমি অপেক্ষা সমতল ও নিম্নভূমি ধান চাষের উপযোগী। বিশ্বের প্রায় ৯০ ভাগ ধান নদী গঠিত প্লাবন সমভূমি এবং বদ্বীপ সমভূমি অঞ্চলে (যেমন– বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনাম) উৎপন্ন হয়। এছাড়া বৃষ্টিবহুল পার্বত্য অঞ্চলেও পাহাড়ের গায়ে ধানের চাষ করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষিপণ্যটি হচ্ছে চা। বাংলাদেশের বরিশাল অঞ্চলে ভূপ্রকৃতি ও মৃত্তিকা অনুকূল না হওয়ায় চা উৎপাদন সম্ভব হয় না।

চা চাষের জন্যে যে অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা প্রয়োজন তা বরিশালে নেই। যেমন– সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬০০ থেকে ১২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত পার্বত্য ঢালু অঞ্চলে চা বাগান গড়ে তোলা হয়। পার্বত্য ঢালু অঞ্চল অপেক্ষাকৃত শীতল এবং সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হলেও গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকে না। চা বাগান তৈরির জন্য এ ধরনের পরিবেশ অবশ্য প্রয়োজন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চা গাছের উচ্চতা পাতার গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। অথচ বরিশাল সমুদ্র তীরবর্তী একটি অঞ্চল, যা সমুদ্রতল হতে ১০ ফুটের বেশি উঁচু নয়। বরিশালের মৃত্তিকাও চা চাষের জন্য উপযোগী নয়। এখানে মৃত্তিকা উর্বর দোআঁশ ও পলি দোঁআশ। অথচ চা চাষের জন্য কিছুটা অম্লধর্মী অথবা লৌহ মিশ্রিত মৃত্তিকা প্রয়োজন।

সুতরাং বলা যায়, প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহ অনুকূল না হওয়ায় বরিশালে চা উৎপন্ন হয় না।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতপূর্ণ কৃষিপণ্যটি হচ্ছে চা। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

১৮২৮ সালে এ দেশে প্রথম চায়ের বাগান গড়ে উঠেছে (চট্টগ্রামের কোদালায়)। ১৯৫৬-৬০ সালের মধ্যে সিলেটের মালনিছড়ায় পরিকল্পিত চা বাগান গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে এদেশে ১৬৭টি চা বাগান রয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ অনুযায়ী, ২০১৬ সালে ৬৬.৩৫ মিলিয়ন কেজি চা উৎপন্ন হয়। এদেশে ৫৯৬০৯.৪৩ হেক্টর এলাকায় চা বাগানে প্রায় ৩ লাখ শ্রমিক নিয়োজিত। এছাড়া রয়েছে প্রায় ৩ হাজার কর্মচারী এবং ১ হাজারের মতো কর্মকর্তা। বর্তমানে সিলেট এবং চট্টগ্রাম ছাড়াও, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁওয়ে চা চাষ করা হচ্ছে।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশের চায়ের উৎপাদন এবং রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪০ ও ৩০.৯ মিলিয়ন কেজি। ১৯৯০ সালে ৪৫.৮ এবং ২৬.৯ মিলিয়ন কেজি। ২০০০ সালে তা বেড়ে দাড়ায় ৫২.৬৪ এবং ১৮.১ মিলিয়ন কেজি। ২০১০ সালে বাংলাদেশ ৫৯.১৬ মিলিয়ন কেজি উৎপন্ন করে ০.৯১ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি করে। FAO এর তথ্যমতে, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ৬০,০৫৯ হেক্টর জমিতে ৬৪,৫০০ মেট্রিক টন চা উৎপাদন করে। ২০২৩ সালে মধ্যে বাংলাদেশ ১০০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে (Strategic development plan 2012-2023)।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেকারত্ব লাঘব ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে চা ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। অভ্যন্তরীণ ব্যাপক চাহিদা থাকায় চা বর্তমানে রপ্তানিতে তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না। তবে দেশের অভ্যন্তরে চায়ের উৎপাদন ও বাণিজ্য ঊর্ধ্বমুখী। ২০২৩ সালে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারলে রপ্তানি বাণিজ্যেও চা ভূমিকা রেখে দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করতে অবদান রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৩ লাঙল-জোয়ালের বদলে ট্রাক্টরের ব্যবহার বর্তমান সময়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খণ্ড খণ্ড জমিগুলোতে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। ফলে গনি মিয়ার (প্রাচীন পদ্ধতির কৃষক) বংশধরগণ বর্তমানে ফসল উৎপাদনের সকল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পাশাপাশি সরকারি সহযোগিতার জন্য কৃষিক্ষেত্রের সুফল ভোগ করছে।

◀ *শিখনফল: ৪ [চা.বো., রা.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো., ২০১৭]*

ক. কৃষিকাজ কাকে বলে? ১

খ. কানাডার প্রেইরি তৃণভূমিকে "পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি" বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় কীভাবে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত দু'টি সময়ের কৃষি পদ্ধতির সুবিধা– অসুবিধা মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমিকর্ষণ বা চাষ করার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করাকে কৃষিকাজ বলে। যেমন– গম চাষ।

খ কানাডার প্রেইরি তৃণভূমি অঞ্চলটি বিশ্বের একক বৃহত্তম গম উৎপাদক অঞ্চল। স্থানীয় চাহিদার অতিরিক্ত গম উৎপন্ন হয় বলে এ অঞ্চলের অধিকাংশ গম রুটি প্রস্তুতের জন্য দেশ-বিদেশের বাজারে রপ্তানি করা হয়। এ কারণে উত্তর আমেরিকার এ অঞ্চলকে 'পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি' বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদের কথা বলা হয়েছে। যেমন– লাঙল-জোয়ালের বদলে ট্রাক্টরের ব্যবহার। মূলত বাংলাদেশের কৃষিতে ট্রাক্টর, ড্রাম সিডার, হারভেস্টার মেশিন, হিমাগার প্রযুক্তিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। বর্তমানে এদেশের কৃষিতে (স্বল্প পরিসরে) আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে, যা এদেশের কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব বয়ে এনেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে ট্রাক্টর ব্যবহারের ফলে অল্প সময়ে অনেক জমি চাষ করা যাচ্ছে। বীজ বপনে ড্রাম সিডার ব্যবহারের ফলে কম পরিশ্রমে বিস্তীর্ণ জমিতে সারিবদ্ধভাবে বীজ বপন করা সম্ভব হচ্ছে। আবার ফসল সংগ্রহে হারভেস্টার মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে, যা খরচের পাশাপাশি আমাদের মূল্যবান সময়ও বাঁচিয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় (রাজশাহী, বগুড়া) হিমাগার নির্মিত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন পচনশীল দ্রব্য (আলু) পচনের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। এতে কৃষকগণ আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের কৃষিতে প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম, যা কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব বয়ে এনেছে।

ঘ উদ্দীপকে দু'টি সময়ের তথা প্রাচীন ও আধুনিক কৃষি পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে।

আধুনিক কৃষি বলতে কৃষিক্ষেত্রে উন্নত যন্ত্রপাতি ও উপকরণের ব্যবহার এবং ফসলাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা কৃষি কাঠামোয় পরিবর্তন আনয়নকে বুঝায়।

আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা জমি চাষ, উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল বীজ বপন, কীটনাশক ওষুধ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার, উন্নত সেচ পদ্ধতি চালু এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সবই কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত। সনাতন পদ্ধতিতে কাঠের লাঙল ও পশুর দ্বারা জমি চাষ করা হতো। সেচের জন্য যে পানির প্রয়োজন হতো তার জন্য প্রকৃতির দেয়া বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করতে হতো। সার হিসেবে জমিতে গোবর বা অন্য কোনো দেশীয় সার ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তিতে ট্রাক্টর, বুলডোজার, পাওয়ার টিলার, হারভেস্টার, পাওয়ার পাম্প প্রভৃতি যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষি কাজ করা হয়।

বাংলাদেশে যান্ত্রিক চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। এছাড়া গভীর ও অগভীর নলকূপ, শক্তিচালিত পাম্প প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিতে উন্নত সেচ ব্যবস্থা চালু করায় প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পয়েছে।

ট্রাক্টরের সাহায্যে সনাতন পদ্ধতির তুলনায় একই সময়ে কয়েক গুণ বেশি জমি চাষ করা যায়। উপরন্তু এদেশে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত জাতের গরুর অভাব এবং গো খাদ্যেরও দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে। তাই পাওয়ার টিলার ও ট্রাক্টর ব্যবহারে এ সমস্যার সমাধান সহজ। এছাড়া শ্রমিকের অভাব এবং অত্যধিক মজুরি কৃষিক্ষেত্রে মৌসুমভিত্তিক যে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে তা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার ফলে বুঝা যায়, বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক উন্নয়নে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ৪

◀ *শিখনফল: ১ ও ২ [দি. বো. ২০১৭]*

ক. মিশ্র কৃষি কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' অঞ্চলে কৃষির ভৌগোলিক কোন নিয়ামকসমূহ বেশি প্রভাব বিস্তার করে– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'খ' অঞ্চলে ব্যাপকভাবে উৎপাদিত খাদ্যশস্যটির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো কৃষি খামারের এক অংশে কৃষিকাজ করে ফসল উৎপাদন এবং অপর অংশে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি প্রতিপালিত হলে তাকে মিশ্র কৃষি বলে। যেমন- একই পুকুরে মাছ ও হাঁস পালন।

খ বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি এদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত। দেশের মোট উৎপাদনের (জিডিপি) ১৪.৭৯ শতাংশ কৃষিখাত থেকে আসে। এদেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ প্রতি বছর কৃষির প্রধানতম খাত যেমন– ফসল উৎপাদন (১৩৪,৩২২ কোটি), পশুপালন (৩৩,১৬৫ কোটি), মৎস্য চাষ (৩৭,৯২০ কোটি টাকা) ইত্যাদি থেকে প্রচুর আয় করে থাকে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। (সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭)।

গ মানচিত্রের 'ক' অঞ্চলটি হলো দক্ষিণ এশিয়া। অঞ্চলটি কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল হতে এগিয়ে রয়েছে।

যেকোনো অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনের জন্য অনুকূল নিয়ামক (factors) একান্ত আবশ্যক। দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিকাজের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো (যেমন- ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, নদনদী প্রভৃতি) অধিক ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন অর্থনৈতিক (মূলধন, শ্রমিক, বাজার) ও সাংস্কৃতিক (জনসংখ্যা, প্রযুক্তি, সরকারি নীতি) নিয়ামকও এ অঞ্চলের কৃষির উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে।

নিচে দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিকাজে ভৌগোলিক নিয়ামকগুলো বর্ণনা করা হলো—

১. সমতল ভূমিতে যত নিবিড়ভাবে কৃষিকাজ করা যায়, পাহাড়ি অঞ্চলে তা সম্ভব হয় না। দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশই সমুদ্র তীরবর্তী সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলের কৃষির উপর ভূপ্রকৃতির ভূমিকা তাই অনেক বেশি। দক্ষিণ এশিয়ার পাহাড়ি ঢালু জমিতে চা, কফি, রাবার প্রভৃতি এবং সমতল ভূমিতে ধান, গম, পাট, সরিষা, ভূট্টা প্রভৃতি ভাল উৎপাদিত হয়।

২. দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিকাজ জলবায়ুর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ধান ও গম উৎপাদনের জন্য যথাক্রমে ১৬-২৭ এবং ১০-১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন। ১৫০ থেকে ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ধান চাষ ভাল হয়। এ অঞ্চলের ক্রান্তীয় মৌসুমি এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে ধান ও গম ভাল জন্মে। যেমন— ভারত, চীন, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশ।

৩. দক্ষিণ এশিয়ার নদীবাহিত উর্বর পলি দোআঁশ মৃত্তিকায় ধান, পাট, ভূট্টা প্রভৃতি ফসল ভাল জন্মে।

৪. নদ-নদী পানির অন্যতম প্রধান উৎস। তাছাড়া পলি সঞ্চয়ের কারণে নদ-নদীর উভয় তীর কৃষিকাজের জন্য উপযোগী। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার নদী অববাহিকা অঞ্চলে অধিক কৃষিকাজ হয়ে থাকে।

ঘ মানচিত্রে 'খ' চিহ্নিত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে উৎপাদিত ফসলটি হলো গম।

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে গম মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য। ফলে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দানাদার শস্যের মধ্যে গম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বর্তমান বিশ্বের মোট উৎপাদিত গমের প্রায় ১৬ শতাংশ বিশ্ববাজারে প্রবেশ করে। সূত্র- United States Department of Agriculture-2017। গমের বিশ্ব বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উন্নত দেশগুলো গম রপ্তানি করে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো তা আমদানি করে।

সারণি : প্রধান প্রধান দেশের গমের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ-২০১৭ (হাজার মেট্রিক টন)

অবস্থান	দেশ	রপ্তানির পরিমাণ	অবস্থান	দেশ	আমদানির পরিমাণ
১.	রাশিয়া	৩৩,০০০	১.	মিশর	১২,০০০
২.	ইউরোপীয় ইউনিয়ন	২৮,৫০০	২.	ইন্দোনেশিয়া	১০,৫০০
৩.	যুক্তরাষ্ট্র	২৭,২১৬	৩.	আলেজেরিয়া	৮,২০০
৪.	কানাডা	২১,০০০	৪.	ব্রাজিল	৭,৫০০
৫.	অস্ট্রেলিয়া	১৭,৫০০	৫.	বাংলাদেশ	৬,৫০০

(Source : United States Department of Agriculture-2017)

রপ্তানিকারক দেশ : রাশিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, ইউক্রেন প্রধান গম রপ্তানিকারক দেশ। দেশগুলো নিজেদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ব বাজারে গম রপ্তানি করে থাকে।

আমদানিকারক দেশসমূহ : গম আমদানিকারক দেশগুলো অনিয়মিতভাবে বা অনির্ধারিতভাবে গম আমদানি করে থাকে। যেমন— ভারত, পাকিস্তান, কিউবা প্রভৃতি দেশে গম আমদানির পরিমাণ বাড়ছে। আবার আলজেরিয়া, চীনে কমছে। ২০১৭ সালে প্রধান গম আমদানিকারক দেশের মধ্যে রয়েছে মিশর, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়া, ব্রাজিল, জাপান, বাংলাদেশ, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি দেশ।

প্রশ্ন ▶৫ রুহানের বাড়ি ঢাকার মতিঝিলে। দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ যেসব উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ দ্রব্য ভোগ করে, সেসব দ্রব্য কীভাবে উৎপন্ন হয় তা সে দেখেনি বললেই চলে। তবে রুহান তার পাঠ্যবইয়ে পড়েছে যে, পৃথিবীতে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করে পানি ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক জন্ম ও বৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে এসব দ্রব্য উৎপন্ন করে। এ উৎপাদন আবার জলবায়ু, মাটি, ভূপ্রকৃতি প্রভৃতির উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

[অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা] ◀ শিখনফল: ১

ক. ধান চাষে সহায়ক তাপমাত্রার পরিমাণ কত? ১

খ. আখ চাষের উপযোগী মৃত্তিকার ধরন কেমন? ২

গ. রুহান মূলত কীসের নিয়ন্ত্রণের কথা পড়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রুহানের পঠিত উপাদানগুলো ছাড়াও দ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী আরও অনেক উপাদান রয়েছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধান চাষে সহায়ক গড় তাপমাত্রার পরিমাণ ২২° সেলসিয়াস।

খ প্রতিটি ফসলের মতোই আখ চাষে উপযোগী মৃত্তিকা রয়েছে। চুন ও পটাশ মিশ্রিত মাটি, দোঁআশ মৃত্তিকা আখ চাষের পক্ষে উপযোগী। এ ধরনের মৃত্তিকায় অধিক নাইট্রোজেন থাকে বলে আখ চাষের জন্য উপযোগী।

গ রুহান মূলত কৃষিকার্য যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান বা নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সে সম্পর্কে পড়েছে।

কৃষিকার্য জলবায়ু, মাটি, ভূপ্রকৃতি প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের পেছনে জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা প্রভৃতি নিয়ামকগুলো কাজ করে। যথা:

জলবায়ু: জলবায়ু কৃষিকার্যের প্রধান ভৌগোলিক নিয়ামক। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন ও তার বণ্টন, কৃষি পদ্ধতি সবকিছু জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই বিভিন্ন জলবায়ুতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ হয়। যেমন-নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে রাবার চাষ; ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে ধান, পাট; নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে গম ব্যাপকভাবে চাষ হয়।

ভূপ্রকৃতি: কৃষিকাজ ভূপ্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমতল ভূমি পলিমাটি দ্বারা গঠিত। তাই এ ভূমি কৃষিকাজের অনুকূল। তাই পৃথিবীর অধিকাংশ কৃষিকাজ সমতল ভূমিতে হয়। যেমন— বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমি এলাকায় ধান, গম, যব, ভুট্টা চাষ হয়। অন্যদিকে উঁচু পাহাড়, টিলা পার্বত্য অঞ্চলের অসমতল জমিতে কৃষিকাজ কষ্টসাধ্য। তবে অনেক ক্ষেত্রে পাহাড়ে ধাপ কেটে কৃষিকাজ করা হয়। যেমন— পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম চাষ।

মৃত্তিকা: মাটি বা মৃত্তিকা কৃষিকাজের অন্যতম একটি নিয়ামক। কৃষিকাজের সাফল্য মাটির ওপরই নির্ভরশীল। মাটির উর্বরাশক্তির ওপর কৃষির উৎপাদন নির্ভর করে। অনুর্বর মাটিতে কৃষিকাজ কষ্টকর।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, ফসল উৎপাদনে উপরিউক্ত প্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।মূলত কৃষিকার্যে প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর ভূমিকা সর্বাধিক কার্যকর। রুহান পাঠ্যবইয়ে তাই জানতে পারবে।

ঘ রুহানের পঠিত প্রাকৃতিক উপাদানগুলো ছাড়াও কৃষি দ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী অন্যান্য উপাদানগুলো হলো– ১. অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান ইত্যাদি।

i. মূলধন : কৃষিকাজের জন্য ট্রাক্টর, বীজ ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি প্রভৃতি বাবদ পর্যাপ্ত মূলধন প্রয়োজন। তাই মূলধন ছাড়া কৃষিকাজ সম্ভব নয়।

ii. শ্রমিক : জমি চাষ, সেচ প্রদান, ফসল সংগ্রহ, মাড়াই করা প্রভৃতি কাজের জন্য অনেক শ্রমিক প্রয়োজন। পর্যাপ্ত শ্রমিক পাওয়া গেলে কৃষিকাজ সহজ হয়।

iii. পরিবহন: উৎপাদিত পচনশীল ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের জন্য উন্নত ও আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

iv. বাজার: পৃথিবীর যে অঞ্চলে যে পণ্যের চাহিদা বা বাজার থাকে সে অঞ্চলে সেই ধরনের কৃষি পণ্য উৎপাদিত হয়। যেমন– শ্রীলংকার চা চাষ।

প্রশ্ন ▶৬

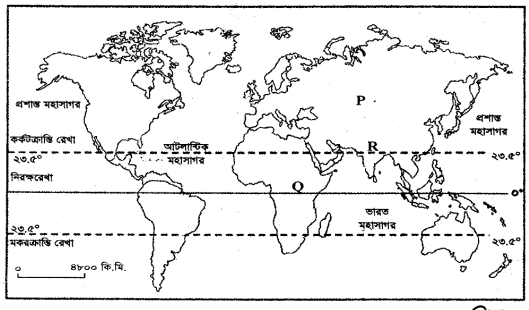

◀ *শিখনফল: ২*

ক. চা উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি? ১

খ. চা চাষের জন্য পৃথিবীর কোন অঞ্চল প্রসিদ্ধ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মানচিত্রে 'P' চিহ্নিত অঞ্চলে অধিক চা উৎপাদিত হওয়ার প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'Q' ও 'R' চিহ্নিত অঞ্চল দুটির মধ্যে চা উৎপাদনের তারতম্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চা উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশ হলো চীন।

খ চা চাষের জন্য এশিয়া অঞ্চল প্রসিদ্ধ।

এশিয়া মহাদেশে বিশ্বের প্রায় ৮০% (৫,০৬৬,৯৪৫ মেট্রিক টন) চা উৎপাদন করা হয়ে থাকে (সূত্র : FAOSTAT-2018)। এছাড়া চা চাষের উপযোগী নিয়ামক যেমন– জলবায়ু, মৃত্তিকা, ভূপ্রকৃতি, ছায়াদানকারী বৃক্ষ ছাড়াও শ্রমিক, মূলধন, পরিবহন ব্যবস্থা, বাজার, কৃষি উপকরণ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকায় এ অঞ্চলটি চা উৎপাদনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

গ মানচিত্রে 'P' চিহ্নিত অঞ্চল তথা এশিয়া মহাদেশে অধিক চা উৎপাদিত হওয়ার পেছনে বেশ কিছু প্রাকৃতিক নিয়ামক ক্রিয়াশীল।

অর্থকরী ফসলের মধ্যে সারাবিশ্বে পানীয় হিসেবে চা সর্বাধিক জনপ্রিয়। বিশ্বের ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বাগিচা কৃষির (Farming) ফসল হিসেবে চা উৎপন্ন হয়। এশিয়ার চীন, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, জাপান প্রভৃতি দেশেই বিশ্বের অধিকাংশ চা উৎপন্ন হয়। চা চাষের জন্য এশিয়ার বিদ্যমান প্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

জলবায়ু: চা চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন। ফলে অধিক উত্তাপ ও বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে চায়ের আবাদ ভালো হয়, যা এ অঞ্চলে বিদ্যমান রয়েছে।

মৃত্তিকা: পানি সহজেই নেমে যায় এমন উর্বর লৌহ মিশ্রিত দোআঁশ মাটি চা চাষের বিশেষ উপযোগী। সেই সাথে পরিমাণমতো নাইট্রোজেন, জিঙ্ক ও পটাশিয়াম মিশ্রিত মৃত্তিকা বিদ্যমান থাকায় এশিয়ায় চায়ের ফলন ভালো হয়।

ভূপ্রকৃতি: উচ্চভূমিতে পানি নিষ্কাশন দ্রুত ও সহজে হয় বলে পৃথিবীর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট চা বাগান উচ্চ ভূমিতেই অবস্থিত। কারণ চা গাছের গোড়ায় পানি জমলে তা সহজেই মরে যায়। এ কারণে পাহাড়ের ঢালে চায়ের চাষ হয়ে থাকে, যা এ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

উপর্যুক্ত প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহের কারণে 'P' চিহ্নিত অঞ্চলে অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশে অধিক চা উৎপন্ন হয়।

ঘ মানচিত্রে 'Q' চিহ্নিত অঞ্চলটি হলো কেনিয়া এবং 'R' চিহ্নিত অঞ্চলটি হলো ভারত। দুটি অঞ্চলেই চা চাষের জন্য অনুকূল ভৌগোলিক নিয়ামক উপস্থিত থাকলেও উৎপাদনগত তারতম্য রয়েছে।

এশিয়া তথা বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষস্থানীয় চা উৎপাদনকারী দেশ ভারত। এ দেশে কয়েক হাজার চা বাগান রয়েছে। বেশির ভাগ বাগান আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিবহুল পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং-এর চা বাগান থেকে বিশ্বমানের চা উৎপাদিত হয়। এখানকার চা বাগানগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২০০ মিটারের অধিক উচ্চতায় অবস্থিত। মেঘালয় এবং দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু ও কেরালা রাজ্যে অবস্থিত বাগানগুলো থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চা পাতা সংগ্রহ করা হয়। ২০১৬ সালে ভারতে ১,২৫২,১৭৪ মেট্রিক টন চা পাতা উৎপাদিত হয়েছে।

অন্যদিকে কেনিয়া পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম চা উৎপাদক দেশ। এটি আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় চা উৎপাদনকারী দেশ। ২০১৬ সালে এখানে প্রায় ৪৭৩,০০০ মেট্রিক টন চা উৎপন্ন হয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, ভারত ও কেনিয়ার চা উৎপাদনের পরিমাণগত তারতম্য রয়েছে।

সূত্র : FAOSTAT-2018।

প্রশ্ন ▶ ৭ খুলনা অঞ্চলের মৎস্য ব্যবসায়ী আব্বাস উদ্দীন। তার দুটি ট্রলার আছে। মাছ ধরার পাশাপাশি তিনি এগুলো আনা-নেয়ার কাজেও ব্যবহার করেন। এটাই তার কর্মসংস্থানের একমাত্র মাধ্যম। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. ধান কী জাতীয় ফসল? ১

খ. ঋতু নিরপেক্ষ ফসল বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত ক্ষেত্র ছাড়াও কৃষির প্রাচীনতম ক্ষেত্রটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আব্বাস উদ্দীন বাংলাদেশের কৃষির যে খাতে নিয়োজিত তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধান এক প্রকার তৃণজাতীয় কৃষিজ ফসল।

খ যেসব ফসল সারা বছর চাষ করা হয় তাদেরকে ঋতু নিরপেক্ষ ফসল বা বারমাসী ফসল বলা হয়।

আমাদের দেশে ঋতু নিরপেক্ষ ফসলগুলোর মধ্যে লালশাক, বেগুন, মরিচ, পেঁপে, কলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ কৃষির প্রাচীনতম ক্ষেত্র হচ্ছে ফসল তথা শস্য উৎপাদন।

জমি চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল (ধান, গম, ডাল, পাট) নিয়ে কৃষির এই খাত গঠিত। শস্য মূলত খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল এই দুই ধরনের। বিশ্বে মোট আবাদি জমির অধিকাংশ (প্রায় ৭০ শতাংশ) ব্যবহৃত হয় খাদ্যশস্য উৎপাদনে। অবশিষ্ট জমি অর্থকরী ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যসমূহের মধ্যে ধান, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অর্থকরী ফসলসমূহের মধ্যে ডাল, তৈলবীজ, ইক্ষু, আলু, তামাক, পাট, রেশম, রাবার, চা প্রভৃতি প্রধান। বিশ্বে কৃষিখাতের প্রায় ৬০ শতাংশ লোক শস্য উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

ঘ উদ্দীপকে আব্বাস উদ্দীন মৎস্য উৎপাদনে নিয়োজিত, যা বাংলাদেশের কৃষির দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত।

বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, পুকুর ইত্যাদি জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এদেশের বিভিন্ন উৎস হতে (জলাশয়-২৮%, মৎস্য চাষ-৫৬%, সমুদ্র-১৬%) মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪.১৩৪ মিলিয়ন টন। বাংলাদেশের জিডিপিতে এককভাবে মৎস্য খাতের অবদান প্রায় ৩.৬১ শতাংশ। (সূত্র-Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh, 2018)

সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বাড়ানো গেলে এ খাতে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা সম্ভব। এছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে প্রাকৃতিক মাছের প্রাচুর্যের পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন জাতের মৎস্য চাষের অবারিত সুযোগ। বাগদা ও গলদা চিংড়ি চাষের প্রসার এ দেশের অর্থনীতিকে করেছে মজবুত। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হিমায়িত ও জীবিত মাছ রপ্তানি করে দেশের আয় হয়েছে প্রায় ৫২৬.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে চিংড়ি রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৪৪৬.০৪ মিলিয়ন ডলার। উল্লেখ্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চিংড়ি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩৪,১৮৮ মেট্রিক টন। (সূত্র-বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন-বিএফএফইএ-২০১৮) আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে মৎস্যখাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৮

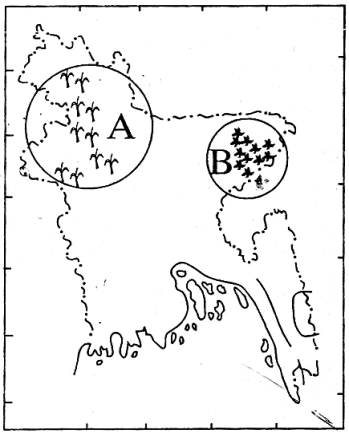

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. চিত্রের A এবং B অঞ্চলে কোন শ্রেণির কৃষি দেখা যায়? ১

খ. উত্তরাঞ্চল ইক্ষু চাষের জন্য কেন উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্রের A এবং B অঞ্চলের কৃষি ফসলের জন্য কী পরিমাণ বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্রের A এবং B অঞ্চলের কৃষি ফসলগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চিত্রের A ও B অঞ্চলে বাণিজ্যিক বাগান কৃষি দেখা যায়। এখানে যথাক্রমে ইক্ষু ও চা কৃষিকে বুঝানো হয়েছে।

খ প্রাকৃতিক নিয়ামকের অনুকূল অবস্থা বিরাজ করায় দেশের উত্তরাঞ্চলে ইক্ষু চাষ প্রসার লাভ করেছে।

ইক্ষু চাষের জন্য উর্বর চুন মিশ্রিত দোআঁশ মাটি এবং মৃদু ঢালু সমতল ভূমি প্রয়োজন। এর জন্য ১৯°–২৮° সে. তাপমাত্রা এবং প্রথমদিকে ১৫০ সে.-১৭৫. সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। এছাড়া শ্রমিক ও মূলধন প্রাপ্তি, সরকারি সহযোগিতা প্রভৃতি সুবিধা থাকায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ইক্ষু চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

গ A অঞ্চলটি হলো রাজশাহী। এখানে উৎপন্ন কৃষি ফসলটি হলো ইক্ষু। B অঞ্চল সিলেটে উৎপন্ন ফসলটি হলো চা।

ইক্ষু ও চায়ের জন্য পরিমিত পরিমাণ বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা প্রয়োজন।

ইক্ষু: ইক্ষু চাষের জন্য বৃষ্টিপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১২৫ হতে ১৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাত ইক্ষু চাষের জন্য আদর্শ। তবে ১২৫

সে.মি. এর কম বৃষ্টিপাত হলে পানি সেচের প্রয়োজন হয়। আর ফসলটি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা হচ্ছে ১৯°–২৮° সে.।

চা: চা চাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। সাধারণত ১৫০ হতে ২৫০ সে.মি. বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে চা চাষ ভালো হয়। এর জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা হচ্ছে ১৬°–১৭°সে.।

ঘ চিত্রের A ও B অঞ্চল দু'টি হলো যথাক্রমে বাংলাদেশের রাজশাহী এবং সিলেট। উক্ত অঞ্চল দু'টির কৃষির বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো–

রাজশাহী অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গা সমতল ভূমি দ্বারা গঠিত। ফলে এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ধানের চাষ হয়। এছাড়া এ অঞ্চলে গম চাষের অনুকূল অবস্থা বিরাজমান থাকায় একে গম চাষের আদর্শ অঞ্চল বলে ধরা হয়। ইক্ষু চাষের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা, চুন মিশ্রিত দোআঁশ মাটি এবং মৃদু ঢালু সমতল ভূমি থাকায় এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ইক্ষু চাষ হয়। বাংলাদেশের রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় দেশের ৭০ ভাগ তুঁত গাছের চাষ হয়। এছাড়া এ অঞ্চলে পরিমিত উত্তাপ এবং মৃত্তিকার উপযোগিতার কারণে ভূট্টা ও পাটেরও ব্যাপক চাষাবাদ হয়।
অন্যদিকে সিলেটে পাহাড়ি ঢালু জমি এবং বৃষ্টিপাতের আধিক্য থাকায় এখানে ব্যাপকভাবে চা-এর চাষ হয়। তাছাড়া এ অঞ্চলের যেসব জায়গা সমতল ভূমি দ্বারা গঠিত এবং উর্বর মৃত্তিকা বিদ্যমান সেসব জায়গায় ধানের চাষাবাদ হয়। এছাড়া কিছু পাহাড়ি ভূমিতে রাবারের চাষ করা হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, A ও B অঞ্চল দুটির মধ্যে কৃষির বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক পার্থক্য থাকায় ফসল উৎপাদনেও ভিন্নতা দেখা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৯ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের প্রায় ৬২ শতাংশ মানুষ সরাসরি একটি পেশার সাথে জড়িত। এর মাধ্যমে এ দেশে বিভিন্ন ধরনের 'X' উৎপাদন করা হয়, যা দিয়ে দেশের মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা হয়।

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. ২০১০ সালের হিসাব অনুসারে ভারতের ধান উৎপাদনের পরিমাণ কত? ১

খ. বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অধিক ধান উৎপাদন হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের পেশার সঠিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অবদান ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের উক্ত খাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১০ সালের হিসাব অনুসারে ভারতের ধান উৎপাদনের পরিমাণ ১৪.৩৯ কোটি মেট্রিক টন।

খ বাংলাদেশের সর্বত্রই ধান উৎপাদন হয়। এর মধ্যে অনুকূল পরিবেশে উত্তরাঞ্চলে সর্বাধিক ধান উৎপন্ন হয়।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে উর্বর মৃত্তিকা এবং প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা (১৮°-২৭° সে.) ও বৃষ্টিপাতের (১০০-২৫০ সে.মি.) জন্য অধিক ধান উৎপাদন হয়। তাছাড়া পর্যাপ্ত মূলধন, সুলভ শ্রমিক, ব্যাপক চাহিদা প্রভৃতি অর্থনৈতিক অবস্থাও এ অঞ্চলে ধান উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে কৃষি পেশার কথা বলা হয়েছে কারণ, বাংলাদেশের প্রায় ৬২ শতাংশ মানুষ সরাসরি কৃষি পেশার সাথে জড়িত।

কৃষির উন্নয়নে এদেশে সংশ্লিষ্ট যেসব কৃষি সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে সেগুলো সম্পর্কে নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC): এ সংস্থার মূল কাজ বীজের উৎপাদন, উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন এবং বীজের গুণ বৃদ্ধি করা। কৃষিক্ষেত্রে এ সংস্থার ব্যাপক অবদান লক্ষ করা যায়।

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ: কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ সংস্থা কৃষিতে গবেষণা ও ফলপ্রসূ কৃষি সম্প্রসারণ সেবাদানের মাধ্যমে কৃষিযন্ত্র ব্যবহারে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল: এ সংস্থা কৃষি, বন, পরিবেশ, মৎস্য ও পশুপালন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা সংস্থা (BRRI): এ সংস্থা নতুন নতুন বীজের উৎপাদন, উচ্চ ফলনশীল ধান বীজের উদ্ভাবন এবং ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা ইত্যাদিতে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা সংস্থা (BARI): এ সংস্থা বহু শস্য গবেষণায় নিয়োজিত। শস্য ব্যবস্থাপনা, রোগ ও পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, খামার যন্ত্রপাতির উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করে, যা শস্যের উৎপাদন, বিপণন এবং ভোগে অবদান রাখছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ পারমাণবিক কৃষি সংস্থা, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি বিপণন বিভাগ, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ইত্যাদি সংস্থা কৃষির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ঘ উক্ত খাতটি হচ্ছে কৃষি খাত।
বাংলাদেশে কৃষি খাতে প্রায় ৬২ শতাংশ মানুষ সরাসরি নিয়োজিত এবং দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণে খাতটি একমাত্র নির্ভরতা। এই খাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।
বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হলো কৃষি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুসারে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল প্রায় ২০ শতাংশ। বাংলাদেশের কৃষি খাতের অর্থকরী ফসল ও খাদ্যশস্য পৃথকভাবে অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। অর্থকরী ফসলের মধ্যে বাংলাদেশ ২০১৪-১৫ সালে পাট রপ্তানি করে প্রায় ৮৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। পাটের প্রধান ক্রেতা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ফ্রান্স, কানাডা প্রভৃতি। বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, রাশিয়া, মিসর ও যুক্তরাষ্ট্রে চা রপ্তানি করে। বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান উল্লেখযোগ্য। যদিও ব্যাপক স্থানীয় চাহিদার কারণে প্রতিবছর প্রচুর চাল আমদানি করতে হয়। এছাড়া অন্যান্য খাদ্যশস্য যেমন; গম, যব, ভূট্টা, ডাল ইত্যাদি উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই এগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তবে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে

স্বয়ং সম্পূর্ণতার চেষ্টা এর অর্থনৈতিক গুরুত্বকে বাড়িয়েই তুলেছে। এছাড়া মৎস্যচাষ ও পশুপালন দেশের আমিষের চাহিদা পূরণসহ অর্থনীতির অন্যতম খাত হিসেবে ভূমিকা রাখায় এ খাতের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস্য সম্পদের মধ্যে চিংড়ি রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

সুতরাং বলা যায়, কৃষি খাতের অধিকাংশ শস্য বা উপাদান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই কৃষি খাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ১০ সামীর বাংলাদেশের একটি কৃষি সংস্থায় চাকরি করেন। তার সংস্থাটি বাংলাদেশে উচ্চফলনশীল ধান বীজ উদ্ভাবন করে। সংস্থাটি গবেষণা করে লবণাক্ত স্থানে চাষের উপযোগী ধান বীজ উৎপাদন করে। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. বাংলাদেশে কতটি চা-বাগান আছে? ১

খ. বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বিবরণ দাও। ২

গ. উদ্দীপকে সামীরের সংস্থাটি কোন ধরনের? নিরূপণ করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশ এ ধরনের আরও অনেক সংস্থা রয়েছে- কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে মোট ১৬৩টি চা-বাগান আছে।

খ বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণের অন্যতম খাত হলো মৎস্যক্ষেত্র।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্য খাত উল্লেখ্যযোগ্য। এগুলো মূলত সামুদ্রিক লোনা পানির মাছ। এর মধ্যে লাক্কা, রূপচাঁদা, চিংড়ি, পোয়া, ভেটকি, কোরাল ইর্ত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমার আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ক্ষেত্রের আয়তনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ উদ্দীপকে সামীরের সংস্থাটি একটি কৃষি বিষয়ক সংস্থা। এর নাম হলো- 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট'।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ কৃষিতে উত্তরোত্তর সফলতা অর্জন করে আসছে। এর পেছনে একদিকে যেমন রয়েছে কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম, অন্যদিকে তেমনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয় এবং তার অধীন বিভিন্ন সংস্থা। আর এসব সংস্থার একটি হলো 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট'। সংক্ষেপে এ সংস্থাকে BRRI বলা হয়। এর পূর্ণ নাম Bangladesh Rice Research Institute. নতুন নতুন বীজের উদ্ভাবন, পুরানো কম উৎপাদনশীল বীজের পরিবর্তে উচ্চফলনশীল ধান বীজের উদ্ভাবন (ব্রি ধান ২৮, ৩৬) এবং ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এ সংস্থার প্রধান কাজ। এ সংস্থা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আইলা এবং সিডরের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের ফসলের যে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে, তা পুষিয়ে নিয়ে নতুন বন্যা প্রতিরোধক (Flood tolerent) লবণ সহিষ্ণু বীজ (ব্রি ধান-৪৭) উদ্ভাবন করেছে।

সুতরাং বলা যায় যে, 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট' এ দেশের কৃষিক্ষেত্রে ও কৃষকদের সহায়তা করে আসছে।

ঘ বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মতো আরও অনেক সংস্থা এদেশে রয়েছে।

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৭৫ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ বালাই দমন, মৃত্তিকা উন্নয়ন, বীজ উদ্ভাবন এবং বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয় ও তার অধীন বিভিন্ন সংস্থার ব্যাপক অবদান লক্ষ করা যায়। এ সংস্থাসমূহের মূল কাজ হলো উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন এবং বীজের গুণাগুণ বৃদ্ধি করা। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা। এটি কৃষিতে গবেষণা ও ফলপ্রসূ কৃষি সম্প্রসারণ সেবাদানের মাধ্যমে কৃষিযন্ত্র ব্যবহারে আধুনিকায়ণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করে থাকে। এ সংস্থা কৃষি, বন, পরিবেশ, মৎস্য ও পশুপালন, গ্রামীণ উন্নয়ন থেকে শুরু করে শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে কাজ করে থাকে। এ সংস্থাকে সংক্ষেপে BARC (Bangladesh Agricultural Research Institute) বলে।

কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ সংস্থা বহু শস্য যেমন- ডাল, তৈলবীজ, শাকসবজি, ফল, ফুল ইত্যাদি উন্নয়নের সাথে জড়িত। প্রজাতি উন্নয়ন ছাড়াও এ সংস্থা অপ্রচলিত এলাকা- যেখানে ফসলের চাষ হয় না, সেখানকার মাটি ও শস্য-ব্যবস্থাপনা, রোগ ও পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, সেচ ও পানি-ব্যবস্থাপনা, খামার যন্ত্রপাতির উন্নয়ন, রোপণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং খামার-পদ্ধতি এবং আর্থসামাজিক বিষয়ে গবেষণা করে থাকে। অর্থাৎ সংস্থাটি শস্যের উৎপাদন, বিপণন ও ভোগের সাথে সম্পৃক্ত।

এসব সংস্থা ব্যতীত আরও অনেক সংস্থা যেমন– বাংলাদেশ পারমাণবিক কৃষি সংস্থা (BINA), বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১১ রমজান আলী তার কৃষি জমিতে সারা বছর একই ধরনের ফসলের চাষ করেন না। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত ধানের চাষ করলেও জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তিনি তার কৃষিজমিতে ভূট্টা এবং সয়াবিনের চাষ করেন। আবার বছরের শেষ সময়ে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই চার মাস তিনি আলু ও পিঁয়াজের চাষ করেন। ◀ *শিখনফল: ৮*

ক. ঋতু নিরপেক্ষ ফসল কাকে বলে? ১

খ. চা চাষের জন্য কী ধরনের মৃত্তিকা উপযোগী? ২

গ. রমজান আলীর বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রমজান আলীর চাষকৃত ফসলগুলো কোনটি কোন ঋতুর নির্ণয় করে উক্ত ঋতুগুলোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব ফসল সারা বছর চাষ করা হয় সেগুলোকে ঋতু নিরপেক্ষ ফসল বলে। যেমন– বেগুন, সয়াবিন।

খ চা চাষের জন্য পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত ঢালু, উর্বর, লৌহ মিশ্রিত দোআঁশ মাটি বিশেষ উপযোগী। তবে সেই সাথে পরিমাণমতো নাইট্রোজেন, জিঙ্ক ও পটাসিয়াম সার প্রয়োগ করা দরকার।

গ রমজান আলী একই জমিতে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে নানা ধরনের ফসল উৎপাদন করেন। মূলত ঋতু বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি ফসল চাষ করেন।

বাংলাদেশ মৌসুমি জলবায়ুর দেশ। এ জলবায়ুর জন্য বাংলাদেশে প্রধানত তিনটি ঋতু দেখা যায়। যেমন- গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত। এ কারণে ঋতু অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদিত হয়।

যে কোনো ফসল জন্মাতে গেলে তার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। এক এক ফসল এক এক ধরনের তাপ, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতায় ভালো জন্মে। ফলে বাংলাদেশে ঋতুভেদে বিভিন্ন ফসল উৎপাদিত হয়ে থাকে। তাই রমজান আলী একই জমিতে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করেন।

ঘ রমজান আলীর চাষকৃত ফসলগুলো হলো ধান, ভূট্টা, সয়াবিন, আলু এবং পিঁয়াজ।

মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত রমজান আলী ধান চাষ করেন। এ সময় বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে। জুন থেকে অক্টোবর মাস সময়কালে তিনি তার কৃষিজমিতে ভূট্টা এবং সয়াবিনের চাষ করেন। এ সময়ে বাংলাদেশে বর্ষাকাল বিরাজ করে। আবার নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস সময়কালে তিনি আলু ও পিঁয়াজের চাষ করেন। এ সময়ে বাংলাদেশে শীতকাল বিরাজ করে।

নিচে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতকালের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হলো–

গ্রীষ্মকাল	১. বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাস (ফাল্গুন-জৈষ্ঠ্য) পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। ২. এ সময় গড় তাপমাত্রা ২৮° সেলসিয়াস। ৩. গ্রীষ্মকালে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫১ সেন্টিমিটার। কালবৈশাখী ঝড় গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ৪. গ্রীষ্মকালের জন্য বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। এ সময় বাংলাদেশের দক্ষিণ দিক থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুপ্রবাহ অধিক উত্তাপের প্রভাবে উপরে উঠে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত শীতল ও শুষ্ক বায়ু-প্রবাহের সঙ্গে সংঘর্ষে বজ্রসহ ঝড়বৃষ্টি হয়।
বর্ষাকাল	১. বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাস (জৈষ্ঠ্য-কার্তিক) পর্যন্ত বর্ষাকাল। ২. এ সময়ের গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস। ৩. বর্ষাকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আসার সময় প্রচুর জলীয়বাষ্প সমৃদ্ধ থাকে। এ জলীয়বাষ্প শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ৪. জুন মাসে বাংলাদেশের উপর সূর্যের অবস্থানের কারণে বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। বঙ্গোপসাগর থেকে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম অয়ন বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করলে বর্ষাকাল আরম্ভ হয়।
শীতকাল	১. বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস (কার্তিক-ফাল্গুন) পর্যন্ত সময়কে শীতকাল বলে। ২. এ সময় গড় তাপমাত্রা ১৭.৭° সেলসিয়াস। ৩. শীতকালে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এ সময়ে ১০ সেন্টিমিটারের অধিক নয়। ৪. উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত শীতল মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ১২

ফসলের নাম	অনুকূল অবস্থা
X	পললগঠিত প্লাবন সমভূমি ও বদ্বীপ অঞ্চল ফসলটি চাষের অনুকূল অবস্থা।
Y	ফসলটির চাষের জন্য পাহাড়ি প্রকৃতির ঢালু জমি আবশ্যক।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. চা মূলত কী? ১

খ. গম চাষের অনুকূল ভূপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'X' ফসলটি চাষের জন্য কী ধরনের জলবায়ু প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'X' এবং 'Y' ফসলটির মধ্যে কোনটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি বলে তুমি মনে করো? ৪

পঞ্চম অধ্যায়

খনিজ ও শক্তি সম্পদ

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ রিমা ও সবিতা ঢাকাতে গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করতো। ঢাকাতে গ্যাসের চুলাতে গ্যাস পাইপের মাধ্যমে সংযোগ ছিল। গৃহকর্মে গ্যাস ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তারা কাতারে গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করতে গিয়ে দেখলো ওখানে সকলে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করে। কিন্তু তারা জেনেছে ঐ দেশে গ্যাসের মজুদ অনেক বেশি। *◀ শিখনফল: ৩ [দি. বো. ২০১৭]*

ক. পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কয়লা উৎপাদন করে কোন দেশ? ১

খ. সিলেটে গ্যাস প্রাপ্তির আধিক্যের কারণ লিখো। ২

গ. রিমা ও সবিতার বৈদেশিক কর্ম এলাকা ও তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের প্রাকৃতিক গ্যাস মানচিত্র দেখাও। ৩

ঘ. রিমা ও সবিতার নিজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উক্ত খনিজের দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহার কীভাবে নিশ্চিত করা যায়– বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কয়লা উৎপাদন করে চীন। (২০১৬ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ১৬৮৫.৭ মিলিয়ন টন।)

খ সিলেটে গ্যাস প্রাপ্তির আধিক্যের কারণ হলো অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থান।

টারশিয়ারি যুগে গঠিত সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলে অধিক পরিমাণে গ্যাস পাওয়া যায়, যা নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালার অন্তর্ভূক্ত। এ অঞ্চলে ভূ-অভ্যন্তরের শিলাস্তরের নিচে উদ্ভিদ ও প্রাণির দেহাবশেষ জমা হয়ে এ গ্যাস প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ অঞ্চলে অধিক গ্যাস পাওয়া যায়।

গ উদ্দীপকের রিমা ও সবিতার বৈদেশিক কর্ম এলাকা হলো কাতার। প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে এ দেশটি মধ্যপ্রাচ্য বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ এলাকার প্রাকৃতিক গ্যাস সমৃদ্ধ অন্যান্য দেশগুলো হলো- ইরান, সৌদি আরব, ইরাক, সিরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রভৃতি। নিচে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাকৃতিক গ্যাসের মানচিত্র আঁকা হলো —

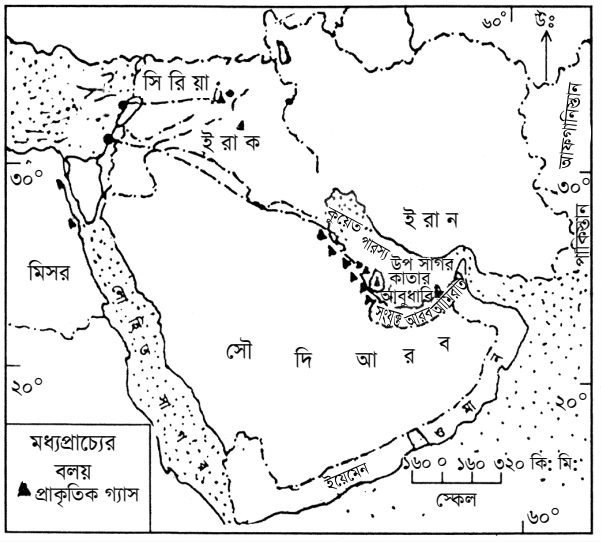

চিত্র: মধ্যপ্রাচ্যের প্রাকৃতিক গ্যাস বলয়

ঘ উদ্দীপকে প্রাকৃতিক গ্যাসের দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহার নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে।

যেকোনো সম্পদ দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহার করতে হলে এর সংরক্ষণ খুবই জরুরি। যেহেতু প্রাকৃতিক গ্যাস একটি অনবায়নযোগ্য সম্পদ সেহেতু এর দীর্ঘমেয়াদী প্রাপ্যতার জন্য এর সংরক্ষণও জরুরি। ব্যবহারে বাহুল্য হ্রাস, বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংরক্ষণ সম্ভব। নিচে প্রাকৃতিক গ্যাসের দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারের ক্ষেত্রে করণীয় বিশ্লেষণ করা হলো —

ব্যবহারের বাহুল্য হ্রাসকরণ: অতিমাত্রায় সম্পদ ব্যবহার করলে এর দ্রুত বিনাশ ঘটবে। তাই প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পদের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার: ক্ষয়িষ্ণু সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে প্রবাহমান সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি করলে সম্পদ সংরক্ষিত হবে। যেমন– বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য শক্তি (পানি, সূর্যের আলো ইত্যাদি) ব্যবহার করা।

অগ্রাধিকারভিত্তিক ব্যবহার: অল্প ব্যবহারে অধিকতর প্রয়োজন মিটবে এরূপ উদ্দেশ্য খনিজ সংরক্ষণের সহায়ক হয়। যেমন– বিদ্যুৎ উৎপাদনে খনিজ তেল ব্যবহার না করে পরিবহন কাজে ব্যবহার করলে খনিজ তেলের সাশ্রয় হয়।

অপচয় বন্ধ করা ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার: খনিজ উৎপাদন ও ব্যবহারের সময় যাতে অপচয় না হয় তা লক্ষ করতে হবে। যেমন– বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখা যায় না। কিন্তু কয়লা সঞ্চয় করে রাখা যায়।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি: কারিগরি উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেলে অপেক্ষাকৃত অল্প কাঁচামালে অধিক পরিমাণ শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব।

সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি: প্রাকৃতিক গ্যাস সীমাহীন নয়। এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে সকল স্তরের অর্থনৈতিক কাজকর্মে সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হবে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো যথাযথ পালনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার নিশ্চিতের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২ রংপুরের রহিমা তার এলাকায় প্রাপ্ত খনিজের উত্তোলন ও ইটভাটায় সেটির ব্যবহার দেখে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু সে ঢাকায় এসে অন্য একটি খনিজের রান্নায় ব্যবহার দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়। এই খনিজটির অধিকাংশই শিল্প কারখানায় বিশেষ করে কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় সার তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ◀ *শিখনফল: ৩ [সকল বোর্ড-২০১৬]*

ক. শক্তি সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. কীভাবে কয়লার সৃষ্টি হয়? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতপূর্ণ খনিজ দুটির মানচিত্রে অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকে উল্লিখিত খনিজদ্বয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে শক্তি সম্পদ বলে। যেমন: প্রাকৃতিক গ্যাস।

খ উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে কয়লার সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞানীদের মতে, অতি প্রাচীনকালে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের (ভূমিকম্প) কারণে অসংখ্য গাছপালা ও প্রাণীর মৃতদেহ মাটির নিচে চাপা পড়ে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এসব গাছের কাণ্ড, গুঁড়ি, শাখা-প্রশাখা, লতাপাতা এবং প্রাণীর মৃতদেহ ভূঅভ্যন্তরের তাপ, চাপ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে কয়লায় পরিণত হয়।

গ রংপুরের রহিমার এলাকায় প্রাপ্ত খনিজটি হলো কয়লা। সে ঢাকায় এসে যে খনিজটির ব্যবহার দেখলো সেটি হলো প্রাকৃতিক গ্যাস।

নিচে খনিজ দুটির অবস্থান মানচিত্রে দেখানো হলো–

বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহ–

১. কৈলাসটিলা, ২.হরিপুর, ৩. ছাতক, ৪. বিয়ানীবাজার, ৫. মৌলভীবাজার, ৬. ফেঞ্চুগঞ্জ, ৭. রশিদপুর, ৮. বাখরাবাদ, ৯. কামতা, ১০. তিতাস, ১১. বেগমগঞ্জ, ১২. ফেনী, ১৩. সেমুতাং, ১৪. শাহবাজপুর, ১৫. সাঙ্গু, ১৬. কুতুবদিয়া, ১৭. হবিগঞ্জ, ১৮, নরসিংদী, ১৯, মেঘনা, ২০. সালদানদী, ২১. সুন্দরপুর, ২২. শ্রীকাইল, ২৩. জালালাবাদ, ২৪. বিবিয়ানা, ২৫. বাঙ্গুরা, ২৬. রূপগঞ্জ এবং ২৭. ভোলা।

বাংলাদেশের কয়লাক্ষেত্রসমূহ–

১. রানীপুকুর, ২. বড়পুকুরিয়া, ৩. ফুলবাড়ি, ৪. দীঘিপাড়া, ৫. জামালগঞ্জ এবং ৬. খালাসপীর।

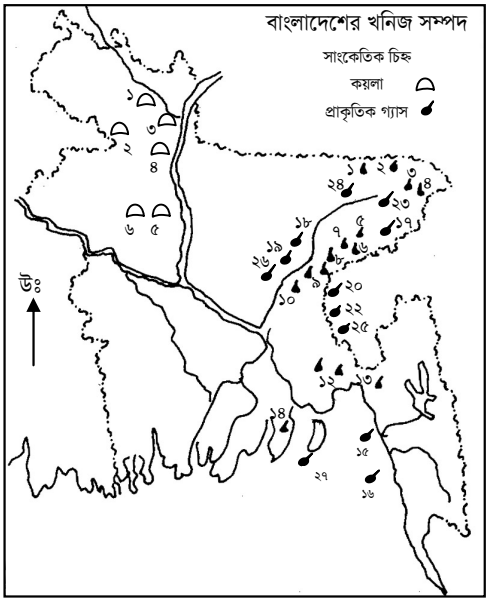

চিত্র: বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ(প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা)।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত খনিজ দুটি হলো কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লিখিত খনিজ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন–

কয়লা: কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া থেকে উত্তোলিত কয়লার ৬৫ শতাংশ বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশিষ্ট ৩৫ শতাংশ ইটভাটা, কলকারখানাসহ বিভিন্ন খাতে ব্যবহৃত হয়। বনজ সম্পদ রক্ষায় কয়লা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস: প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্পকারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফেঞ্চুগঞ্জের সার কারখানায় ও ছাতকের সিমেন্ট কারখানায় হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ঘোড়াশালের সার কারখানায় তিতাস গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কীটনাশক, ওষুধ, রাবার, প্লাস্টিক, কৃত্রিম তন্তু প্রভৃতি তৈরির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ফার্নেস তেলের পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। যেমন– সিদ্ধিরগঞ্জ, আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও গৃহস্থালি, যানবাহন ও বাণিজ্যিক কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, কৃষির উন্নতি, বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হ্রাস, সরকারি আয়ের উৎস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই খনিজ দ্রব্যগুলো যথেষ্ট অবদান রাখে। এজন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উক্ত খনিজদ্বয়ের তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৩ মনির সাহেব পেট্রোবাংলায় চাকরি করেন। সাম্প্রতি চীন সফরে গিয়ে তিনি দেখতে পান সেখানকার শিল্প স্থাপনাগুলোতে আকরিক লৌহ গলাতে একটি বিশেষ শক্তি সম্পদ ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্পদটি আমাদের দেশে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। *◀ শিখনফল: ২*

ক. বাংলাদেশে কোন সম্পদটি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়? ১

খ. ধাতব ও অধাতব খনিজের মধ্যে পার্থক্য লিখো। ২

গ. উদ্দীপকের শক্তি সম্পদটির শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শক্তি সম্পদটির বিশ্বব্যাপী উৎপাদন আলোচনা করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।

খ ধাতব ও অধাতব খনিজের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। যেসব খনিজ ধাতব পদার্থ দ্বারা তৈরি তাকে ধাতব খনিজ বলে। যেমন– লৌহ, নিকেল, ক্রোমিয়াম, তামা, সীসা, সোনা, রূপা ইত্যাদি। অন্যদিকে, যেসব খনিজে ধাতব পদার্থ থাকে না তাদেরকে অধাতব খনিজ বলে। যেমন– সালফার, পটাশ, গ্রাফাইট, অভ্র, জিপসাম প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে শক্তি সম্পদ কয়লার কথা বলা হয়েছে।

কার্বনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কয়লাকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা: ১. পিট, ২. লিগনাইট, ৩. বিটুমিনাস এবং ৪. অ্যানথ্রাসাইট।

পিট: এটি কয়লার প্রাথমিক পর্যায়। এতে কার্বনের পরিমাণ ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ। এ কয়লা জ্বালালে প্রচুর ধোঁয়া নির্গত হয়।

লিগনাইট: এটি নিকৃষ্ট মানের কয়লা। এতে কার্বনের পরিমাণ ৩৫ থেকে ৫০ শতাংশ। এতে কম পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয়।

বিটুমিনাস: এতে কার্বনের পরিমাণ ৫০ থেকে ৮৫ শতাংশ। কার্বনের পরিমাণ অনুযায়ী এই কয়লাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা:

i. **স্টিম কয়লা:** কার্বনের পরিমাণ ৮০ শতাংশের বেশি।

ii. **হাউসহোল্ড কয়লা:** কার্বনের পরিমাণ ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ।

iii. **কোকিং কয়লা:** কার্বনের পরিমাণ ৫০ শতাংশের কম।

অ্যানথ্রাসাইট: এ জাতীয় কয়লায় কার্বনের পরিমাণ ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটি উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত শক্তি পদার্থটি হলো কয়লা। বিভিন্ন দেশের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহৃত হয়।

কয়লা উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

নিচে কয়লার বিশ্বব্যাপী উৎপাদন আলোচনা করা হলো:

যুক্তরাষ্ট্র: পৃথিবীর সর্বাধিক কয়লা সঞ্চিত আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এর পরিমাণ প্রায় ২৫১,৫৮২ মি. টন। এই দেশের কয়লা উন্নতমানের অ্যানথ্রাসাইট শ্রেণির। যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা খনিগুলো পেনসিলভানিয়ার অ্যাপলেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চল, নিউ অরলিন্স, হিউস্টন, পোর্টল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। ২০১৬ সালে দেশটির কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৬৪.৮ মিলিয়ন টন।

রাশিয়া: রাশিয়ায় সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ১৬০,৩৬৪ মি.টন। এদেশের কুজনেস্ক কয়লাক্ষেত্র পৃথিবী বিখ্যাত। বৈকাল হ্রদ ও সাইবেরিয়ার নদী অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণির বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়। এছাড়া ইউরাল পর্বতের উত্তরাংশ, শাখালিন দ্বীপ, মধ্য সাইবেরিয়ায় প্রচুর উন্নতমানের কয়লা উৎপাদিত হয়। ২০১৬ সালে দেশটির কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৯২.৮ মিলিয়ন টন।

চীন: পৃথিবীর বৃহত্তম কয়লা উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে চীন। চীনের অধিকাংশ কয়লা বিটুমিনাস ও অ্যানথ্রাসাইট শ্রেণির। এদেশের শানসি, আনহুই, হুনান, হুবেই, লিয়াওনিং প্রভৃতি প্রদেশে কয়লা খনিগুলো অবস্থিত। ২০১৬ সালে দেশটির কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১,৬৮৫.৭ মি.টন। চীনে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ২৪৪,০১০ মিলিয়ন টন।

অস্ট্রেলিয়া: দেশটির প্রধান খনিসমূহ নিউসাউথ ওয়েলসের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত। এছাড়া নিউক্যাসেল, কুইন্সল্যান্ড, ভিক্টোরিয়া এবং তাসমানিয়ায় প্রচুর কয়লা উত্তোলন করা হয়। দেশটিতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ২৪৪,০১০ মি. টন। ২০১৬ সালে দেশটির কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৯৯.৩ মিলিয়ন টন। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে অস্ট্রেলিয়া কয়লা রপ্তানি করে থাকে।

ভারত: দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতই একমাত্র কয়লা সমৃদ্ধ দেশ। ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ কয়লা পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যে। অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে ছত্তিশগড়, তামিলনাড়ু প্রভৃতি প্রদেশে কয়লা খনিগুলো অবস্থিত। দেশটির সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৯৪,৭৬৯ মি. টন। ২০১৬ সালে দেশটির কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৮৮.৫ মিলিয়ন টন। ভারত তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে (মিয়ানমার, থাইল্যান্ড) প্রচুর কয়লা রপ্তানি করে থাকে।

[সূত্র : Statistical Review of World Energy-2017]

প্রশ্ন ▶৪ 'ক' একটি খনি থেকে কয়লা উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান। তারা বিভিন্ন খনি থেকে কয়লার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে। 'A' ক্ষেত্রের নমুনায় দেখা যায় এতে ৩০-৩৫ ভাগ কার্বন রয়েছে। 'B' ক্ষেত্রের নমুনায় ৩৫ থেকে ৪৫ ভাগ কার্বন পাওয়া যায়। 'C' ক্ষেত্রে ৬০ ভাগ কার্বন রয়েছে। 'D' ক্ষেত্রের নমুনা পরীক্ষা করে ৯০ ভাগ কার্বন পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি কার্বন পাওয়া যায় 'E' ক্ষেত্রের নমুনায়। এতে প্রায় ৯৯ ভাগ কার্বন রয়েছে।

◀ শিখনফল: ২

ক. কোন কাজে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বেশি? ১

খ. তেল উৎপাদনে ভারতের অবস্থা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে নমুনাগুলোর কোনটি কোন শ্রেণির কয়লা? নিরূপণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্রব্যটি উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ দুটি দেশের উত্তোলন সম্পর্কে পর্যালোচনা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বেশি হচ্ছে।

খ ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে খনিজ তেলের উৎপাদন ছিল মাত্র ২ লাখ মেট্রিক টন। নতুন নতুন খনি আবিষ্কারের ফলে ভারতের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১-৯২ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৩ লাখ মেট্রিক টন। ১৯৯৪-৯৫ সালে ৩ কোটি ৪৬ লাখ মেট্রিক টন এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে এর পরিমাণ কিছু কমে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ২৮ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৬ সালে খনিজ তেল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮৫৬ হাজার ব্যারেল।

গ উদ্দীপকে যে পাঁচটি নমুনা দেওয়া আছে, সেগুলোর কোনটি কোন শ্রেণির কয়লা নিচে তা নিরূপণ করা হলো–

'A' ক্ষেত্রের কয়লাটি হলো পিট কয়লা। মাটির তলায় বনভূমি চাপা পড়ে কয়লায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রথম অবস্থা হলো পিট। এ কয়লা বাদামি রঙের। এতে অঙ্গার বা কার্বনের পরিমাণ থাকে শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ মাত্র। এ কয়লা জ্বালালে উত্তাপের পরিমাণ কম হয় এবং এটি নিকৃষ্ট শ্রেণির কয়লা। কয়লা গঠনের দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ 'B' ক্ষেত্রটি হলো লিগনাইট কয়লা। এ কয়লা পিট কয়লার তুলনায় প্রাচীন। এতে কার্বনের পরিমাণ ৩৫ থেকে ৪৫ ভাগ থাকে। তাপবিদ্যুৎ ও কোল গ্যাস উৎপাদনে এবং ঘর উষ্ণ রাখার কাজে এর ব্যবহার সর্বাধিক। 'C' ক্ষেত্রটি হলো বিটুমিনাসস কয়লা, যা কালো রঙের, শক্ত ও সংঘবদ্ধ এবং এ কয়লায় জলীয়বাষ্প ও উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ খুব কম থাকে কিন্তু কার্বনের পরিমাণ থাকে অত্যন্ত বেশি। এর তাপপ্রদায়ী ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। 'D' ক্ষেত্রের অ্যানথ্রাসাইট কয়লা কালো ও খুব শক্ত এবং এ কয়লা জ্বলতে সময় নেয়; কিন্তু জ্বলে অনেকক্ষণ। এতে কার্বনের পরিমাণ থাকে সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৯০ ভাগ)। গ্রাফাইট কয়লারই একটি রূপ এবং গ্রাফাইট হলো কয়লার গঠন পর্যায়ের শেষ অবস্থা। এতে কার্বনের পরিমাণ ৯৯ ভাগ।

পরিশেষে বলা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন জ্বালানি শক্তির উৎসের মধ্যে কয়লা অন্যতম। চার ধরনের কয়লার মধ্যে প্রথম চার রকমের কয়লা জ্বালানি ও শক্তি সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত হয়।

ঘ উদ্দীপকের দ্রব্যটি উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ দুটি দেশ অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া কয়লা উত্তোলন সম্পর্কে নিচে পর্যালোচনা করা হলো–

যুক্তরাষ্ট্র: পৃথিবীর সর্বাধিক কয়লা সঞ্চিত আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মোট সঞ্চিত কয়লা ২৩,৭২,৯৫ মিলিয়ন টন। এই দেশের কয়লা উন্নতমানের অ্যানথ্রাসাইট শ্রেণির। যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা খনিগুলো পেনসিলভানিয়ার অ্যাপলেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চল, নিউ অরলিন্স, হিউস্টন, পোর্টল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর কয়লা রপ্তানি করে থাকে।

রাশিয়া: রাশিয়া পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাক্ষেত্রের অধিকারী। এদেশে মোট সঞ্চিত কয়লা ১৫,৭০,১০ মিলিয়ন টন। এদেশের কুজনেস্ক কয়লাক্ষেত্র পৃথিবী বিখ্যাত। বৈকাল হ্রদ ও সাইবেরিয়ার নদী অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণির বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়। এছাড়া ইউরান পর্বতের উত্তরাংশ, শাখালিন দ্বীপ, মধ্য সাইবেরিয়ায় প্রচুর উন্নতমানের কয়লা উৎপাদিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫ প্রাচীনকাল থেকে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকে ঐক্য নষ্ট করছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। এগুলো দমনের নামে পশ্চিমা দেশগুলো এ অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে মূলত এ অঞ্চলের 'তরল সোনা' নামে খ্যাত খনিজ সম্পদটির উপর আধিপত্য বিস্তার করছে। *◀ শিখনফল: ২*

ক. OPEC কী? ১

খ. খনিজ সম্পদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে খনিজ সম্পদ সম্পর্কে পশ্চিমা দেশগুলোর আগ্রহের কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত খনিজ সম্পদটির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওপেক (OPEC) বিশ্বের প্রধান খনিজ তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা।

খ ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে শিলাস্তর হতে মাটি খুড়ে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা হয় তাকে খনিজ সম্পদ বলে। যেমন- কয়লা। কৃষি ও শিল্পোন্নয়নে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, গৃহস্থালির জ্বালানি হিসেবে, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে খনিজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ উদ্দীপকে তরল সোনা নামে খ্যাত খনিজ তেলের উপর পশ্চিমা দেশগুলোর আগ্রহ রয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো প্রাচীনকাল থেকে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকে ঐক্য নষ্ট করছে। এগুলো দমনের নামে পশ্চিমা দেশগুলো এ অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে মূলত এ অঞ্চলের 'তরল সোনা' নামে খ্যাত খনিজ সম্পদটির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। আর মধ্যপ্রাচ্যে 'তরল সোনা' নামে খ্যাত খনিজ সম্পদটি হলো খনিজ তেল।

খনিজ তেল একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পদ। বিশ্বে খনিজ তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো যথেষ্ট উন্নত; বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য। এ অঞ্চলের খনিজ তেল বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। খনিজ তেলের বহুমুখী ব্যবহার আধুনিক যুগে মানুষকে এর উপর এত বেশি নির্ভরশীল করেছে যে এটি ছাড়া মানুষ এক মুহূর্তও চলতে পারে না। বিশ্ব বাণিজ্যেও খনিজ তেলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, উপরিউক্ত গুরুত্বের কারণেই খনিজ তেল সম্পর্কে পশ্চিমাদের আগ্রহ রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত খনিজ সম্পদটি হলো খনিজ তেল।

খনিজ তেলের বহুমুখী ব্যবহারের কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে খনিজ তেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বে জ্বালানি শক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ খনিজ তেল পূরণ করে থাকে।

খনি হতে উত্তোলিত অপরিশোধিত তেল রপ্তানিতে সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, ইরান, ভেনিজুয়েলা, ইরাক, আলজেরিয়া, লিবিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ এবং আমদানিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কলম্বিয়া, পেরু, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, ভারত, জাপান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে রপ্তানিতে সৌদি

আরব প্রথম, রাশিয়া দ্বিতীয় এবং নরওয়ে তৃতীয় এবং আমদানিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, জাপান দ্বিতীয় এবং চীন তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। মূলত OPEC (Organization of Petrolium Exporting Countries) বিশ্বের খনিজ তেলের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, খনিজ তেলের বাণিজ্য সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত।

প্রশ্ন ▶ ৬ রিতু ঘোষ ভারত থেকে বাংলাদেশে তার মাসীর বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। সে দেখতে পেল তার মাসী গ্যাসের চুলায় রান্না শেষে কাপড় শুকাচ্ছেন এবং অনেক সময় শুধু শুধুই চুলা জ্বালিয়ে রাখা হয়। রিতু তার মাসীকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে জ্বালানি সম্পদ হিসেবে তেল, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সম্পদ সীমিত। সচেতন না হলে এ সম্পদ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আমরা গভীর জ্বালানি সংকটে পড়ব।

◀ শিখনফল: ২

ক. খনিজ সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. খনিজ সম্পদ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝ? ২

গ. রিতু ঘোষের দেখা অপচয় হওয়া সম্পদটির সংরক্ষণ ও মিতব্যয়িতার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জ্বালানি খনিজগুলোর তুলনামূলক অবস্থা বাংলাদেশ ও ভারতের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরভাগের শিলাস্তর হতে মাটি খুঁড়ে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা হয় তাকে খনিজ সম্পদকে বলে। যেমন– লৌহ আকরিক, গ্রাফাইট।

খ সংরক্ষণ অর্থ কম করে ব্যবহার, যার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর কিছু পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত থাকবে। সুতরাং সতর্কতার সাথে খনিজ সম্পদ ভোগ করতে হলে কী কী কারণে সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে তা জানা অবশ্য কর্তব্য। অতিরিক্ত ব্যবহার, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় বা যথেচ্ছ ব্যবহার এবং মানুষের বিবেকহীন কার্যকলাপ ইত্যাদির ফলে খনিজ সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। এর রোধ করাই খনিজ সংরক্ষণ।

গ রিতু ঘোষের দেখা অপচয় হওয়া সম্পদটি প্রাকৃতিক গ্যাস। এ সম্পদটি সংরক্ষণে অপচয়রোধ করার সাথে সাথে মিতব্যয়ীও হতে হবে। এ জন্য নিজের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায়–

মিতব্যয়িতা: অপচয় নিবারণের মাধ্যমে ও ব্যবহারের বাহুল্য বর্জন করে সংরক্ষণ করা যায়।

পরিবর্তিত দ্রব্যের ব্যবহার: ক্ষয়িষ্ণু সম্পদের ব্যবহার হ্রাস করে প্রবাহমান সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি করলে সম্পদ সংরক্ষিত হয়। যেমন- বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ গ্যাস ব্যবহার কমিয়ে প্রবাহমান জলশক্তি ব্যবহার করলে গ্যাস সংরক্ষিত হয়।

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহার: অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাত নির্ধারণ করে গ্যাস ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা যায়।

প্রযুক্তির উৎকর্ষ: সরাসরি ব্যবহার না করে প্রযুক্তিগত সাহায্যে নিয়ে কোনো বস্তুর ব্যবহার তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে এবং সংরক্ষণে সহায়তা করে। যেমন- প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার না করে শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে ব্যবহার করলে তার উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

অপচয় বন্ধ করা: সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহারের সময় অপচয় বন্ধ করে সম্পদ সংরক্ষণ করা যায়। প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে তাই কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

সংস্কৃতির মান উন্নয়ন: সুসংস্কৃত উন্নত মানবিক গুণাবলি প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণে সাহায্য করবে। শিক্ষার প্রসার এ কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

সচেতনতা বৃদ্ধি: ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য গ্যাস যে সংরক্ষণ প্রয়োজন এ সম্পর্কে জনগণকে সচেতনা করা।

নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ: বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এজন্য উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ ও তার প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জ্বালানি খনিজগুলো হচ্ছে তেল, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস। বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশেই এ জ্বালানি খনিজগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

খনিজ তেল উৎপাদনে ভারত মোটেও সমৃদ্ধ নয়। ভারতে উল্লেখযোগ্য কোনো তেলক্ষেত্র এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমুহে কিছু খনিজ তেল উত্তোলিত হয়। তবে ভারত তার ব্যবহারের প্রায় সমস্ত তেল বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশ খনিজ তেলে সমৃদ্ধ নয়। হরিপুর গ্যাসক্ষেত্রে যে সামান্য তেল পাওয়া যায় উন্নতমানের নয়। অশোধিত ও তেল পরিশোধন যথেষ্ট ব্যয়বহুল হওয়ায় উত্তোলন অলাভজনক।

পৃথিবীর কয়লা মজুদের দিক থেকে ভারতের স্থান পঞ্চম। দেশটিতে ২৮,০১৭ মিলিয়ন টন কয়লা সঞ্চিত আছে। ২০১৫ সালে দেশটি ২৮৪ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করে। বাংলাদেশেও কয়লা উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ। দেশটিতে ৩,৩০০ মিলিয়ন টন কয়লার মজুদ রয়েছে। ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ হলেও ভারত প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে খুব বেশি সমৃদ্ধ নয়। ভারতের আসাম রাজ্যের নাহারকাটিয়া, মোরান হুগীরজান, টিনালি, উত্তর ভারতের কাংড়া এবং পশ্চিম ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাসের খনিগুলো অবস্থিত। অন্যদিকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ২৭টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৬ সাল পর্যন্ত এদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট সঞ্চিতির পরিমাণ ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ ১৩.৬৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

বাংলাদেশের শিল্প কারখানাতে প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জ্বালানির শতকরা ৭৩ ভাগই প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা পূরণ করা হয়। কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। যেমন- সিদ্ধিরগঞ্জ, শাহজীবাজার, আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল ইত্যাদি। প্রাকৃতিক গ্যাস সার কারখানাগুলোতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কীটনাশক, ওষুধ, রাবার, প্লাস্টিক, কৃত্রিম তন্তু প্রভৃতি তৈরির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদন, চা বাগান, কৃষি ও পরিবহনখাত, গৃহস্থালির কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ মতিউর রহমান একজন কৃষক। কৃষিকাজে তার নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন– ট্রাক্টর, রিপার, হারভেস্টার, মাড়াই কল ইত্যাদি নির্মাণে একটি বিশেষ খনিজ ব্যবহৃত হয়। খনিজটিকে বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার ধারক ও বাহক বলা হয়।

◀ শিখনফল: ২

ক. গ্রাফাইট দেখতে কোন বর্ণের? ১

খ. বর্তমান যুগকে যন্ত্রযুগ বলা হয় কেন? ২

গ. কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যবহৃত খনিজটির বিশ্বব্যাপী উৎপাদন অঞ্চল ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কৃষিযন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যবহৃত খনিজটির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাফাইট দেখতে ধূসর বা কালো বর্ণের।

খ বর্তমান যুগ শিল্প সভ্যতায় বিকশিত যান্ত্রিক যুগ।

প্রাচীনকালে মানুষ পেশি ও পশুশক্তির সাহায্যে চাষাবাদ করতো। সে সময় মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সীমিত ছিল । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে কয়লা, খনিজ তেল আবিষ্কারের পর যন্ত্রশিল্পের ব্যাপক প্রচলন হয়। শুরু হয় শিল্প সভ্যতার, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এজন্যে বর্তমান যুগকে যন্ত্রযুগ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যবহৃত খনিজটি হলো আকরিক লৌহ।

পৃথিবীর অনেক দেশে কমবেশি আকরিক লৌহ পাওয়া গেলেও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক না হওয়ায় বিশ্বে মাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশ খনি হতে আকরিক লৌহ উত্তোলন করে।

লৌহের আকরিক বিশ্বব্যাপী উৎপাদন ও বণ্টন নিচে দেয়া হলো–

অস্ট্রেলিয়া: আকরিক লৌহ উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বে প্রথম। ২০১৬ সালে এদেশের মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ৮২৫ মিলিয়ন টন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ও নিউসাউথ ওয়েলসের আয়রন মোনার্ক অঞ্চলে দেশটির প্রধান লৌহ খনিগুলো অবস্থিত।

ব্রাজিল: আকরিক লৌহ উৎপাদনে ব্রাজিল বিশ্বে দ্বিতীয়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খনিগুলো থেকে ব্রাজিল প্রচুর পরিমাণে আকরিক লৌহ উত্তোলন করে। ২০১৬ সালে দেশটির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৯১ মিলিয়ন টন।

চীন: চীন বিশ্বের তৃতীয় আকরিক লৌহ উৎপাদনকারী দেশ। ২০১৬ সালে চীনে প্রায় ৩৫৩ মিলিয়ন টন লৌহ উৎপাদিত হয়। দেশটির মাঞ্চুরিয়ার মুকুদেন, সান্টুং উপদ্বীপ, ইয়াংসিকিয়াং নদীর নিম্নাংশ, হোনান, হোপাই, সানটাং, সানবি প্রভৃতি অঞ্চল আকরিক লৌহ উৎপাদনে প্রসিদ্ধ।

ভারত: আকরিক লৌহ উৎপাদনে ভারতের স্থান বর্তমান বিশ্বে চতুর্থ। ২০১৬ সালে ভারতে প্রায় ১৬০ মিলিয়ন টন আকরিক লৌহ উৎপাদিত হয়। এদেশের লৌহ খনিগুলো উড়িষ্যা, বিহার, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র এবং মধ্য প্রদেশে অবস্থিত।

রাশিয়া : বিশ্বে পঞ্চম প্রধান আকরিক লৌহ উৎপাদনকারী দেশ রাশিয়া। ২০১৫ সালে এদেশে প্রায় ১০০ মিলিয়ন টন আকরিক লৌহ উৎপাদিত হয়। এদেশের ইউরাল পার্বত্য অঞ্চলের ম্যাগনিটোগস্ক, মুরমানস্ক, উরলের ওরস্ক, মস্কোর দক্ষিণে কুরস্ক, টুলা ও মোরকস্ক, লেনিনগ্রাড, বৈকাল হ্রদ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর আকরিক লৌহ উৎপাদিত হয়।

অন্যান্য দেশ : উপরিউক্ত দেশগুলো ছাড়াও ইউক্রেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইডেন, তুরস্ক, কোরিয়া, ভেনিজুয়েলা, মেক্সিকো, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জাপান, স্পেন, বেলজিয়াম, ইতালি, নরওয়ে, গ্রিস, অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশ আকরিক লৌহ উৎপাদন করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে মতিউর রহমান কৃষিকাজে ট্রাক্টর, রিপার, হারভেস্টার, মাড়াই কল ইত্যাদি ব্যবহার করেন, যা আকরিক লৌহ দ্বারা তৈরি হয়। আকরিক লৌহের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাপক ও বিস্তৃত। নিচে খনিজটির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষণ করা হলো–

রপ্তানিকারক দেশ: বিশ্বের আকরিক লৌহ রপ্তানিকারক দেশগুলো হচ্ছে – অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউক্রেন, কানাডা, সুইডেন, ভারত, নেদারল্যান্ড, লাইবেরিয়া, রাশিয়া, ভেনিজুয়েলা, চিলি, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, মেক্সিকো প্রভৃতি।

লৌহ আকরিকের বিশ্ব বাণিজ্য-২০১৫
(বিলিয়ন ডলার)

রপ্তানিকারক দেশ	পরিমাণ	আমদানিকারক দেশ	পরিমাণ
১. অস্ট্রেলিয়া	৩৯.৫	১. চীন	৫৭.১
২. ব্রাজিল	১৩.৩	২. জাপান	৭.৩
৩. দক্ষিণ আফ্রিকা	৩.৬	৩. দক্ষিণ কোরিয়া	৪
৪. কানাডা	২.৩	৪. জার্মানি	২.৪
৫. ইউক্রেন	২.৯	৫. নেদারল্যান্ড	১.৮
সূত্র: WTEx, May-2017			

আমদানিকারক দেশ: বিশ্বের প্রধান আকরিক লৌহ আমদানিকারক দেশগুলো হচ্ছে– চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, পাকিস্তান, বেলজিয়াম, বাংলাদেশ, চীন, ফ্রান্স প্রভৃতি।

সুতরাং, বিশ্বে সর্বাধিক ব্যবহৃত খনিজ আকরিক লৌহ বিশ্ব বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶৮ এ্যামি কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। তার বাবা গ্রামের একজন সচ্ছল কৃষক। তিনি প্রতিবছর প্রচুর ফসল উৎপাদন করেন। এ্যামি জানতে পারলো তার বাবার কৃষিকাজে নিত্য ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, রিপার, হারভেস্টার ও মাড়াই কল ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয় একটি বিশেষ খনিজ। যে খনিজটিকে বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতার ধারক ও বাহক বলা হয়।

◀ *শিখনফল: ২ [কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর]*

ক. শিল্প কী? ১

খ. কোনটিকে মধ্যপ্রাচ্যের তরল সোনা বলা হয় এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খনিজটির শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খনিজটির বিশ্বব্যাপী উৎপাদন ও বণ্টন বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা মানুষ বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগ (Utility) বৃদ্ধি করে ব্যবহার উপযোগী করে তাই শিল্প। যেমন- তাঁত শিল্পে সুতা থেকে বস্ত্র তৈরি।

খ খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়ামকে মধ্যপ্রাচ্যের তরল সোনা বলা হয়।

বিশ্বের মোট সঞ্চিত তেলের ৬২% এবং উৎপাদিত তেলের ২৯% মধ্যপ্রাচ্য হতে আসে। (সূত্র– Us Energy Information Administration, 2017) মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো হলো– সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার ইত্যাদি। এ অঞ্চলের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতি সবকিছুই তেল নির্ভর। এজন্য মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তেলকে তরল সোনা (Luquid Gold) বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত খনিজটি আকরিক লৌহ।

লৌহ প্রকৃতিতে বিশুদ্ধরূপে পাওয়া যায় না। অনেক ধাতুর সাথে মিশ্রিতভাবে পাওয়া যায় বলে একে আকরিক লৌহ বলে। এর শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ–

শ্রেণি	উৎস	লৌহের পরিমাণ (শতকরা)	রং
১. ম্যাগনেটাইট Fe_3O_4	আগ্নেয় বা রূপান্তরিত শিলায় পাওয়া যায়	৭২.৪	কালো
২. হেমাটাইট Fe_2O_3	পাললিক শিলায় পাওয়া যায়	৭০	লাল, গাঢ় বাদামি
৩. লিমোনাইট $2Fe_2O_3$-H_2O	পাললিক শিলায় এবং জলাভূমি অঞ্চলে পাওয়া যায়	৬২.৯	ধূসর বাদামি
৪. সিডেরাইট $FeCO_3$	পাললিক শিলায় পাওয়া যায়	৪৮.২	বাদামি, ধূসর হলুদ

ঘ উক্ত খনিজটি আকরিক লৌহ।

পৃথিবীর অনেক দেশে আকরিক লৌহ পাওয়া গেলেও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক না হওয়ায় বিশ্বে মাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশ খনি হতে আকরিক লৌহ উত্তোলন করে।

আকরিক লৌহের বিশ্বব্যাপী উৎপাদন ও বণ্টন নিচে দেয়া হলো–

১. **অস্ট্রেলিয়া:** আকরিক লৌহ উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বে প্রথম। ২০১৬ সালে এদেশের মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ৮২৫ মিলিয়ন টন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ও নিউসাউথ ওয়েলসের আয়রন মোনার্ক অঞ্চলে দেশটির প্রধান লৌহ খনিগুলো অবস্থিত।

২. **ব্রাজিল:** আকরিক লৌহ উৎপাদনে ব্রাজিল বিশ্বে দ্বিতীয়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খনিগুলো থেকে ব্রাজিল প্রচুর পরিমাণে আকরিক লৌহ উত্তোলন করে। ২০১৬ সালে দেশটির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৯১ মিলিয়ন টন।

৩. **চীন:** চীন বিশ্বের তৃতীয় আকরিক লৌহ উৎপাদনকারী দেশ। ২০১৬ সালে চীনে প্রায় ৩৫৩ মিলিয়ন টন লৌহ উৎপাদিত হয়। দেশটির মাঞ্চুরিয়ার মুকুদেন, সান্টুং উপদ্বীপ, ইয়াংসিকিয়াং নদীর নিম্নাংশ, হোনান, হোপাই, সানটাং, সানবি প্রভৃতি অঞ্চল আকরিক লৌহ উৎপাদনে প্রসিদ্ধ।

৪. **ভারত:** আকরিক লৌহ উৎপাদনে ভারতের স্থান বর্তমান বিশ্বে চতুর্থ। ২০১৬ সালে ভারতে প্রায় ১৬০ মিলিয়ন টন আকরিক লৌহ উৎপাদিত হয়। এদেশের লৌহ খনিগুলো উড়িষ্যা, বিহার, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র এবং মধ্য প্রদেশে অবস্থিত।

৫. **রাশিয়া :** বিশ্বে পঞ্চম প্রধান আকরিক লৌহ উৎপাদনকারী দেশ রাশিয়া। ২০১৫ সালে এদেশে প্রায় ১০০ মিলিয়ন টন আকরিক লৌহ উৎপাদিত হয়। এদেশের ইউরাল পার্বত্য অঞ্চলের ম্যাগনিটোগস্ক, মুরমানস্ক, উরলের ওরস্ক, মস্কোর দক্ষিণে কুরস্ক, টুলা ও মোরকস্ক, লেনিনগ্রাড, বৈকাল হ্রদ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর আকরিক লৌহ উৎপাদিত হয়।

৬. **অন্যান্য দেশ :** উপরিউক্ত দেশগুলো ছাড়াও ইউক্রেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইডেন, তুরস্ক, কোরিয়া, ভেনিজুয়েলা, মেক্সিকো, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জাপান, স্পেন, বেলজিয়াম, ইতালি, নরওয়ে, গ্রিস, অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশ আকরিক লৌহ উৎপাদন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶৯

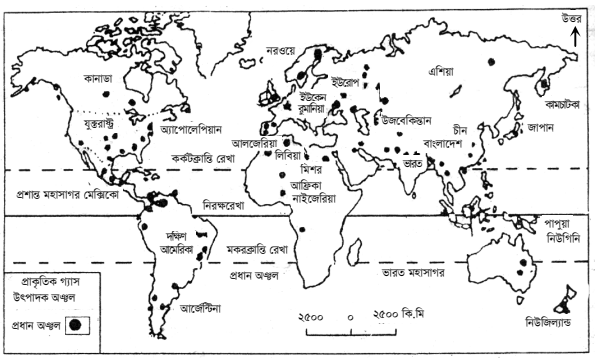

চিত্র : পৃথিবীর প্রধান প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী অঞ্চল

◀ *শিখনফল: ২*

ক. প্রাকৃতিক গ্যাস কী? ১
খ. প্রাকৃতিক গ্যাসের চারটি ব্যবহার বর্ণনা করো। ২
গ. প্রাকৃতিক গ্যাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. মানচিত্র অনুযায়ী প্রাকৃতিক গ্যাসের মহাদেশ ভিত্তিক বণ্টন বর্ণনা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতিতে প্রাপ্ত গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণই প্রাকৃতিক গ্যাস।

খ প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ।
নিচে প্রাকৃতিক গ্যাসের চারটি ব্যবহার দেওয়া হলো —
i. শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে। ii. শিল্পকারখানায় শক্তি উৎপাদনে। iii. গৃহস্থালির রান্নাবান্নার কাজে। iv. খনিজ তেল শোধনাগারে।

গ প্রাকৃতিক গ্যাস বিশ্বের অন্যতম প্রধান খনিজ সম্পদ। বিশ্বের জ্বালানি খাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের বেশি উত্তাপ ক্ষমতা, স্বল্প উত্তোলন ব্যয়, সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিবহন এবং পরিবেশগত সুবিধার কারণে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক।

প্রাকৃতিক গ্যাস প্রধানত জ্বালানি ও রাসায়নিক সার উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে, যা যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া ইউরিয়া সার, কৃত্রিম তন্তু, অ্যালকোহলসহ অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতির সঞ্চার করছে। পরিশেষে বলা যায়, প্রাকৃতিক গ্যাস অর্থনীতিতে অন্যতম নিয়ামক যার গুরুত্ব অনেক।

ঘ খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম।
উদ্দীপকের মানচিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন মহাদেশভিত্তিক প্রাকৃতিক গ্যাসের বণ্টন দেখানো হলো–

উত্তর আমেরিকা: উত্তর আমেরিকা প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম। এই মহাদেশের যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো প্রধান প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ। এই মহাদেশ বিশ্ব প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের প্রায় শতকরা ২৯ ভাগ উৎপাদন করে থাকে।

ইউরোপ: প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে ইউরোপ মহাদেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। এই মহাদেশের রাশিয়া, নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, জার্মানি, ইউক্রেন, সুইডেন, যুক্তরাজ্য প্রধান প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ। এই মহাদেশ বিশ্ব প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের প্রায় শতকরা ২৮ ভাগ উৎপাদন করে থাকে।

এশিয়া: এশিয়া মহাদেশ প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন করে থাকে। এই মহাদেশের ইরান, কাতার, চীন, সৌদি আরব, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কাজাখিস্তান প্রধান প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ। এই মহাদেশ বিশ্ব প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের প্রায় শতকরা ২৬ ভাগ উৎপাদন করতে থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকা: দক্ষিণ আমেরিকা প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এই মহাদেশের ভেনিজুয়েলা ও ব্রাজিল প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ।

অস্ট্রেলিয়া: প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এই মহাদেশের অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ।

আফ্রিকা: প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে আফ্রিকা মহাদেশের স্থান উল্লেখযোগ্য। এই মহাদেশের আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, মিসর, লিবিয়া প্রধান প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ।

উপরিউক্ত মহাদেশ ভিত্তিক প্রাকৃতিক গ্যাসের বণ্টন দেখে বোঝা যায়, প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের অবস্থান কাছাকাছি।

প্রশ্ন ▶ ১০ যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অনেক। বিভিন্ন প্রকার খনিজ প্রকৃতিতে রয়েছে। যেমন: লৌহ আকরিক একটি ধাতব খনিজ। বর্তমানে যন্ত্র সভ্যতার যুগ লৌহ আকরিক ছাড়া কল্পনা করা যায় না। আবার খনিজ তেল একটি শক্তি সম্পদ। যন্ত্র চালানোর জন্য এর প্রয়োজন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশে যা 'তরল সোনা' হিসেবে পরিচিত।

◀ শিখনফল: ২

ক. কয়েকটি ধাতব খনিজের নাম লেখো। ১
খ. শক্তি সম্পদ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধাতব খনিজটির বণ্টন বিশ্ব মানচিত্রে দেখাও। ৩
ঘ. মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে উদ্দীপকে উল্লিখিত শক্তি সম্পদটির উৎপাদন ও বণ্টন বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বর্ণ, তামা, লোহা ইত্যাদি ধাতব খনিজ।

খ যে প্রাকৃতিক সম্পদ তাপ তথা শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে শক্তি সম্পদ বলে।

শক্তি সম্পদ সাধারণত খনিজ সম্পদ হয়ে থাকে। যেমন– প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, খনিজ তেল। আবার শিল্পের কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। যেমন- সার শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার। শক্তি সম্পদ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া অন্যান্য শক্তি সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পানি, বায়ু ও সৌরশক্তি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ধাতব খনিজটি লৌহ। নিচে আকরিক লৌহ খনিজটির বণ্টন দেখানো হলো —

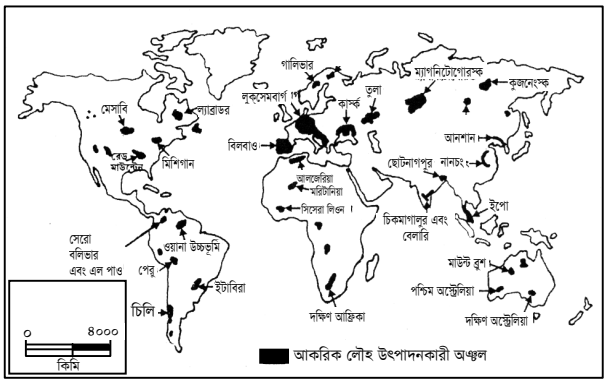

চিত্র : আকরিক লৌহ উৎপাদনকারী অঞ্চল

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শক্তি সম্পদটি হলো মধ্যপ্রাচ্যে 'তরল সোনা' হিসেবে খ্যাত খনিজ তেল।

নিচে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর খনিজ তেলের বর্ণনা দেওয়া হলো–

১. সৌদি আরব: তেল উৎপাদনে সৌদি আরবের স্থান বর্তমান বিশ্বে প্রথম। সৌদি আরবের হাসা, সাকানিয়া, আবকাইক, দাম্মাম, মারজান, বারগান, হুফুফ, দাহবান, কুয়াতিক অঞ্চল খনিজ তেলের জন্য প্রসিদ্ধ। ২০১৬ সালে দেশটির দৈনিক তেল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১১.৪৬ মিলিয়ন ব্যারেল।

২. ইরাক: ২০১৬ সালে বিশ্বের ৪র্থ বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ ইরাক। দেশটির দৈনিক উত্তোলনের পরিমাণ প্রায় ৪.৪৫ মিলিয়ন ব্যারেল, যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৪.৮ ভাগ। কালফাইয়া, হারমিন, কিরকুক, মাজনুন ইরাকের বিখ্যাত তেলক্ষেত্র।

৩. ইরান: এটি বিশ্বের ৫ম প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশ। ইরানের প্রধান তেল খনিগুলো মসজিদ-ই-সুলাইমান, লালী, নাফট সাফিদ, আঘাজারি, হাফট কেল, হামদান প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। ২০১৬ সালে দেশটির দৈনিক তেল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩.৯৯ মিলিয়ন ব্যারেল।

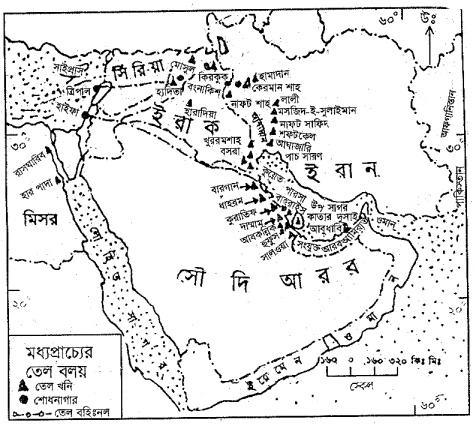

চিত্র : মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তেল বলয়

৪. সংযুক্ত আরব আমিরাত: ২০১৬ সালে বিশ্বের ৮ম বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ, যার দৈনিক উত্তোলনের পরিমাণ ৩.১১ মিলিয়ন ব্যারেল। দেশটির আবুধাবিতে মোট তেলের প্রায় ৯৫% মজুদ রয়েছে।

৫. কুয়েত: বিশ্বের ৯ম তেল উৎপাদনকারী দেশ হলো মধ্যপ্রাচ্যের কুয়েত। পৃথিবীর মোট সঞ্চিত তেলের প্রায় ১০% এখানে বিদ্যমান। বারহান, মাগওয়া, আহামাদি এদেশের শ্রেষ্ঠ তেল উৎপাদন কেন্দ্র। ২০১৬ সালে দেশটির দৈনিক তেল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২.৯২ মিলিয়ন ব্যারেল।

সারণি : মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তেল উৎপাদন (মিলিয়ন ব্যারেল)

দেশের নাম	উৎপাদন
১. সৌদি আরব	১১.৪৬
২. ইরাক	৪.৪৫
৩. ইরান	৩.৯৯
৪. সংযুক্ত আরব আমিরাত	৩.১১
৫. কুয়েত	২.৯২

উৎস: US Energy Information Administration-2017

৬. অন্যান্য: মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য খনিজ তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো হলো লিবিয়া, ওমান (১৯ তম), বাহরাইন, কাতার (১৭ তম), তুরস্ক, মিশর (২৮ তম) প্রভৃতি।

প্রশ্ন ▶ ১১

◀ *শিখনফল-৩*

ক. সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কোন খনিজ ব্যবহৃত হয়? ১

খ. প্রাকৃতিক গ্যাস কীভাবে সৃষ্টি হয়? ২

গ. 'Y' অঞ্চলে প্রাপ্ত খনিজটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'X' অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রধান খনিজ সম্পদটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়।

খ বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তি উৎপাদনকারী খনিজ সম্পদ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস।

বিভিন্ন জৈবিক উপাদান, যেমন– উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত দেহাবশেষ প্রভৃতি থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস সৃষ্টি হয়। ভূঅভ্যন্তরে শিলাস্তরের নিচে চাপা পড়ে এসব জৈব পদার্থ কোটি কোটি বছর, দু থেকে তিনটি ভূতাত্ত্বিক যুগ (geological period) ব্যবধানে তাপ ও চাপের প্রভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসে পরিণত হয়।

গ 'Y' অঞ্চলে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদটি হলো কয়লা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়লার ভূমিকা তুলে ধরা হলো :

রান্নার কাজে: প্রাচীনকাল হতে কয়লা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানেও বড় বড় শহরের হোটেলে রান্নার কাজে বিশেষ করে কাবাব ও গ্রিল তৈরি করতে কয়লা ব্যবহৃত হয়।

শিল্প পরিচালনায়: শিল্প স্থাপন ও স্থানীয়করণের উপর কয়লার প্রভাব রয়েছে। কারণ এটা শিল্পে শক্তি হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন– লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে।

শক্তি উৎপাদনে: বাষ্পীয় শক্তি উৎপাদনের জন্য কয়লাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন– বস্ত্র শিল্পে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে: লোহা ও ইস্পাত শিল্প সম্পূর্ণরূপে কয়লার উপর নির্ভরশীল। কারণ, লোহা গলানো এবং ইস্পাত নির্মাণে কয়লা মূখ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে।

উপজাত দ্রব্য হিসেবে: কয়লা হতে অনেক উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে। যেমন– ন্যাপথালিন, পিচ, গন্ধক ইত্যাদি।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে কয়লার ভূমিকা অপরিসীম।

ঘ মানচিত্রে 'X' সিলেট অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। এ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রধান খনিজ সম্পদ হলো প্রাকৃতিক গ্যাস। শক্তির উৎস হিসেবে আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিচে এ খনিজ সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো–

i. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গৃহস্থালি ও রান্নার কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। যেমন– ঢাকা শহরে।
ii. বিভিন্ন শিল্পকারখানায় তাপ ও শক্তি উৎপাদক হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। যেমন– সার কারখানায়।
iii. বর্তমানে কৃত্রিম রাবার, রং, প্লাস্টিক, সার, অ্যামোনিয়া, পলিথিন, কীটনাশক ও সিমেন্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করতে প্রাকৃতিক গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
iv. প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার সহজ, নিরাপদ এবং খরচ কম বলে শীতপ্রধান দেশে বাসগৃহ উষ্ণ রাখার জন্য গ্যাসচুল্লী ব্যবহার করা হয়।
v. খনিজ তেল শোধনের জন্য জ্বালানি হিসেবে তেল শোধনাগারে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
vi. ইট তৈরির কারখানাগুলোতে গ্যাসের সাহায্যে ইট পোড়ানো হয়। এর ফলে দেশের মূল্যবান বনজ সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হয়।
vii. প্রকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে কোনো ধোঁয়া বা কালি সৃষ্টি না হওয়ায় পরিবেশ সর্বদা দূষণমুক্ত থাকে।

সুতরাং বলা যায় যে, 'X' অঞ্চলে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ তথা প্রাকৃতিক গ্যাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১২

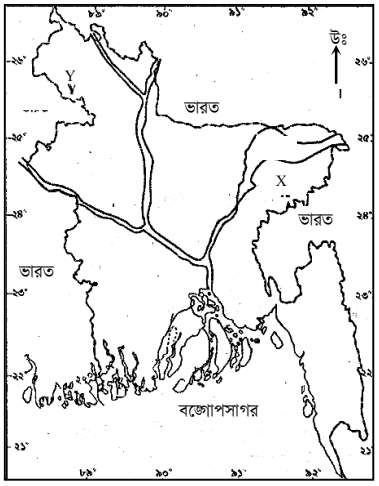

ক. বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলক্ষেত্রটি কোন জেলায় অবস্থিত? ১
খ. খনিজ সম্পদ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'Y' অঞ্চলে উত্তোলিত খনিজ সম্পদের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. 'X' এবং 'Y' অঞ্চলে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের মধ্যে কোনটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

◀ *শিখনফল: ৩*

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলক্ষেত্রটি অবস্থিত।

খ খনিজ সম্পদ হলো ভূঅভ্যন্তরস্থ প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষ তার প্রয়োজনে আহরণ করে থাকে।

ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগের শিলাস্তর হতে মাটি খুঁড়ে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা হয় তাই খনিজ সম্পদ। যেমন–বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস।

গ চিত্রে 'Y' চিহ্নিত অঞ্চলটি হলো দিনাজপুর। যেখানে কয়লা খনিজ সম্পদটি উত্তোলিত হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণির দেহাবশেষ থেকে কয়লার সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের কাণ্ড, গুড়ি, শাখা-প্রশাখা, পাতা, প্রাণির দেহাবশেষ সবকিছু ভূঅভ্যন্তরে তাপ, চাপ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে কয়লায় পরিণত হয়।

উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা অন্যতম। উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে দৈনিক প্রায় ৩,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তেলিত হয়। এছাড়া রংপুরের খালাশপীর, দিনাজপুরের ফুলবাড়ি ও দীঘিপাড়া এবং বগুড়ার কামালগঞ্জে কয়লাক্ষেত্র রয়েছে। রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ জেলায় বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ঘ চিত্রের 'X' হলো মৌলভীবাজার জেলা ও 'Y' অঞ্চল হলো দিনাজপুর জেলা। জেলা দুটোতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ হলো প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা।

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭৫ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে। অপরদিকে শক্তির অন্যতম উৎস কয়লা। কলকারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি চালানোর জন্য কয়লা ব্যবহৃত হয়।

শিল্প কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় ও ছাতকের সিমেন্ট কারখানায় প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। চা বাগানেও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অপরদিকে কয়লা জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ও লাকড়ির পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া ইটখোলা ও কলকারখানায়ও কয়লা ব্যবহৃত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, সম্পদ দুটির গুরুত্ব অত্যাধিক। তবে আমাদের দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস অধিক পরিমাণে সঞ্চিত। তাই প্রাকৃতিক গ্যাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অধিক।

প্রশ্ন ▶ ১৩ দেবেন্দ্রনাথ একজন খনি শ্রমিক। কাজ করতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন একটি বিশেষ খনিজের উপর ভিত্তি করে ভারতের বিহার রাজ্যের জামশেদপুরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। *◀ শিখনফল: ৪*

ক. বরমচাল তেলক্ষেত্র কোন জেলায় অবস্থিত? ১

খ. খনিজ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ লেখো? ২

গ. জমশেদপুরে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের পৃথিবীব্যাপী বণ্টন মানচিত্রে প্রদর্শন করো। ৩

ঘ. ভারতের উক্ত খনিজ সম্পদটির অবস্থান বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বরমচাল তেলক্ষেত্র মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত।

খ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খনিজ সম্পদগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:–

১. ধাতব খনিজ: লোহা, তামা, সোনা প্রভৃতি।

২. অধাতব খনিজ: গ্রাফাইট, সীসা ইত্যাদি।

৩. জ্বালানি খনিজ : প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, খনিজ তেল।

গ ভারতের জমশেদপুরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কারখানাটি আকরিক লৌহের (iron ore) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
নিচে আকরিক লৌহের পৃথিবীব্যাপী বণ্টন মানচিত্রে প্রদর্শন করা হলো:

উদ্দীপকে উল্লিখিত ধাতব খনিজটি লৌহ। নিচে আকরিক লৌহ খনিজটির বণ্টন দেখানো হলো—

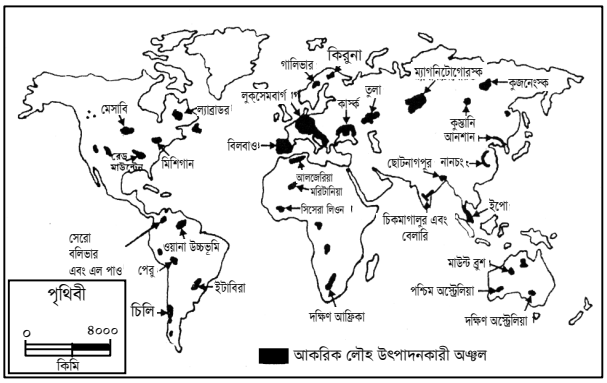

চিত্র : আকরিক লৌহ উৎপাদনকারী অঞ্চল

ঘ আকরিক লৌহ ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। এদেশের প্রধান আকরিক লৌহের খনিজগুলো বিহারের মালভূম, সিংভূম, উরিষ্যার কেওলাঝাড়, বোনাই ও মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত।

বিহার-উড়িষ্যা: আকরিক লৌহ উৎপাদনে বিহার-উড়িষ্যার অবস্থান প্রথম। এ অঞ্চলে গুরুমহিষানী-বাদামপাহাড় এবং বড়া জামদা অঞ্চলে হেমাটাইট আকরিকের মোট পরিমাণ ৫৭০ কোটি মেট্রিক টন।

মধ্যপ্রদেশ: মধ্যপ্রদেশে ২৫৬৭ কোটি মেট্রিক টনের কাছাকাছি লৌহ সঞ্চিত রয়েছে। বাইলাডিলা, রাওঘাট, দহেলিরাজহারা লৌহ ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম।

অন্ধ্রপ্রদেশ: কাজপ্পা, কুরপুল, কৃষ্ণ, খামঘাম প্রভৃতি জেলায় লোহার খনিগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে মোট সঞ্চিত ম্যাগনেটাইটের পরিমাণ ৯.৭ কোটি মে. টন।

মহারাষ্ট্র: মহারাষ্ট্রের চান্দা ও রত্নগিরি জেলায় সামান্য পরিমাণে আকরিক লোহা পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে খনিগুলোর মধ্যে দুরজাগড়, গাদচিরোলি, সিন্ধুদুর্গ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

রাজস্থান: রাজস্থানের ডিলওয়ারা জেলার মরিজা ও উদয়পুরের নখরাকিপাল অঞ্চলে সঞ্চিত লোহার পরিমাণ ১.২৭ কোটি মে. টন।

তামিলনাড়ু: এ রাজ্যে প্রধানত ম্যাগনেটাইট শ্রেণির লোহা পাওয়া যায়। সালেম জেলার তীর্থমালাই, কনজমালাই নামগিরি, মহাদেবী পাহাড় প্রভৃতি লোহা উৎপাদনে বিখ্যাত। এখানে সঞ্চিত লোহার পরিমাণ ১০.৭ কোটি মেট্রিক টন।

কেরালা: কেরালায় সঞ্চিত মোট লোহার পরিমাণ ৬ কোটি মেট্রিক টন। নাদু ভালুর, আল্লমপারা, এলিয়েট্রিমাল প্রভৃতি থেকে উৎকৃষ্ট মানের লোহা পাওয়া যায়।

ভারতে উপরিউক্ত অঞ্চলগুলো ছাড়াও আসাম, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশে লিমোনাইট ও সিডোরাইট শ্রেণির লোহার ভাণ্ডার আছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ আদিব তার আব্বু-আম্মুর সাথে ভারতে বেড়াতে যায়। সেখানে তারা গোয়ায় গমন করে। তারা গোয়াতে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখে। সেখানে তারা একটি খনিজ সম্পদ অঞ্চল দেখতে যায়। তার আম্মু বলেন যে, এই খনি উত্তোলনে গোয়া ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। এই খনিজ সম্পদ সবচেয়ে বেশি উত্তোলিত হয় উড়িষ্যায়। *◀ শিখনফল: ৫*

ক. অধাতব খনিজ কী? ১

খ. গ্রাফাইটের বৈশিষ্ট্য লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে আদিবের আম্মু ভারতের কোন খনিজ সম্পদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আদিবের আম্মুর উল্লেখ করা প্রদেশ দুটির বাইরেও ভারতের আরও অনেক প্রদেশ এই খনিজ সম্পদ উত্তোলন করা হয়– কথাটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব খনিজে কোনো ধাতব পদার্থ থাকে না তাই অধাতব খনিজ।

খ গ্রাফাইট কয়লারই একটি প্রকারভেদ, তবে এর জ্বালানি ক্ষমতা নেই বললেই চলে।
কয়লার গঠন পর্যায়ের শেষ অবস্থা হলো গ্রাফাইট। চাপে, তাপে ও দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে অ্যানথ্রাসাইট কয়লা গ্রাফাইটে পরিণত হয়। এতে কার্বনের পরিমাণ থাকে শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ। জ্বালানি ও শক্তি সম্পদ হিসেবে একে ব্যবহার করা যায় না। পেনসিল তৈরির কাজে গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয়।

গ উদ্দীপকে আদিবের আম্মু ভারতের ধাতব খনিজ 'আকরিক লোহার' প্রতি ইঙ্গিত করছেন।
ভারতের ধাতব খনিজের মধ্যে আকরিক লোহা প্রধান। এ দেশের খনি থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণির লোহা পাওয়া যায়। খনিজ লোহা

উত্তোলনে ভারত বর্তমান বিশ্বে চতুর্থ স্থানের অধিকারী (২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী)। ভারতে মোট উৎপাদিত আকরিক লোহার পরিমাণ প্রায় ১২৯ কোটি টন। আকরিক লোহার সঞ্চিত ভাণ্ডার ও গুণগত মানের বিচারে বিশ্বে ভারতের সমকক্ষ দেশ বিরল। এ দেশের বেশির ভাগ লোহা উৎকৃষ্ট হেমাটাইট শ্রেণির। এ আকরিকে প্রকৃত লোহার পরিমাণ থাকবে শতকরা ৭০ ভাগের বেশি। গোয়া রাজ্য আকরিক লোহা উত্তোলনে বর্তমানে ভারতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এবং এখানকার গুরুত্বপূর্ণ লোহার খনিগুলো বিচালেম, সানগুয়েম, সাহকুয়ালেম, সাংপুয়েম, মাপুসা ও সিরিগাঁও অঞ্চলে অবস্থিত। এ অঞ্চলের বেশির ভাগ আকরিক লোহা মার্মাগাও বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি হয়। অন্যদিকে আকরিক লোহা উত্তোলনের দিক থেকে বর্তমানে ওড়িষ্যা প্রথম স্থান অধিকার করে আছে এবং এ রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ জেলার গরুমহিষাণী, বাদাম পাহাড় সুলাইপত, কেওনঝাড় জেলার বাগিয়াবুরু, নোয়ামুণ্ডি, সুন্দরগড় জেলার বোনাই প্রভৃতি এ রাজ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লোহা খনি অঞ্চল।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতে আকরিক লোহার সঞ্চিত ভাণ্ডার ও গুণগত মান অনেক উন্নত। আর তাই এর উৎপাদন পরিমাণও অনেক বেশি।

ঘ উদ্দীপকে আদিবের আম্মুর উল্লেখ করা প্রদেশ দুটি (গোয়া ও ওড়িষ্যা) ব্যতীত ভারতে আরও অনেক প্রদেশ রয়েছে, সেখানে আকরিক লোহা উত্তোলন করা হয়। কথাটির যথার্থতা মূল্যায়ন করা হলো–

ভারতের লোহার খনিগুলো প্রধানত দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। এ দেশের প্রধান খনিগুলোর মধ্যে একটি হলো মধ্যপ্রদেশ। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ লোহার খনিগুলো দুর্গ জেলার ঢাল্লি-রাজহারা এবং বস্তার জেলার বাইলাডিলা রাওঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। মধ্য প্রদেশ থেকে আকরিক লোহা বিশাখাপত্তনম বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে কর্ণাটক আকরিক লোহা উত্তোলনে চতুর্থ স্থানের অধিকারী। এ রাজ্যের বেলারি, চিত্রদুর্গ, চিকমাগালুর, উত্তর কানাডা, টুকমুর, ধারওয়ার, বিজাপুর জেলায় প্রচুর আকরিক লোহা পাওয়া যায়। বাবাবুদা পাহাড়ের কোমানগুনডি, বেলারী জেলার হসপেট ও চিকমাগালুর জেলার কুদরেমুখ এই রাজ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লোহার খনি অঞ্চল। ম্যাঙ্গালোর বন্দুরর মাধ্যমে এই অঞ্চলের আকরিক লোহা বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

বিহার রাজ্যের লোহার খনিগুলো সিংভুম জেলায় অবস্থিত। গুয়া, বুধাবুরু, কোটামাটিবুরু, রাজেরিবুরু, নোয়ামুণ্ডি (একাংশ বিহারে ও অপরাংশ ওড়িষ্যায়) প্রভৃতি এই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ লোহার খনি অঞ্চল। এখানকার লৌহ আকরিক খুব উন্নতমানের। এ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য জায়গায় আকরিক লোহা খনি অঞ্চলের মধ্যে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি ও চান্দা অঞ্চলে, অন্ধ্রপ্রদেশের কুনুর্ল, কুডাম্পা, নেল্লোর, গুন্টুর ও অন্তরপুর অঞ্চলে, তামিলনাড়ুর সালেম, তিরুচিরাপল্লি ও মাদুরাই অঞ্চলের খনিগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারত আকরিক লোহা উত্তোলনে বর্তমান বিশ্বে চতুর্থ। এ কারণে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎকৃষ্ট মানের আকরিক লোহা পাওয়া যায় এবং এর গুণগত মানের বিচারে বিশ্বে ভারতের সমকক্ষ দেশও বিরল। তাই প্রতিবছর বিপুল পরিমাণে আকরিক লোহা উত্তোলন করা হয় এবং বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অতিরিক্ত খনিজ উত্তোলনের ফলে ভূঅভ্যন্তর ফাঁকা হয়ে উক্ত অঞ্চলের ভূমিভাগ বসে যায়। এতে মানুষের জীবনযাত্রায় বিপর্যয় ঘটে। পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ◀ *শিখনফল: ৬*

ক. শিল্পায়ন কী? ১

খ. শক্তি সম্পদের বৈশিষ্ট্য লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপর্যয় রোধে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উল্লিখিত বিপর্যয়রোধে করণীয় ব্যবস্থাসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্পায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো দেশ কৃষিভিত্তিক সমাজ হতে শিল্পভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত হয়।

খ যে প্রাকৃতিক সম্পদ তাপ তথা শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে শক্তি সম্পদ বলে।

শক্তি সম্পদ সাধারণত খনিতে পাওয়া যায়। যেমন– প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতি। এসব সম্পদ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া খনিজাত নয় এমন শক্তি সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পানি, বায়ু ও সৌরশক্তি।

গ উদ্দীপকে অধিক মাত্রায় খনিজ উত্তোলনের ফলে যে বিপর্যয় ঘটে তা আলোচনা করা হয়েছে।

খনিজ সম্পদ উত্তোলনের সময় এর প্রতিক্রিয়ায় ভূমিধস ঘটতে পারে। পরিবেশও দূষিত হয়। এক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি গ্রহণ করা খুবই জরুরি। খনিজ সম্পদের উত্তোলনে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

i. খোলা খনি খনন (open pit mining);
ii. নলকূপ খনন (well drilling);
iii. ঢালু টানেল খনন (horizontal tunnel); এবং
iv. খাড়া সুড়ঙ্গ খনন (vertical tunnel) পদ্ধতি।

খনিজ আহরণের সময় খনি এলাকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় এনে উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো থেকে যেকোনো একটি বেছে নিতে হয়। যেমন– খোলা খনি খনন পদ্ধতিতে কয়লা সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্যাস আহরণে নলকূপ খনন পদ্ধতি অধিক উপযুক্ত। আবার তেল আহরণে ঢালু টানেল পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে অতিরিক্ত মাত্রায় খনিজ উত্তোলনের ফলে পরিবেশ ও মানবজীবনে বিপর্যয় নেমে আসার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সম্পদের সীমিত ও বিকল্প ব্যবহার, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন, সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে উক্ত বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব।

সীমিত ব্যবহার: অতিমাত্রায় সম্পদ ব্যবহার করলে এর দ্রুত বিনাশ ঘটে। তাই প্রয়োজন ভিত্তিক উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পদের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার: ক্ষয়িষ্ণু সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে প্রবহমান সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি করলে সম্পদ সংরক্ষিত হবে। যেমন– বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের পরিবর্তে নবায়নযোগ্য শক্তি (পানি, সূর্যের আলো) ব্যবহার করা।

অগ্রাধিকার ভিত্তিক ব্যবহার: অধিকতর প্রয়োজন মিটবে এরূপ ক্ষেত্র নির্ণয় করে খনিজের ব্যবহার সম্পদ সংরক্ষণে সহায়ক হয়ে থাকে। যেমন– বিদ্যুৎ উৎপাদনে খনিজ তেল ব্যবহার করলে তা যথার্থ হবে না। বরং এটি পরিবহনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

অপচয় বন্ধ করা: খনিজ উৎপাদন ও ব্যবহারের সময় যাতে অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন– বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখা যায় না। তাই এর ব্যবহারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন: কারিগরি উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেলে খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার নিরাপদ হবে। যেমন– বর্তমানে খোলা খনি খনন পদ্ধতিতে কয়লা আহরণ পূর্বের তুলনায় অনেক নিরাপদ।

সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি: সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে খনিজ আহরণ ও ব্যবহার অধিক নিরাপদ হবে। যেমন– ১৯৯৭ সালে ১৪ জুন মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রে সৃষ্ট দূর্ঘটনা (অগ্নিকাণ্ড) মানুষের অসাবধানতা ও অবহেলার কারণেই ঘটেছিল।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ যথাযথভাবে নেওয়া গেলে মানুষের জীবনযাপন সহজ ও আরামদায়ক হবে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ও রোধ করা অনেকাংশে সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ নাইমা ও মনীষা গাড়িতে চড়ে যাচ্ছে। গাড়িতে লেখা আছে, সিএনজি চালিত। এ বিষয়ে মনীষা জানতে চাইলে নাইমা বলে যে, এটি বাংলাদেশের একটি মূল্যবান শক্তি সম্পদ। এটি বাংলাদেশের প্রধান জ্বালানি সম্পদ। ◀ *শিখনফল: ৬*

ক. কয়লা উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের অবস্থান কত? ১

খ. লৌহ উৎপাদনে ভারতের অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে নাইমাদের বক্তব্যে কোন খনিজ সম্পদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নাইমাদের উল্লেখ করা জ্বালানি সম্পদের প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর শীর্ষ কয়লা উৎপাদনকারী দেশ চীন (২০১৬ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ১৬৮৫.৭ মিলিয়ন টন)। সূত্র : Statistical review of world energy-2017।

খ আকরিক লৌহ উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল ও চীনের পরেই ভারতের অবস্থান (৪র্থ)।

২০১৬ সালে ভারতে প্রায় ১৬০ মিলিয়ন টন আকরিক লৌহ উৎপাদিত হয়। ভারতের বিহার, ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, গোয়া প্রভৃতি স্থানে আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। দেশটিতে সবচেয়ে বেশি আকরিক লৌহ পাওয়া যায় ওড়িষ্যা ও বিহারে।

গ উদ্দীপকে নাইমাদের বক্তব্যে প্রাকৃতিক গ্যাস নামক খনিজ সম্পদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধানতম খনিজ সম্পদ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। এ গ্যাস মিথেন সমৃদ্ধ এবং উন্নতমানের। প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্প কারখানার জ্বালানি ও কাঁচামাল হিসেবে, কৃষি উন্নয়নে, গৃহস্থালির কাজসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসকে সিএনজিতে (Compressed Natural Gas-CNG) রূপান্তরিত করে যানবাহনে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ব্যবহার ব্যাপক হলে পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমবে। উদ্দীপক অনুসারে, নাইমা ও মনীষা গাড়িতে চড়ে ঢাকা যাচ্ছিল। গাড়িতে লেখা ছিল সিএনজি চালিত। এ বিষয়ে মনীষা জানতে চাইলে নাইমা বলে যে, এটি বাংলাদেশের একটি মূল্যবান এবং প্রধান শক্তি সম্পদ। তাই বলা যায়, নাইমার বক্তব্যে প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ সম্পদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের আবিষ্কৃত ২৭টি গ্যাসক্ষেত্রের ১০৯টি কূপ হতে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। নিচে বাংলাদেশের কয়েকটি প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

বাখরাবাদ: এই গ্যাসক্ষেত্রটি কুমিল্লা জেলার বাখরাবাদে অবস্থিত। ইহা ১৯৬৯ সালে আবিষ্কৃত হয়। এই গ্যাসক্ষেত্রটি ১৯৮৪-৮৫ অর্থবছর থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু করে। এই গ্যাসক্ষেত্রে ৪২৭.১৪ বি.ঘন ফুট গ্যাস সঞ্চিত আছে।

জালালাবাদ: এই গ্যাসক্ষেত্রটি সিলেট জেলার সুরমা গ্যাসক্ষেত্র অববাহিকায় জালালাবাদে অবস্থিত। ১৯৮৯ সালে এটি আবিষ্কৃত হয়। এই ক্ষেত্রে জানুয়ারি ২০১৭ সালে মোট মজুদের পরিমাণ ৮৯.৯১ বি.ঘন ফুট।

কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র: এই গ্যাসক্ষেত্রটি সিলেট জেলার গোপালপুরে অবস্থিত। এটি ১৯৬২ সালে আবিষ্কৃত হয়। এখানে জানুয়ারি ২০১৭ সালে মোট মজুদের পরিমাণ ছিল ২১১৩.৬৩ বি. ঘন ফুট।

সিলেট গ্যাসক্ষেত্র: সিলেট জেলার হরিপুরে এই গ্যাসক্ষেত্রটি অবস্থিত। ইহা বাংলাদেশের প্রথম আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র। এটি ১৯৫৫ সালে আবিষ্কৃত হয়। এই গ্যাসক্ষেত্রে জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত মোট মজুদ ছিল ১০৭.৬৩ বিলিয়ন ঘনফুট।

তিতাস গ্যাসক্ষেত্র: তিতাস গ্যাসক্ষেত্রটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থিত। এটি ১৯৬২ সালে আবিষ্কৃত হয়। ২০১৭ এর জানুয়ারিতে এই গ্যাসক্ষেত্রে মোট মজুদের পরিমাণ ২২৪২.২৪ বিলিয়ন ঘনফুট।

বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র: নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ নামক স্থানে এ গ্যাসক্ষেত্রটি অবস্থিত। উক্ত গ্যাসক্ষেত্রে জানুয়ারি ২০১৭ সালে ৬৯.১২ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ রয়েছে।

কুতুবদিয়া গ্যাসক্ষেত্র: কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া নামক স্থানে এই গ্যাসক্ষেত্রটি অবস্থিত। উক্ত গ্যাসক্ষেত্রে ৪৫.৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ রয়েছে। এটি এখনও উত্তোলনে যায়নি।

ফেনী গ্যাসক্ষেত্র: এ গ্যাসক্ষেত্রটি ফেনী জেলায় অবস্থিত। এই গ্যাসক্ষেত্রে ৬২.৬ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ রয়েছে। এর উৎপাদন বর্তমানে স্থগিত রয়েছে।

উল্লিখিত স্থানগুলো ছাড়াও ছাতক, রশিদপুর, হবিগঞ্জ, বিয়াজনীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জে প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে।

সূত্র : পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ২০১৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়
শিল্প

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ মি. এ্যালেক্স যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চলে অবস্থিত একটি ভারী শিল্পের মালিক। সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশে ভ্রমণে এসে এদেশের সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় অর্জনকারী একটি কারখানা পরিদর্শন শেষে উক্ত শিল্পে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

◀ শিখনফল: ২ ও ৩ [দি. বো. ২০১৭]

ক. শিল্পের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. বাংলাদেশ বর্তমানে ওষুধ আমদানির পরিবর্তে রপ্তানি করে– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. এ্যালেক্সের মালিকানাধীন শিল্পের গঠনের নিয়ামক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এ্যালেক্সের বাংলাদেশে বিনিয়োগের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা মানুষ বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগ (Utility) বৃদ্ধি করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে তাকে শিল্প বলে। যেমন- তাঁত শিল্পে সুতা থেকে বস্ত্র তৈরি হয়।

খ বাংলাদেশ বর্তমানে ওষুধ রপ্তানি করে। দেশটি ২০১৬ সালে ১২৭টি দেশে প্রায় ২২৪৭.০৫ কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি করে (সূত্র: ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর-২০১৭)।

ওষুধ শিল্পের এই অগ্রগতির মূলে রয়েছে ১৯৮২ সালে কার্যকর হওয়া জাতীয় ওষুধ নীতি। FDA (US Food and Drugs Administration) কর্তৃক বাংলাদেশের ওষুধের অনুমোদন এ শিল্পের রপ্তানির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এছাড়া উন্নত কাঁচামাল, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করে উৎপাদন হওয়ায় এদেশের ওষুধ আজ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

গ উদ্দীপকে মি. এ্যালেক্সের মালিকানাধীন শিল্পটি হলো লৌহ ও ইস্পাত।

যুক্তরাষ্ট্রের ইরি হ্রদ অঞ্চলে এ শিল্পের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এ ধরনের শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার জন্য প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নিয়ামকের প্রভাব রয়েছে। নিচে এসব নিয়ামকগুলো ব্যাখ্যা করা হলো–

কাঁচামালের সান্নিধ্য: লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রধান কাঁচামাল আকরিক লৌহ। কিন্তু তা খুব ভারী বলে বহন করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রে এ শিল্পগুলো লৌহ খনির নিকটে গড়ে ওঠেছে। যেমন– বার্মিংহাম অঞ্চল।

কয়লার সান্নিধ্য: লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য কয়লা অপরিহার্য। এটি শক্তির অন্যতম উৎস। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত কয়লা খনিগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেমন– পেনসিলভানিয়ার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প।

পানির সরবরাহ: আকরিক লৌহ ধৌত ও পরিশোধন এবং কাঁচা লৌহকে ঠাণ্ডা করার জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। তাই যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রগুলো হ্রদ, নদী ও সমুদ্রের তীরে গড়ে উঠেছে।

মূলধন: লৌহ ও ইস্পাত শিল্প একটি বৃহদাকার শিল্প বলে এতে প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়। ভূমি ক্রয়, অট্টালিকা নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের বাসস্থান, বেতন ইত্যাদি বাবদ প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

প্রযুক্তি : এটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থানকে প্রভাবিত করে। এতে সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হয়ে থাকে। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশটি এ শিল্পে উন্নতি লাভ করেছে।

উপরিউক্ত নিয়ামকসমূহের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠেছে।

ঘ মি. এ্যালেক্স বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার শিল্প প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করায় দেশে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এখানে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হচ্ছে। যেমন– এ দেশের পোশাক শিল্পের অনুকূল জলবায়ু, সস্তা ও প্রচুর শ্রমিক, উন্নত কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য প্রভৃতি কারণ মি. এ্যালেক্সকে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করেছে।

i. **জলবায়ু:** বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের অধিক সময় কাজ করার জন্য বিশেষ উপযোগী। এজন্য এদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

ii. **কাঁচামাল:** পোশাক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল বস্ত্র। আমদানিকৃত ও দেশীয় উন্নতমানের বস্ত্র ব্যবহার করে এদেশে প্রচুর শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।

iii. **শক্তি সম্পদ:** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো শহর কেন্দ্রিক গড়ে ওঠায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে অসুবিধা হয় না। তাই ঢাকা শহরের আশেপাশে (নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর) এ শিল্প গড়ে ওঠছে।

iv. **মূলধন:** শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধন অন্যতম পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি পোশাক শিল্পে অর্থ যোগান দেয়। এ কারণে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে এ শিল্পের ব্যাপক বিস্তার হয়েছে।

v. **শ্রমিক:** বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়ায় এখানে সুলভে শ্রমিক পাওয়া যায় এবং স্বল্প মজুরিতে কাজ করানো যায়। ফলে এ শিল্পটি দ্রুত প্রসার লাভ করছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উল্লিখিত নিয়ামকগুলোর কারণেই মি. এ্যালেক্স এদেশে পোশাক শিল্পে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ২ জামিল সাহেব বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে থাকেন। তার রপ্তানিকৃত পণ্যের শিল্পটি বাংলাদেশে বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। *◀ ১ ও ৬ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি? ১

খ. রাজনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জামিল সাহেবের কর্মকাণ্ডটি ভূগোলের কোন ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শিল্পের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়া।

খ রাজনৈতিক ভূগোলে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও মানবিক পরিবেশের উপর এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়।

রাজনৈতিক ভূগোল মূলত মানুষ, রাষ্ট্র ও ভূখণ্ডের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে থাকে। ভূগোলের এ শাখায় সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও বিভিন্ন পদ্ধতিগত ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার প্রয়োগ ঘটানো হয়। যেমন: অবরোহী পদ্ধতির গবেষণা কিংবা প্রযুক্তিনির্ভর SPSS পদ্ধতির প্রয়োগ। এসব পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক ভূগোলের আওতায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা ব্যবহৃত হয়।

গ জামিল সাহেবের কর্মকাণ্ডটি অর্থনৈতিক ভূগোলে আলোচিত হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক ভূগোল হচ্ছে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবস্থান, বণ্টন ও স্থানিক সংগঠন সম্পর্কিত অধ্যয়ন। অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচিত বিষয়সমূহ হচ্ছে: অর্থনীতি, পরিবেশ ও অর্থনীতির সম্পর্ক এবং বিশ্বায়ন। অর্থনৈতিক ভূগোলের উপবিভাগসমূহ হলো– কৃষি ভূগোল, সম্পদ ভূগোল, শিল্প ভূগোল, বাণিজ্যিক ভূগোল, যাতায়াত ভূগোল ইত্যাদি।

জামিল সাহেব একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী এবং তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন। এ শিল্পে বিপুল সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থান হচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, জামিল সাহেবের কর্মকাণ্ডটি অর্থনৈতিক ভূগোলের আওতাভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে তৈরি পোশাক শিল্পের কথা বলা হয়েছে।

সত্তরের দশকের শেষ ভাগে গুটিকয়েক কারখানা নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে দেশে চার হাজারের অধিক পোশাক শিল্প কারখানা রয়েছে। এটি বাংলাদেশে বিলিয়ন ডলার শিল্পরূপে পরিচিত।

নিচে তৈরি পোশাক শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো—

রপ্তানি বাণিজ্য: রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরি পোশাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে মোট রপ্তানি আয়ের ৮১.২৩ শতাংশ এ শিল্পের অবদান (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭)।

উদ্যোক্তা সৃষ্টি: কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের মাধ্যমে হাজার হাজার শিল্প উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে। এসব উদ্যোক্তা যেমন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষ, তেমনি তাদের রয়েছে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

কর্মসংস্থান: এদেশের নিবেদিত প্রাণ নারী কর্মীদের সুনিপুণ হাতের ছোঁয়া লেগেছে বিশ্ববাজারের জন্য তৈরি পোশাকে। প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে এ শিল্পে, যাদের অধিকাংশই নারী (প্রায় ৮০%; সূত্র : BGMEA-2017)।

বস্ত্র শিল্প: তৈরি পোশাক বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পে (স্পিনিং, উইভিং, নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং এবং প্রিন্টিং) বিনিয়োগের সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত রচনা করেছে।

প্যাকেজিং শিল্পের প্রসার: তৈরি পোশাক সামগ্রী রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় প্যাকেজিং, গামটেপ, জিপার, বোতাম প্রভৃতি শিল্পের প্রসার ঘটেছে।

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি: এই শিল্পের বিভিন্ন কাঁচামাল ও পণ্য আমদানি-রপ্তানির প্রয়োজনে সমুদ্র বন্দর ও অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার (সড়ক, বিমান, রেল) উন্নতি সাধিত হয়েছে।

উল্লিখিত আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তৈরি পোশাক শিল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৩ ডিগ্রি পাস করে চাকরির পিছনে না ঘুরে রতন আত্মকর্মসংস্থানের চেষ্টা করে। সে স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে খাদ্যদ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করে। খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করে বাজারে বিক্রির মাধ্যমে সে প্রচুর লাভবান হয়। *◀ ১ ও ৬ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. বাংলাদেশে চিনিকলের সংখ্যা কতটি? ১

খ. জমির মূল্য কীভাবে শিল্প স্থাপনে ভূমিকা রাখে? ২

গ. রতনের কর্মকাণ্ডটি মানব ভূগোলের কোন শাখায় আলোচিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রতনের কর্মকাণ্ডটি কীভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে চিনিকলের সংখ্যা ১৫টি।

খ জমির মূল্য শিল্প কারখানা স্থাপনের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শহরের কেন্দ্রস্থল অপেক্ষা আশেপাশের জমির মূল্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম থাকে। ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অধিকাংশ শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে। যেমন– ঢাকায় জমির মূল্য অধিক হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে অধিকহারে শিল্প গড়ে উঠেছে।

গ রতনের কর্মকাণ্ড মানব ভূগোলের অর্থনৈতিক শাখার বিষয়বস্তু।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেসব অর্থনৈতিক কাজ করে তা অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। এ ভূগোলের বিষয়বস্তু হলো কৃষিকাজ, পশুপালন, বনজ সম্পদ সংগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা ইত্যাদি।

রতন স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এর সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করে। কারখানা থেকে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করে বাজারে বিক্রির মাধ্যমে সে লাভবান হয়। এই উপার্জিত অর্থ দ্বারা সে তার ব্যয় নিবারণ করে। তাই বলা যায়, রতনের কর্মকাণ্ড মানব ভূগোলের অর্থনৈতিক শাখার বিষয়বস্তু।

ঘ রতনের কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্গত।

ক্ষুদ্র শিল্পে কম শ্রমিক ও স্বল্প মূলধন প্রয়োজন হয়। তাঁত শিল্প, বেকারি কারখানা, ডেইরি ফার্ম ইত্যাদি এ শিল্পের অন্তর্গত।

বাংলাদেশের মতো বৃহৎ জনসংখ্যার ও শিল্পে অনগ্রসর একটি দেশে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা অর্জনে ক্ষুদ্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গ্রামের দরিদ্র শ্রেণির লোকেরা স্থানীয় এনজিও ও ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে উৎপাদন কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছে। এর ফলে ধীরে ধীরে গ্রামীণ জনোগষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। এসব ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বাইরের বাজারেও বিক্রি করা হচ্ছে। এভাবে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান অসহায় দরিদ্র মানুষের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ প্রেমার বাড়ি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। সেখানে এমন একটি শিল্প গড়ে উঠেছে যার কাঁচামাল বাইরের দেশ থেকে আমদানি করা হয়। অপরদিকে ডলির বাড়ি দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সেখানে একটি শিল্প গড়ে উঠেছে যা দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। *◀ শিখনফল: ১*

ক. শিল্প কী? ১

খ. পাট শিল্প গড়ে ওঠার একটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রেমার অঞ্চলে গড়ে ওঠা শিল্পটির ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ডলির অঞ্চলের শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতটুকু সে সম্পর্কে মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কর্ম প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষ প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যগুলোর পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলে তাকেই শিল্প বলা হয়।

খ পাট শিল্প গড়ে ওঠার একটি কারণ হলো জলবায়ুগত কারণ।

পাট শিল্প গড়ে ওঠার জলবায়ুগত কারণ নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো–

পাট উষ্ণ অঞ্চলের ফসল, পাট চাষের প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ২০° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস এবং ১৫০ থেকে ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত। জলবায়ুগত কারণে বাংলাদেশে পাট শিল্প গড়ে উঠেছে।

গ প্রেমার অঞ্চল হলো দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বস্ত্র শিল্প প্রসার লাভ করেছে। বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প। বাংলাদেশের আবহাওয়া বস্ত্র শিল্পের অনুকূল, তারপরও বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

বাংলাদেশের বস্ত্রকলগুলো বিদেশ থেকে আমদানিকৃত তুলা ও সুতা দিয়ে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিবছর জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, কোরিয়া, ভারত পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ তুলা, সুতিবস্ত্র ও সুতা আমদানি করে থাকে।

ঘ ডলির বসবাসকৃত অঞ্চল দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে সার শিল্প প্রসার লাভ করেছে।

সার দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছর ২১ লক্ষ টন সারের প্রয়োজন। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সার অন্যতম।

প্রাকৃতিক শিল্পের সহজলভ্যতার জন্য সার শিল্পের উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় ব্যবহৃত হয়। ঘোড়াশাল সার কারখানায় তিতাস গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র ২৭টি (২০১৭ পর্যন্ত)। এবং বর্তমানে দেশে ১৪৩৮১.০৭ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ আছে। বর্তমানে দেশের ২০টি গ্যাসক্ষেত্রে ১০৯টি কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। তাই প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর সার শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়।

সুতরাং বলা যায়, উপরিউক্ত প্রাকৃতিক কারণগুলোর কারণে ডেমরা থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণ শিল্প গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ 'বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পারিবারিক সদস্য দ্বারা স্বল্প মূলধন, ছোট ছোট যন্ত্রপাতি ও কাঠামোতে কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে'— টিভিতে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেখে বেকার যুবক সুমন ঢালী সিদ্ধান্ত নিল সেও এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করবে। *◀ শিখনফল: ১*

ক. ASEAN এর পূর্ণ রূপ কী? ১

খ. মুক্তবাজার অর্থনীতির কুফল ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুমন যে শিল্পগুলো দেখতে পেল তা গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো? ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উক্ত শিল্পটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ASEAN এর পূর্ণরূপ হলো Association of south East Asian countries.

খ বর্তমান বিশ্বে প্রায় সবগুলো দেশই মুক্তবাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তবে এর কুফলও রয়েছে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে অনেক সময় বিভিন্ন প্রকার বিলাসদ্রব্য যেমন-কসমেটিকস সামগ্রী যা একেবারেই প্রয়োজন নয় তা দেশে আমদানি করা হয়ে থাকে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যবহার করা হয়। আবার মুক্তবাজার অর্থনীতির আওতায় দেশের ব্যবসায়ীগণ লাভের আশায় দেশের মূল্যবান কাঁচামাল, খনিজ সম্পদ, শক্তি সম্পদ ইত্যাদি অন্য দেশে রপ্তানি করে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল করে ফেলে। (যেমন-কাঁচা পাট।)

গ সুমন যে শিল্পগুলো দেখতে পেল তা ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্গত। ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে ওঠার প্রধান কারণ হচ্ছে শ্রমিক সহজলভ্যতা।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা অত্যধিক। এ অধিক জনসংখ্যা অনুপাতে কর্মসংস্থানের স্বল্পতা রয়েছে। এ অধিক জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। যার কারণে এরা কম মজুরিতে কাজ করে। আর ক্ষুদ্র শিল্প কম শ্রমিক ও স্বল্প মূলধনে গড়ে ওঠে। এতে কম কাঁচামালে স্বল্প উৎপাদন করা হয়।

ক্ষুদ্র শিল্পগুলো গ্রাম ও শহর এলাকায় ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে ওঠে। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সহজশর্তে ঋণ প্রদান ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে উঠতে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকের আলোচ্য বিষয়টি হলো ক্ষুদ্র শিল্প।

বাংলাদেশের মতো বৃহৎ জনসংখ্যার ও শিল্পে অনগ্রসর একটি দেশে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা অর্জনে ক্ষুদ্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গ্রামের দরিদ্র শ্রেণির লোকেরা স্থানীয় এনজিও, ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে নানামুখী উৎপাদন কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছে এবং ধীরে ধীরে গ্রামীণ অসহায় শ্রেণির কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করছে।

এসব ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বাইরের বাজারেও বিক্রি করা হচ্ছে। এভাবে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান অসহায় দরিদ্র মানুষের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ দৃশ্য-১: উত্তরাঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপাদন হওয়ায় এ এলাকায় দেশের অধিকাংশ রাইসমিল গড়ে উঠেছে।
দৃশ্য-২: নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অনেক শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. শিল্পায়ন কী? ১

খ. শিল্পায়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দরকার কেন? ২

গ. উদ্দীপকের দৃশ্য দুটিতে শিল্প গড়ে ওঠার কোন ধরনের কারণ প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার এ ধরনের আরও অনেক কারণ রয়েছে? তোমার উত্তরের পক্ষে লেখো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষি থেকে শিল্পের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রক্রিয়াই শিল্পায়ন। যেমন– নব্বইয়ের দশকে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ব্যাপকভাবে সুতা ও বস্ত্রকল স্থাপিত হওয়ায় সেখানে কৃষিকাজ যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে তথা শিল্পায়ন ঘটেছে।

খ যেকোনো দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজন।

শিল্প কারখানাগুলোর উৎপাদন অব্যাহত রাখা, প্রস্তুতকৃত মালামাল যথাসময়ে ভোক্তার নিকট পৌঁছানো, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশীয় উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে দৃশ্য দুটিতে শিল্প গড়ে ওঠার প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত কারণগুলো প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ যেকোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার জন্য কাঁচামাল, জলবায়ু, শক্তি ও জলসম্পদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকের প্রথম দৃশ্যে কুষ্টিয়া জেলায় প্রচুর রাইসমিল গড়ে উঠেছে। এর প্রধান কারণ হলো কুষ্টিয়াতে প্রচুর ধান উৎপাদন হয়। অর্থাৎ কুষ্টিয়ায় কাঁচামালই (ধান) হচ্ছে শিল্প গড়ে ওঠার প্রধান নিয়ামক। এছাড়াও কুষ্টিয়াতে জলবায়ুগত নিয়ামক (তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত) ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবার উদ্দীপকের দ্বিতীয় দৃশ্য অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অধিকাংশ শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে পানি সম্পদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং বলা যায় যে, প্রাকৃতিক নিয়ামক তথা কাঁচামালের প্রাপ্তি, জলবায়ু ও পানিসম্পদের পর্যাপ্ততার উপর ভিত্তি করে স্থান দুটিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে।

ঘ শুধু প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। এগুলোর গড়ে ওঠার পেছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদানগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মূলধন, শ্রমিক, বাজার, পরিবহন, জমির মূল্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক নিয়ামকের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। কারণ, যেকোনো শিল্প স্থাপনের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, কারখানা নির্মাণ, কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ সরবরাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। আবার শিল্পের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক আবশ্যক। কেননা শ্রমিকের নিপুণতা ও কর্মদক্ষতার উপর শিল্পের উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করে। শিল্প স্থাপনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো বাজার। কারণ, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার ওপর শিল্পের বিকাশ নির্ভর করে। ফলে অধিকাংশ শিল্প বাজারের কাছে গড়ে ওঠে। এ ছাড়া পরিবহন ব্যবস্থা ও জমির মূল্যের কারণেও শিল্পের কেন্দ্রীকরণ (Centralization) হয়ে থাকে।

অপরদিকে, যেকোনো শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারি নীতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ব্যবসায়িক সুনাম প্রভৃতি রাজনৈতিক কারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ সরকারি নীতির ফলে শিল্পের স্থানীয়করণ হয়ে থাকে। আবার সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে শিল্পকে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়। অন্যদিকে, কোনো পূর্ববর্তী ব্যবসায়িক সুনামকে কেন্দ্র করে শিল্প স্থাপিত হলে তা অল্প সময়ের মধ্যেই বিকশিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পেছনে প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৭

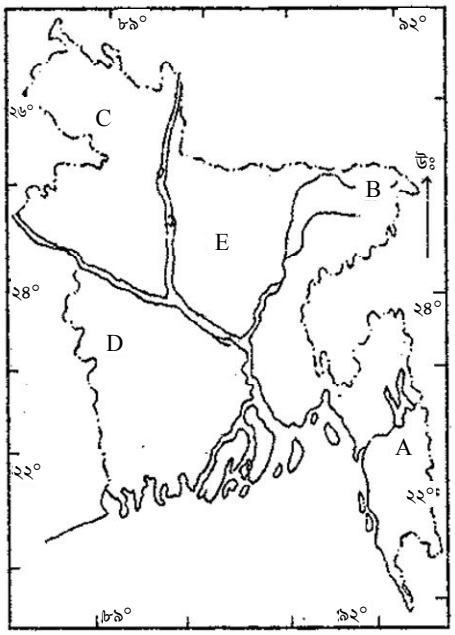

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. উল্লিখিত চিত্রে A, B, C, D, E দ্বারা কোন অঞ্চলকে বোঝায়? ১

খ. শিল্পায়নে কেন যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. B, C ও D স্থানে কী কারণে শিল্প গড়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. A ও E স্থানে কোন ধরনের শিল্পের সাদৃশ্যতা রয়েছে? স্থান দুটিতে উক্ত শিল্প গড়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উল্লিখিত চিত্রে A, B, C, D, E দ্বারা যথাক্রমে চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, খুলনা এবং ঢাকা অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে।

খ শিল্প স্থাপনের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন না হলে কোনো স্থানে শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কেননা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ এবং শিল্প থেকে উৎপাদিত পণ্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য উন্নতমানের যোগাযোগ ব্যবস্থার (বিমান, রেল, সড়ক) প্রয়োজন রয়েছে। তাই শিল্পের অগ্রগতির জন্য আগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত B, C ও D দ্বারা যথাক্রমে সিলেট, রংপুর ও খুলনা অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক (জলবায়ু, ভূপ্রভৃতি) ও অর্থনৈতিক (কাঁচামাল, মূলধন) নিয়ামকের কারণে সিলেটে চা, রংপুরে চিনি এবং খুলনায় কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে।

চা চাষের জন্য ঢালযুক্ত উঁচু ভূমি, আর্দ্র জলবায়ু, ২৩° - ২৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রা, ১৫২ সেমি বৃষ্টিপাত এবং কিছুটা নাইট্রোজেনযুক্ত অম্লধর্মী মৃত্তিকা প্রয়োজন। সিলেট অঞ্চলে এ ধরনের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু রয়েছে। এছাড়া শ্রমিক ও পরিবহন ব্যবস্থা অনুকূলে থাকায় স্থানীয় চা বাগানের উপর ভিত্তি করে চা শিল্প গড়ে উঠেছে। ইক্ষু চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন। রংপুরের জলবায়ু অনুকূলে থাকায় এ অঞ্চলে প্রচুর আখ চাষ হয়। এছাড়া স্থানীয় কাঁচামাল, শ্রমিক সহজলভ্যতা, পরিবহন ব্যবস্থার কারণে রংপুরে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছে। কাগজ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল বাঁশ ও বেত। খুলনা এবং এর আশপাশের অঞ্চলে (সুন্দরবন) প্রচুর বাঁশ ও বেত পাওয়া যায় বলে এ অঞ্চলে কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে।

ঘ A ও E স্থান দুটি হলো যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও ঢাকা। দুটি স্থানেই তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে উঠেছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দুটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এখানে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (সড়ক, রেল, নৌ) এখানে রয়েছে। এছাড়া রয়েছে মূলধন সরবরাহের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক, বীমা)। উপরন্তু চট্টগ্রামে সমুদ্র এবং ঢাকায় নদীবন্দর থাকায় পণ্যসামাগ্রী রপ্তানি করাও সহজ। পোশাক শিল্পের জন্য এ সকল উপাদান খুবই জরুরি।

সুতরাং দেখা যায়, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এলাকায় পোশাক শিল্প বিকাশের যাবতীয় অনুকূল নিয়ামক বা উপাদান বিদ্যমান। এসব নিয়ামকের প্রভাবেই অঞ্চল দুটিতে তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ মাহমুদের বাড়ি উত্তরবঙ্গের রাজশাহী। পড়ালেখার উদ্দেশ্যে সে কানাডায় পাড়ি জমায়। প্রায় দশ বছর পর গ্রামে ফিরে সে দেখতে পায়, গ্রামের অধিকাংশ জমিতে একটি ফসল উৎপাদিত হয়, যার উপর ভিত্তি করে উত্তরবঙ্গে অনেকগুলো শিল্প গড়ে উঠেছে। ◀◀ *শিখনফল: ৩*

ক. কার্পাস বয়ন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কোনটি? ১

খ. ছাতক সিমেন্ট কারখানা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখো। ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত অঞ্চলে চিনি শিল্পের বণ্টন বিশ্লেষণ করো। ৪

ঘ. উক্ত শিল্পটির প্রসারে কী কী সমস্যা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কার্পাস বয়ন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল তুলা।

খ ছাতক সিমেন্ট কারখানা ১৯৪১ সালে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকে 'আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কারখানা' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৩ সালে কারখানাটিতে উৎপাদন শুরু হয়।

১৯৯৮ সালে জাপানের কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় এ কারখানার সম্প্রসারণ শুরু হয়। কাঁচামাল হিসেবে এ কারখানায় প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। বর্তমান এ কারখানায় বার্ষিক প্রায় ২.৬৭ লাখ টন সিমেন্ট উৎপাদিত হচ্ছে।

গ যে ফসলের উপর ভিত্তি করে উত্তরবঙ্গে অনেকগুলো শিল্প গড়ে উঠেছে তা হলো আখ। আখের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে চিনিশিল্প।

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ১৫টি চিনিকল রয়েছে। এ চিনিকলগুলো ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও খুলনা বিভাগে অবস্থিত। ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করায় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশালে কোনো চিনিকল গড়ে উঠেনি। নিচে বিভাগ অনুসারে চিনি শিল্পের বণ্টন দেখানো হলো—

রাজশাহী বিভাগ: দেশের ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ৫টি এ বিভাগে গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলের চিনিকলগুলো হলো জয়পুরহাট, নাটোর, রাজশাহী, পাবনা, নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস।

রংপুর বিভাগ: এ বিভাগে মোট ৫টি চিনিকল রয়েছে। সেগুলো হলো পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, শ্যামপুর, সেতাবগঞ্জ এবং রংপুর সুগার মিলস।

খুলনা বিভাগ: এ অঞ্চলে মাত্র ৩টি চিনিকল গড়ে উঠেছে। এগুলো হলো কুষ্টিয়ার জগতি, কেরু এন্ড কোং ও মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস। তবে এসব চিনিকলের মধ্যে দর্শনার কেরু এন্ড কোম্পানি চিনি কলটি বেসরকারি খাতে নির্মিত। ১৯৩৮ সালে ব্যক্তিমালিকানায় নির্মিত এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭২ সালে জাতীয়করণ করা হয়। এখানে চিনি ছাড়াও অ্যালকোহল, স্পিরিট প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ: ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহ আখ চাষের অনুকূল হওয়ায় এ অঞ্চলে প্রচুর আখ জন্মে। এ বিভাগ দুটিতে একটি করে চিনি কল আছে। এ কলগুলো হলো ফরিদপুর সুগার মিলস এবং জামালপুরের ঝিল বাংলা চিনিকল।

সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশের সর্বত্র চিনিশিল্প সমভাবে বন্টিত হয়নি।

ঘ উত্তরবঙ্গের ফসলটির উপর ভিত্তি করে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের চিনি শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হলেও বেশ কতগুলো সমস্যা এর প্রসারে বাধার সৃষ্টি করছে। যেমন –

একর প্রতি কম উৎপাদন: বাংলাদেশে চিনিকলগুলোর চাহিদার তুলনায় আখের উৎপাদন অনেক কম। অনুর্বর মৃত্তিকা, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব, পোকার আক্রমণ প্রভৃতি কারণে আখের উৎপাদন কম হয়ে থাকে।

পরিবহন সমস্যা : দূরবর্তী এলাকা থেকে কারখানায় আখ নিয়ে আসার প্রয়োজনীয় সুলভ পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় খরচ বেশি হয়। কারণ আখ কেটে রেখে দিলে অথবা সময়মতো না কাটলে রস কমে যায়। ফলে উৎপাদনে এর প্রভাব পড়ে।

গুড় তৈরির প্রবণতা: চিনিকলগুলোতে উপযুক্ত মূল্য পায় না বলে কৃষকরা গুড় তৈরিতে আগ্রহী হয়ে থাকে। এছাড়া চিনি তৈরি করতে যেখানে ৯০ শতাংশ রস কাজে লাগে সেখানে গুড় তৈরি করতে লাগে মাত্র ৬৫ শতাংশ। ফলে চিনি তৈরিতে কৃষকগণ আগ্রহ দেখান না।

দুর্নীতি: সর্বোপরি জাতীয়করণকৃত মিলে কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা, সীমাহীন দুর্নীতি, ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে চিনি শিল্পের উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়– বাংলাদেশে চিনি শিল্প গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়ে থাকে। তবে উপরিউক্ত সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠলে বাংলাদেশের চিনি শিল্প উন্নতির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৯ জমির উর্বরাশক্তি হ্রাস পাওয়ায় গাজী সাহেব পূর্বের তুলনায় ফসল কম পান। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তিনি সার প্রয়োগ করতে চান। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রয়োজন অনুযায়ী এবং নির্দিষ্ট সময়ে সার পাচ্ছেন না। তিনি মনে করেন, কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে দ্রুত এ শিল্পের সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. বস্ত্র বয়ন শিল্প কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় কেন? ২

গ. গাজী সাহেব সময়মতো সার না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শিল্পে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে গাজী সাহেব তার জমির ফলন উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারবেন– বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল শিল্পে কার্পাস হতে সুতা এবং সুতা হতে বস্ত্র তৈরি করা হয় তাকে বস্ত্র বয়ন শিল্প বলে।

খ বস্ত্রকল পরিচালনার জন্য যে উন্নতমানের তুলা ও সুতা প্রয়োজন হয় তা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

বাংলাদেশ প্রতিবছর জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, কোরিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সুতা আমদানি করে; যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

গ গাজী সাহেব সময়মতো সার না পাওয়ার কারণ সার শিল্পের নানা সমস্যা। নিচে এ সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো–

i. প্রাকৃতিক গ্যাস সার কারখানার প্রধান কাঁচামাল। কিন্তু প্রয়োজনীয় গ্যাসের অভাবে অধিকাংশ কারখানার ক্ষমতা অনুযায়ী সার উৎপাদন সম্ভব হয় না।

ii. যেকোন শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে মূলধন অপরিহার্য। অনেক সময় প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব দেখা দেয়ায় সার উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

iii. বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাওয়া অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। তাই অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট এ শিল্পের উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি করে।

iv. এ শিল্পে নিয়োজিত অধিকাংশ শ্রমিকই অনভিজ্ঞ, অর্ধশিক্ষিত। তাদের মাঝে কারিগরি জ্ঞানের স্বল্পতা দেখা যায়। তাই দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে শ্রমিকরা কারখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে না।

v. শ্রমিক বিরোধ ও অসন্তুষ্টি এ শিল্পের একটি বড় সমস্যা। এর ফলে অনেক সময় কারখানা বন্ধ রাখতে হয়। তাতে উৎপাদন যথেষ্ট হ্রাস পায়।

উপরিউক্ত কারণে সার শিল্পে সার উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে দেশের চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে সব জায়গায় সার পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয় না। এ কারণে গাজী সাহেব সময়মতো সার পান না।

ঘ উদ্দীপকের শিল্পটি হচ্ছে সার শিল্প।
বাংলাদেশের সার শিল্প নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এ সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো হলো–

i. প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
ii. সার শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
iii. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশের ব্যবস্থা করা।
iv. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেয়া।
v. উন্নত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
vi. সঠিক শিল্পনীতি প্রণয়ন করা।

উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে সার শিল্পের সমস্যা দূর করা অনেকাংশেই সম্ভব হবে। ফলে সারের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং সময়মতো দেশের সব জায়গায় সার পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গাজী সাহেবও সময়মতো সার পাবেন এবং জমিতে প্রয়োগের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ১০ সাত্তার সাহেব বাংলাদেশের বিভিন্ন বস্ত্র শিল্পে সুতা বিক্রি করে থাকেন। তিনি এগুলো ভারত থেকে এদেশে নিয়ে আসেন। তিনি ভারত ও বাংলাদেশের অনেক শিল্পের মধ্যে সাদৃশ্যতা খুঁজে পান। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে? ১
খ. শিল্পকেন্দ্রগুলো শক্তি সম্পদ এলাকায় কেন গড়ে ওঠে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সাত্তার সাহেব ভারত থেকে সুতা বা বস্ত্র শিল্পের কাঁচামাল নিয়ে আসার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ভারত ও বাংলাদেশের কোন কোন শিল্পের মধ্যে সাদৃশ্যতা বিদ্যমান? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলায় সবচেয়ে বেশি (৯২টি) চা বাগান রয়েছে।

খ শক্তি সম্পদের উপর শিল্পের অবস্থান অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

কারণ কারখানা চালানোর জন্য তাপ ও শক্তির প্রয়োজন। এজন্য যেসব অঞ্চলে শক্তি সম্পদের (প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল) পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকে সেসব অঞ্চলে শিল্পকেন্দ্রসমূহ গড়ে তোলা হয়। যেমন– প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাচুর্য থাকায় নরসিংদীর ঘোড়াশালে সার কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে।

গ বস্ত্র শিল্পের প্রধান কাঁচামাল তুলা।

সুতার পর্যাপ্ততা থাকার কারণে সাত্তার সাহেব ভারত থেকে সুতা নিয়ে আসেন।

তুলা উৎপাদনে বর্তমানে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয়। ভারতে ২০১৬ সালে বার্ষিক ৬,৪২৩ হাজার মেট্রিক টন তুলা উৎপন্ন হয়। তুলা হতে সুতা তৈরি হয়। এর ওপর ভিত্তি করে ভারতে বয়ন শিল্প বিকাশ লাভ করেছে।

প্রচুর তুলা উৎপাদিত হওয়ায় নিজস্ব চাহিদা পূরণ করে দেশটি তুলা রপ্তানি করে। বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ ভারত থেকে তুলা আমদানি করে। তাই সাত্তার সাহেবও ভারত থেকে সুতা বা বস্ত্র শিল্পের কাঁচামাল নিয়ে আসেন।

ঘ বাংলাদেশ ও ভারত পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বাধীন দেশ। এর মধ্যে ভারত শিল্পে সমৃদ্ধ হলেও বাংলাদেশ তুলানমূলক পিছিয়ে আছে। তবে দেশ দুটির শিল্পের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। নিচে তা আলোচনা করা হলো —

পাট শিল্প: বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে এক সময় প্রধান ছিল পাট শিল্প। পৃথিবীর সর্বপ্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ বাংলাদেশের উৎপাদিত পাটের ওপর নির্ভর করে সে সময় কলকাতায় ১০৮টি পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পাট শিল্পে বেশ উন্নতি লাভ করেছে।

চা শিল্প: বাংলাদেশ চা শিল্পে উন্নতি লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১১৬টি চা কারখানা রয়েছে। বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের পর্যাপ্ত পরিমাণ চা বাগান এদেশের চা শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। ভারতেও চা শিল্প ১৭২ বছর আগে থেকে বিস্তার লাভ করেছে। ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে চা শিল্পের বিশেষ অবদান রয়েছে।

চিনি শিল্প: বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ ইক্ষু উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও চিনি শিল্প সেভাবে বিস্তার লাভ করেনি। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫টি চিনি কল থাকলেও ইক্ষুর অভাবে কলগুলোতে ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন হচ্ছে না। বাংলাদেশ চিনি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ফলে বিদেশ থেকে চিনি আমদানি করতে হয়। অপরপক্ষে, ভারত চিনি উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয়। ২০১৬ সালে ভারতে ৩,৪১,২০০ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন হয়। ভারতে সর্বমোট ৩১৮টি চিনির কল আছে।

সিমেন্ট শিল্প: বাংলাদেশে সিমেন্টের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বড় ও মাঝারি আকারের ১২৩টি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বেশকিছু ক্ষুদ্র সিমেন্ট প্লান্ট রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ এ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিছু রপ্তানিও করছে। ভারতে ১০টি বৃহৎ সিমেন্ট প্লান্ট এবং প্রায় ৩০০টি ক্ষুদ্র সিমেন্ট প্লান্ট আছে। সিমেন্ট উৎপাদনে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয়। দেশটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৮৬ মিলিয়ন টন।

সার শিল্প: বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এবং আগের তুলনায় বর্তমানে সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে বার্ষিক প্রায় ২১ লক্ষ টন সারের প্রয়োজন। ফলে দেশের চাহিদা মেটাতে প্রচুর পরিমাণ সার আমদানি করতে হয়। বর্তমানে দেশে ৯টি সার কারখানা রয়েছে। ভারত সার শিল্পেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। গত ৫০ বছর ধরে ভারত সার উৎপাদন করে আসছে এবং সার উৎপাদনে ভারত বিশ্বে তৃতীয়।

সুতরাং উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, বাংলাদেশ শিল্পের দিক থেকে ভারতের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। এর পেছনে সুষ্ঠু নীতিমালা, উন্নত প্রযুক্তি, দক্ষ শ্রমিকের অভাব প্রভৃতি অনেকাংশে দায়ী।

প্রশ্ন ▶ ১১ পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে রত্না বেশি লেখাপড়া করতে পারেনি। সে ঢাকার অদূরে একটি শিল্প কারখানায় চাকরি নেয়। সে দেখে, তার মতো অনেক নারীর কল্যাণে এ শিল্পটি দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তাদের তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধাই নেই। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. বাংলাদেশের প্রথম সারকারখানা কোথায় স্থাপন করা হয়? ১

খ. শিল্পায়ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উক্ত শিল্পে নারীদের সমস্যা সমাধানে কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শিল্পটিতে রত্নার মতো অন্যান্য নারীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা ফেঞ্চুগঞ্জে স্থাপন করা হয়।

খ শিল্পায়ন শিল্পভিত্তিক সমাজের সূচনা করে।

শিল্পায়ন বলতে একটি বিশেষ প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র একটি প্রাথমিক বা কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে মাধ্যমিক অকৃষিভিত্তিক বা দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ তথা নতুন শিল্পভিত্তিক সমাজব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়। শিল্প বিপ্লবের (১৭৬০-১৮২০) পর গোটা ইউরোপ জুড়েই এ অবস্থা দেখা যায়।

গ রত্না যে শিল্প কারখানায় কাজ করে সেটি হলো তৈরি পোশাক শিল্প।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নারী কর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হলেও এর কিছু সমস্যা বিদ্যমান। এখানে নারী শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত।

উদ্দীপকের তৈরি পোশাক শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে নারীদের যেসব সুবিধা প্রদান করা দরকার তা আলোচনা করা হলো—

i. পুরুষ কর্মীর সাথে সাথে নারী কর্মীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
ii. নারী কর্মীদের জন্য আলাদা পরিবহনের ব্যবস্থা করা;
iii. নারীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
iv. পোশাক শিল্পের কর্মপরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা;
v. নারী কর্মীদের বাস্তবতার নিরিখে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করা;
vi. শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি ভালো কোনো জায়গায় বাসস্থানের ব্যবস্থা করা;
vii. মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; এবং
viii. সময়মতো বেতন-ভাতা প্রদান করা ইত্যাদি।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সাফল্য নির্ভর করে নারী কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ওপর। তাই এ শিল্পের সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান করে এই শিল্পকে বিশ্ব দরবারে সম্মানজনক স্থানে নেওয়া জরুরি।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত শিল্পটি হলো তৈরি পোশাক শিল্প। তৈরি পোশাক শিল্পে রত্নার মতো নারীদের অবদান সবচেয়ে বেশি।

এ শিল্পে নারী কর্মীদের অবদান নিচে আলোচনা করা হলো—

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: তৈরি পোশাক হচ্ছে বিশ্ব বাজারের সর্বাধিক চাহিদা সম্পন্ন পণ্য। নারী কর্মীরা যে পোশাক তৈরি করছে তা রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা (২০১৫-১৬ অর্থবছরে আয় ২৮.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

রপ্তানি সম্প্রসারণ: নারী কর্মীদের অবদানের ফলে প্রচুর পরিমাণে পোশাক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে এবং তা দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে।

দীর্ঘ সময় শ্রম: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের নারী কর্মীরা দীর্ঘ সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। মাঝে মাঝে প্রয়োজনে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত (ওভার টাইম) কাজও তারা করেন।

মানসম্পন্ন পোশাক তৈরি: নারী কর্মীরা তাদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায়, দক্ষতার সাথে, যত্ন নিয়ে পোশাক তৈরি করছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে মানসম্পন্ন পোশাক সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

সস্তা শ্রম: বাংলাদেশের নারী কর্মীরা খুব কম মজুরিতে অধিক শ্রম দিয়ে পোশাক তৈরির কাজ করছে। তাদের মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ৫-৮ হাজার টাকা মাত্র।

সহজে শ্রম প্রাপ্তি: পুরুষের তুলনায় নারী কর্মী সহজে পাওয়া যায়। দক্ষ শ্রমিকের পাশাপাশি আধাদক্ষ ও অদক্ষ নারী শ্রমিক প্রাপ্তির ফলে এ শিল্পের বিকাশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের প্রাণ। তাই এই শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করাসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদি প্রদান করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১২ ঘটনা-১: সাভারে রানা প্লাজা ধসে যায়। আবার তাজরীন ফ্যাশনে আগুন লাগে। দুটি ঘটনায় কয়েক হাজার গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত ও আহত হয়।

ঘটনা-২: টঙ্গী এলাকায় গার্মেন্টস শ্রমিকেরা মজুরি পাঁচ হাজার টাকা করার দাবিতে আন্দোলন করে। এতে অনেক গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে যায়। ◀ *শিখনফল: ৭*

ক. শিল্প কাকে বলে? ১

খ. শিল্পের জন্য বাজার প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাগুলো শিল্পায়নের কোন দিককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শিল্পায়নের জন্য আর কোন কোন ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা দরকার? বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা মানুষ বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি করে ব্যবহার উপযোগী করে তাকে শিল্প বলে। যেমন— সুতা থেকে বস্ত্র তৈরি।

খ শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বাজার আবশ্যক। এসব দ্রব্যের চাহিদার উপর শিল্পের উন্নয়ন নির্ভর করে। এজন্য বাজারের কাছে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

শীতপ্রধান দেশে (কানাডা, রাশিয়া) পশমি বস্ত্রের চাহিদা বেশি বলে সেখানে পশমি বয়ন শিল্প অধিক দেখা যায়। আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে (ভারত, বাংলাদেশ, চীন) কার্পাস বস্ত্রের চাহিদা থাকায় সেখানে কার্পাস বয়নশিল্প বেশি গড়ে উঠেছে।

গ উদ্দীপকের ঘটনাগুলো শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে।

ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ, প্রেষণা, নির্দেশনা ইত্যাদি। পকিল্পনার (planning) মাধ্যমে কোনো একটি শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এর মাধ্যমে শিল্পের অবস্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ। নির্দেশনার (Direction) মাধ্যমে শিল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। প্রেষণার (Motivation) মাধ্যমে কর্মীদের মাঝে কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। ফলে কর্মীদের কাজের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য প্রেষণার প্রয়োজন। শিল্পের সার্বিক কর্মকাণ্ডকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Controling System), যায় মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য বাজারে প্রেরণ করা হয়। আবার শিল্পে প্রধান উৎপাদনকারীর (Producer) ভূমিকায় থাকে শ্রমিক। শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি প্রদান করা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি থাকার ফলেই ২০১৩ সালে সাভারের রানা প্লাজা এবং তাজরীন গার্মেন্টসে সংঘটিত দুর্ঘটনা বিদেশি ক্রেতাদের ভাবিয়ে তোলে।

সুতরাং বলা যায় যে, যেকোনো শিল্পের অগ্রগতির জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা একান্ত প্রয়োজন।

ঘ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছাড়াও বিনিয়োগ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা দরকার।

বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করার জন্য শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে বিনিয়োগ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। শিল্পায়নের জন্য এ বিষয়গুলো খুবই জরুরি।

বিনিয়োগ ছাড়া শিল্পায়ন সম্ভব নয়। বিনিয়োগ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দুই রকমেরই হতে পারে। বিনিয়োগকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন হয় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার। কারণ এ ব্যবস্থা না থাকলে বিনিয়োগকারী তার উৎপাদিত পণ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। আবার অনেক বিনিয়োগকারী পণ্যের যথাযথ মূল্য না পাওয়ায় পরবর্তী সময়ে বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এর ফলে শিল্পের অগ্রগতি হ্রাস পায়। অন্যদিকে, শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অন্তরায় হলো রাজনৈতিক অস্থিরতা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব শিল্প প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধা। বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে অনেকে তার উৎপাদিত পণ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকে, অনেক তার বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত নিয়ে যেতে চায়, যা শিল্পায়নের জন্য হুমকিস্বরূপ।

সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশের জন্য সুষ্ঠু বিনিয়োগ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা খুবই জরুরি।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ১৩ লৌহ ও ইস্পাত হলো যেকোনো শিল্পের ভিত্তি। বর্তমান বিশ্বে যে দেশটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং কার্পাস শিল্প উৎপাদনে প্রথম সে দেশটি এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. আর্থিক অবস্থার উন্নতি কাকে বলে? ১

খ. শিল্প স্থাপনে মূলধন কীরূপ প্রভাব রাখে? ২

গ. উক্ত দেশটির লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত দেশটির কার্পাস উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোপরি আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতিকে আর্থিক অবস্থার উন্নতি বলে।

খ যে কোনো শিল্প স্থাপনের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন।

শিল্প স্থাপনের প্রাথমিক অবস্থায় জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, কারখানা নির্মাণ, কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদ সংগ্রহ করতে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে মূলধনের অভাব না হওয়ায় ব্যাপকভাবে শিল্প কারখানা স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ চীনের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।

ঘ চীনের কার্পাস উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলো বিশ্লেষণ করো।

সপ্তম অধ্যায়

পরিবহন ও যোগাযোগ

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১

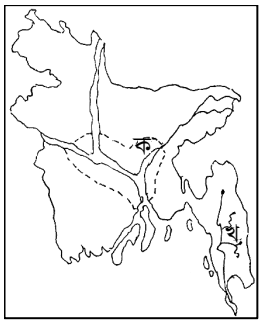

◀ *শিখনফল: ২ ও ৫ [ঢা.বো., রা.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো., ২০১৭]*

ক. বন্দর কাকে বলে? ১

খ. বন্দর গড়ে উঠার পিছনে পশ্চাৎভূমির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'খ' নির্দেশক অঞ্চলের পরিবহন পথের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে 'ক' নির্দেশিত অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অধিক ভূমিকা রাখছে– ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বন্দর হলো স্থল ও জলভাগের মিলনস্থলে অবস্থিত এমন একটি সুবিধাজনক স্থান যেখানে জলযান থেকে পণ্য ও যাত্রী উঠানামার সুব্যবস্থা থাকে। যেমন: চাঁদপুরে নদী এবং চট্টগ্রামে সমুদ্র বন্দর।

খ বন্দরের মাধ্যমে যে অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য রপ্তানি ও প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য আমদানি করা হয় তাকে ঐ বন্দরের পশ্চাদভূমি বলে।

পশ্চাদভূমি কোনো পণ্যের স্থানীয় চাহিদা মিটাতে সক্ষম হলে তাকে উদ্বৃত্ত অঞ্চল বলে। এতে করে রপ্তানি আর ঘাটতি অঞ্চল হলে আমদানি বাণিজ্য (যেমন– বাংলাদেশের খাদ্যশস্য) বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চাদভূমি যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হয় তাহলে বন্দরের উন্নতি হয়। সুতরাং বন্দর গড়ে ওঠার পিছনে পশ্চাদভূমির ভূমিকা অপরিসীম।

গ 'খ' নির্দেশক অঞ্চলটি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরিবহন পথের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভূপ্রকৃতির প্রভাব। এখানে ভৌগোলিক প্রতিকূলতায় সড়কপথ কম, রেলপথ নেই এবং নৌপথ খুবই সামান্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর ও উঁচুনিচু বিধায় এ অঞ্চলে সড়কপথ তৈরি করা কষ্টকর, ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। তাই এখানে সড়কপথ কম। রেলপথের অবকাঠামো এখানে গড়ে তোলাই সম্ভব হয়নি। আর পাহাড়ি নদী (যেমন– কর্ণফুলী) ও হ্রদ এ (যেমন– বগা লেক) স্থানীয়ভাবে কিছু নৌযান চলাচল করে।

ঘ 'ক' নির্দেশিত অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা বাংলাদেশের নৌ পরিবহনকে নির্দেশ করছে।

নদীমাতৃক এদেশে নৌপথ সহজ, আরামদায়ক, সস্তা। আমাদের দেশে নদীপথের গুরুত্বও কোনো অংশেই কম নয়।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে নৌপথের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা: সুলভ ও সহজ পরিবহন ব্যবস্থা ছাড়া কৃষিকার্যে উন্নতি হয় না। কৃষিক্ষেত্রে বীজ, সার, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক প্রভৃতি নিয়ে যাওয়া এবং উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণে সুলভ নৌপরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

শিল্পোন্নয়নে ভূমিকা: নদীপথে শিল্পের কাঁচামাল সুলভে সংগ্রহ করা যায় এবং শিল্পজাত দ্রব্যও অল্প খরচে দেশের বিভিন্ন বাজারে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

স্বল্প ব্যয়ে পরিবহন: অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহন ও যাতায়াত খরচ খুবই কম। ফলে জলপথেই দেশের ৭৫% অভ্যন্তরীণ যাত্রী ও বাণিজ্য পরিবহন কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে।

ভারী পণ্য পরিবহনের সুবিধা: অন্য যেকোনো পরিবহনের তুলনায় জলপথে ভারী বস্তু একস্থান হতে অন্যস্থানে অতি সহজে স্থানান্তরিত করা যায়।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি: বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য নদীপথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সুলভে পণ্য পরিবহনের কাজে নদীপথ খুবই উপযোগী।

বন্যার তীব্রতা হ্রাস: দেশে জলপথের সংখ্যা তথা নাব্য নদী, জলাশয় বেশি থাকলে বন্যার পানি সহজেই সরে যেতে পারে। এর ফলে দুর্যোগের তীব্রতা হ্রাস পায়।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক জলপথের বা নৌ পথের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ▶ ২

যোগাযোগ কেন্দ্রসমূহের নাম

ক	খ	গ
পোড়াদহ	আখাউড়া	
	কমলাপুর	চালনা
পার্বতীপুর		
	টঙ্গী	চট্টগ্রাম
সৈয়দপুর		
	সিলেট	পায়রা
রাজশাহী		
ঈশ্বরদী	ভৈরব	

◀ *শিখনফল: ১ ও ৪ [দি. বো. ২০১৭]*

ক. বাংলাদেশের জনশক্তি আমদানিকারক একটি দেশের নাম লেখো। ১

খ. দেশের সার্বিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' ও 'খ' কলামের স্থানসমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থার ধরনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' কলামের যোগাযোগ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যম অপেক্ষা 'গ' কলামের যোগাযোগ কেন্দ্রসমূহের পরিবহন মাধ্যম শিল্প বিকাশে অধিক কার্যকরী বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের জনশক্তি আমদানিকারক একটি দেশ হলো ওমান (২০১৫ সালে দেশটি সর্বোচ্চ ১,০৩,৬৩৭ জন জনশক্তি আমদানি করে)।

খ একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সহজতর হয়। পণ্য সামগ্রী দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর, রপ্তানি বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ, দ্রুততম সময়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমনাগমন প্রভৃতি উন্নত যোগাযোগের মাধ্যমে খুব সহজেই করা যায়। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যথাসময়ে সাড়াদানের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব অত্যধিক। তাই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর দেশের সার্বিক উন্নতি অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

গ উদ্দীপকের 'ক' ও 'খ' কলামের স্থানসমূহের যোগাযোগের ধরণ হলো ব্রডগেজ ও মিটারগেজ রেলপথ। এ দুটি যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

'ক' এর যোগযোগ স্থানসমূহে ব্রডগেজ রেলপথ গড়ে ওঠেছে। এ রেলপথে দুটি পাতের মধ্যে ব্যবধান ১.৮৪ মিটার। যমুনা নদীর পশ্চিমাংশের জেলা অর্থাৎ বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমের জেলাগুলোতে ব্রডগেজ রেলপথ (৬৫৯ কি.মি.) চালু রয়েছে। এ পথের রেলগুলো প্রশস্ত হওয়ায় চলাচল আরামদায়ক। এ পথের কয়েকটি জংশন ও রেলস্টেশন হলো- খুলনা, যশোর, দর্শনা, পোড়াদহ, পার্বতীপুর, ঈশ্বরদী, রাজশাহী, সৈয়দপুর প্রভৃতি।

অন্যদিকে কলাম 'খ' এর যোগাযোগ স্থানসমূহে মিটারগেজ রেলপথ গড়ে ওঠেছে। এ পথের দুটি পাতের মধ্যে ব্যবধান থাকে ১ মিটার। যমুনা নদীর পূর্বাংশে অর্থাৎ দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে এ ধরনের রেলপথ চালু রয়েছে। বাংলাদেশে মিটারগেজ রেলপথের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (১,৮০৮ কি.মি.)। এ পথের কয়েকটি জংশন ও রেলস্টেশন হলো- কমলাপুর, ভৈরব, ময়মনসিংহ, টঙ্গী, আখাউড়া, সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি।

ঘ উদ্দীপকের 'গ' কলামের যোগযোগ মাধ্যমটি হলো নৌ পরিবহন। পরিবহনের এ মাধ্যম 'ক' ও 'খ' কলামে নির্দেশিত রেল পরিবহনের তুলনায় শিল্প বিকাশে অধিক কার্যকরী।

নৌ পরিবহন একটি দেশের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের নৌ পরিবহন গড়ে ওঠেছে এদেশের নদী ও সমুদ্রবন্দরকে কেন্দ্র করে। আর এক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত চট্টগ্রাম ও পায়রা সমুদ্রবন্দর এবং চালনা নদীবন্দর বাংলাদেশের শিল্প বিকাশে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌপথ সহজ ও সহজলভ্য হওয়ায় শিল্পের যন্ত্রপাতি, কলকব্জা প্রভৃতির সরবরাহ এ পথেই হয়ে থাকে। বিশ্বের অন্যান্য দেশ হতে ভারী শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রেও নৌ পরিবহন সুবিধাজনক যা রেলপথের মাধ্যমে সম্ভব হয়না। রেলপথ স্থাপন ব্যয়বহুল এবং সর্বত্র সম্ভবও নয়। ফলে এ পরিবহন পথে পণ্যদ্রব্য স্থানান্তর ও আমদানি-রপ্তানির ব্যয় অনেক বেশি। ফলে এ পথ ব্যবহার করে শিল্পের প্রসার ব্যয়বহুল। এছাড়া আমাদের দেশের নৌ বন্দরগুলোকে কেন্দ্র করে এর আশেপাশে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে যা শিল্প বিকাশে ভূমিকা রাখছে।

সুতরাং আলোচনা হতে বলা যায়, বাংলাদেশের যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেল পরিবহনের চেয়ে নৌ পরিবহন ব্যবস্থা শিল্প বিকাশে অধিক কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৩

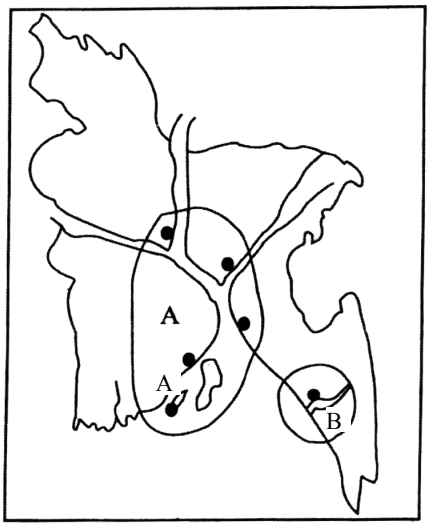

[সকল বোর্ড-২০১৬] ◀ ***শিখনফল: ৪***

ক. মংলা বন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত? ১
খ. বন্দরের উন্নতিতে পশ্চাৎভূমির ভূমিকা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্রে প্রদর্শিত 'A' স্থানে যে বন্দরগুলো গড়ে উঠেছে তার ভৌগোলিক নিয়ামকগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে 'B' স্থানটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মংলা সমুদ্রবন্দর পশুর নদীর তীরে অবস্থিত।

খ বন্দরের মাধ্যমে যে অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য রপ্তানি ও প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য আমদানি করা হয় তাকে ঐ বন্দরের পশ্চাদভূমি বলে।
পশ্চাদভূমি কোনো পণ্যের স্থানীয় চাহিদা মিটাতে সক্ষম হলে তাকে উদ্বৃত্ত অঞ্চল বলে। এতে করে রপ্তানি আর ঘাটতি অঞ্চল হলে আমদানি বাণিজ্য (যেমন– বাংলাদেশের খাদ্যশস্য) বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চাদভূমি যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হয় তাহলে বন্দরের উন্নতি হয়। সুতরাং বন্দর গড়ে ওঠার পিছনে পশ্চাদভূমির ভূমিকা অপরিসীম।

গ নদীর তীরবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো নদীবন্দর নামে পরিচিত। চিত্রে বরগুনা, বরিশাল, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও আরিচা নদীবন্দর দেখানো হয়েছে।
চিত্রে প্রদর্শিত 'A' স্থানে যে বন্দরগুলো গড়ে উঠেছে তার পিছনে বিভিন্ন ভৌগোলিক নিয়ামকের অবদান রয়েছে।
বাংলাদেশে নদী বন্দর গড়ে উঠার অনুকূল নিয়ামকের মধ্যে রয়েছে:
নদীতে পানির পর্যাপ্ততা: নদীতে পর্যাপ্ত পানি থাকার কারণে নদীবন্দরগুলো গড়ে ওঠেছে। ফলে নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার নদীতে চলাচল করে। বিভিন্ন এলাকা থেকে পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে অন্যান্য নদীবন্দর ও তীরবর্তী হাটবাজারে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়।
বালুচর ও কর্দমমুক্ত খাত: নদীখাত বালুচর ও কর্দমমুক্ত হলে লঞ্চ, স্টিমার, নৌকা প্রভৃতি বন্দর থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে সহজেই পণ্যসামগ্রী পরিবাহিত করতে পারে।
সরল প্রকৃতির নদীখাত: নদীপথ সরল প্রকৃতির হলে পণ্যসামগ্রী নিয়ে যেতে কম সময় লাগে কিন্তু নদীপথ আঁকাবাঁকা বা বক্রপ্রকৃতির হলে অধিক সময় লাগত। বাংলাদেশের নদীপথ সরল প্রকৃতির বলে সহজেই নদীবন্দর গড়ে ওঠেছে।
সমতল ভূমিবিশিষ্ট ভূভাগ: নদীবন্দর গড়ে ওঠার জন্য বন্দরের আশেপাশের ভূভাগ সমতল হওয়া বাঞ্ছনীয়। উদাহরণস্বরূপ, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ, আরিচাঘাট প্রভৃতি বন্দরের পাশে সমভূমি রয়েছে।
নদীগর্ভ প্রশস্ত ও গভীর: বাংলাদেশে নদী বন্দরগুলো গড়ে ওঠার আরেকটি কারণ হলো নদীগর্ভ প্রশস্ত ও গভীর।
বাংলাদেশে নদীবন্দর গড়ে ওঠার পেছনে উপরোক্ত অনুকূল পরিবেশগুলো উল্লেখযোগ্য এবং কার্যকর।
উপরোক্ত ভৌগোলিক নিয়ামকগুলোর কারণে চিত্রে প্রদর্শিত 'A' স্থানের নদীবন্দরগুলো গড়ে উঠেছে।

ঘ চিত্রে 'B' চিহ্নিত স্থানটি হচ্ছে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর।
বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর মোহনা হতে প্রায় ১৩ কিলোমিটার অভ্যন্তরে এ সমুদ্রবন্দর গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে এ বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম।
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বেশিরভাগ মালামাল এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি করা হয়। আমদানি ও রপ্তানিজাত পণ্যসম্ভার সুষ্ঠুভাবে পরিবহন ও সরবরাহের জন্য এ বন্দর রেল, সড়ক ও জলপথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। বর্তমানে এ বন্দরে ২৪টির মতো জাহাজ ভিড়তে পারে। তেলবাহী ট্যাঙ্কার ভিড়ার জন্য বন্দরে কতগুলো পৃথক নোঙর ঘাট রয়েছে।
বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য সামগ্রীর মধ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, চা, চামড়া প্রভৃতি এবং আমদানি পণ্যসামগ্রীর মধ্যে খাদ্যশস্য, পেট্রোলিয়াম, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি করা হয়। সুতরাং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা অর্থনীতিতে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৪ দুই বন্ধু সাব্বির ও রানা ঢাকায় একটি কলেজে পড়াশোনা করে। সাব্বিরের বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলায় এবং রানার বাড়ি বরিশালে। দুই জন গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার সময় দুই ধরনের পথ অবলম্বন করে। *শিখনফল: ১*

ক. পৌরসভার সড়কপথ বলতে কী বোঝ? ১
খ. সাব্বিরের এলাকা থেকে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার পেছনে কোন নিয়ামকটি উল্লেখযোগ্য? ২
গ. দুই বন্ধুর দুই ধরনের পথ বেছে নেওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাব্বির ও রানার এলাকার পথগুলো অর্থনৈতিকভাবে কতটুকু গুরুত্ব বহন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের বিভিন্ন পৌরসভা পর্যায়ে যে সমস্ত পাকা সড়ক পরিলক্ষিত হয় তাকে পৌরসভার সড়কপথ বলে।

খ উদ্দীপকে উল্লেখ্য সাব্বিরের এলাকাটি সিরাজগঞ্জ।
সিরাজগঞ্জ থেকে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার পেছনে যে নিয়ামকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হলো "যমুনা সেতু"। যমুনা সেতু নির্মাণের পর সড়ক ও রেলপথে ঢাকার সাথে সিরাজগঞ্জসহ উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে।

গ উদ্দীপকে সাব্বিরের বাড়ি সিরাজগঞ্জ এবং রানার বাড়ি বরিশাল হওয়ায় সাব্বির ও রানা দুই বন্ধু দুই ধরনের পথ বেছে নিয়েছে।
সিরাজগঞ্জ এর সাথে ঢাকার যোগাযোগ মাধ্যম হলো সড়কপথ এবং বরিশালের সাথে ঢাকার যোগাযোগের সর্বোত্তম মাধ্যম হলো নদীপথ। তাই স্বভাবতই দুই বন্ধু দুটিপথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সেতুর কারণে ঢাকার সাথে সিরাজগঞ্জের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। ফলে অতি দ্রুত ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গের যে কোনো এলাকায় পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কিছু কিছু জায়গার সাথে ঢাকার যোগাযোগ মাধ্যম ঐ একটি তা হলো জলপথ। তাই রানা তার বাড়ি বরিশালে নৌপথে গিয়েছে। এখানে নদীপথেই মানুষ যাতায়াত করে থাকে এবং যাবতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অথবা অন্যান্য সামগ্রী নদীপথেই পরিবাহিত হয়।

ঘ সাব্বিরের ব্যবহৃত পথ হলো সড়কপথ এবং রানার ব্যবহৃত পথ হলো জলপথ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সড়কপথ ও জলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। বৃহৎ সড়ক নির্মাণের কারণে রাজধানীর সাথে বিভিন্ন জেলার সংযোগ সাধন হয়েছে। ফলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানের পণ্য ও মালামাল আনা নেওয়া সহজতর হয়েছে। ফলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সড়ক পথের পাশাপাশি জলপথও বাংলাদেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। জলপথ দু-ধরনের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক জলপথ। দুটি জলপথই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নদীনালা, খালবিল, দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর যা বাংলাদেশের মূল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। অভ্যন্তরীণভাবে জলপথে মানুষ ও পণ্য পরিবাহিত হলেও আন্তর্জাতিক জলপথে বাংলাদেশের বেশির ভাগ পণ্য বিদেশে পরিবাহিত হয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। জলপথে পরিবহন ও যাতায়াত খরচ খুবই কম বলে বেশিরভাগ পণ্যদ্রব্য এ পথেই পরিবাহিত হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, সাব্বির ও রানার এলাকার পথগুলো অর্থনৈতিকভাবে অনেকখানি গুরুত্ব বহন করে।

প্রশ্ন ▶ ৫ বাসে চড়ে গ্রামের বাড়ি রাজশাহী থেকে চাচার বাড়ি ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল মিঠু। যাত্রাপথে সে রাস্তার দুই পাশে অনেক কৃষিজ ফসল দেখতে পেল। তার ভ্রমণ বেশ মজার ছিল। ভ্রমণ শেষে মিঠু ট্রেনে চড়ে বাড়ি ফিরে গেল।

◀ শিখনফল: ১

ক. বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর কোনটি? ১

খ. বরিশালে রেলপথ গড়ে ওঠেনি কেন? ২

গ. মিঠু যে মহাসড়কটি ব্যবহার করে ঢাকায় আসল তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. মিঠু যে পথে বাড়ি ফিরে গেল বাংলাদেশে সেই পথটির বিভিন্ন সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর।

খ ভৌগোলিক কারণে বরিশালে রেলপথ গড়ে ওঠেনি।

দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে তথা বরিশালে অসংখ্য নদী জালের মতো ছড়িয়ে আছে। ফলে এ অঞ্চলে রেলপথ তৈরি করতে হলে প্রচুর ছোট বড় সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি তৈরি করা প্রয়োজন যা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। ফলে বরিশালে রেলপথ গড়ে ওঠেনি।

গ মিঠুর বাড়ি রাজশাহী এবং তার চাচার বাড়ি ঢাকা জেলায়। ঢাকার সাথে রাজশাহীর প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো সড়কপথ। সুতরাং মিঠু ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কটি ব্যবহার করে ঢাকায় পৌঁছেছে। নিচে এ মহাসড়কটির বর্ণনা দেওয়া হলো:

বিভাগীয় শহর রাজশাহীর সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ স্থাপনকারী এই সড়ক পথের দৈর্ঘ্য ২৬৯ কি.মি.। ঢাকা থেকে নবীনগর, কালিয়াকৈর হয়ে টাঙ্গাইল সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও নাটোর জেলার মধ্য দিয়ে এই মহাসড়কটি রাজশাহী গিয়ে পৌঁছেছে। রাজশাহী থেকে একটি শাখা সড়ক চাঁপাইনবাবগঞ্জে গিয়েছে। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জেলার সাথে দেশের উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষায় উক্ত মহাসড়কটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ মিঠু তার চাচার বাসা থেকে রেলপথে বাড়ি ফিরে গেল।

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলপথ অন্যতম। রাষ্ট্রীয় খাতে পরিচালিত এ পথের সমস্যাও কম নয়। নিচে বাংলাদেশের রেল পরিবহন ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করা হলো—

১. রেলপথ নির্মাণ, সম্প্রসারণ, উন্নত ইঞ্জিন ও বগি ক্রয়, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি ও পরিকল্পনার অভাব রয়েছে।

২. প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে নতুন নতুন রেলপথ নির্মাণ ও পুরোনো রাস্তাগুলো মেরামত করা হয় না।

৩. টেলিযোগাযোগ ও সংকেত ব্যবস্থা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ।

৪. রেললাইনকে শক্তিশালী করতে প্রতি ১০/১২ বছর পরপর স্লিপারগুলোকে পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু এ দেশে তা করা হয় না। এমনকি রেলপথের নিচে অবস্থিত শক্ত পাথরের স্তর খুবই পাতলা।

৫. প্রয়োজনের তুলনায় রেলইঞ্জিন, যাত্রীবাহী কোচ এবং ওয়াগনের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

৬. রেলপথে যাত্রীর তুলনায় ট্রেনের সংখ্যা খুবই কম এবং সেবার মানও নিম্ন স্তরের।

৭. সর্বোপরি দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে রেলওয়ে উন্নতি সাধন করতে পারছে না।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর কারণে বাংলাদেশে রেলপথ যাত্রীদের উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে পারছে না। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যত দ্রুত সম্ভব রেলপথের সমস্যা কাটিয়ে ওঠা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ৬ সাকিবের গ্রামের বাড়ি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি জেলায়। পেশাগত কারণে তিনি ঢাকায় অবস্থান করেন। ছুটিতে তিনি প্রতি মাসে একবার বাড়ি যান। তিনি যে পথে বাড়ি যান সেই পথটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। *◀ শিখনফল: ২*

ক. বাংলাদেশের মানুষের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম কোনটি? ১

খ. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সড়কপথের ঘনত্ব কম কেন? ২

গ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাকিবের চলাচলকারী পথটির ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত পথে পরিবহনের সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মানুষের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম সড়কপথ।

খ যেকোনো দেশের পরিবহন ব্যবস্থার উপর সেই দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে এ কারণেই সড়কপথের ঘনত্ব কম।

ঢালযুক্ত, উঁচু-নিচু স্থানে সড়কপথ তৈরি করা কষ্টকর, ব্যবহুল ও সময়সাপেক্ষ। অর্থাৎ, বেশি ঢাল (steep slope) সড়কপথ তৈরির বাধাস্বরূপ। এজন্য বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চল তথা দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে (পার্বত্য চট্টগ্রাম) সড়ক পথের ঘনত্ব কম।

গ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো জলপথ। অর্থাৎ, উদ্দীপকে সাকিবের চলাচলকারী পথটি হলো জলপথ।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশের ছোট-বড় অসংখ্য নদ-নদী পরিবহন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের সর্বত্র অসংখ্য নদ-নদী জালের ন্যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নদী পথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন সহজ ও সুলভ। বাংলাদেশে অসংখ্য খাল-বিল ও নদী মিলে প্রায় ৮,৪৩৩ কি.মি. দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ আছে। এর মধ্যে প্রায় ৫,৯৬৮ কি.মি. সারাবছর এবং ৩,৮৬৫ কি.মি. জলপথ কেবল বর্ষা মৌসুমে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ চলাচলের জন্য অধিক উপযোগী। বর্তমানে বাংলাদেশে ২৯২টি লঞ্চঘাট ও ৪৩টি ফেরিঘাট আছে (সূত্র- বাংলাপিডিয়া)। এদেশের অসংখ্য বন্দরের মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, বরিশাল, খুলনা, ভৈরব বাজার, আশুগঞ্জ, চাঁদপুর, ঝালকাঠি, আরিচা, আজমিরিগঞ্জ, মোহনগঞ্জ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বন্দরের মাধ্যমে এই সমস্ত জলপথে প্রতিনিয়ত অসংখ্য লঞ্চ, স্টিমার, সি-ট্রাক, কার্গো, ট্রলার, দেশীয় নৌকা প্রভৃতি দ্বারা যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করা হয়ে থাকে।

ঘ সাকিবের চলাচলকারী পথটি হলো জলপথ।

বাংলাদেশের জলপথ পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে সস্তা, সহজ ও আরামদায়ক। তথাপি এ পথে রয়েছে বেশ সমস্যা। দেশে জলপথে পরিবহন ব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করা হলো–

নদী ভরাট: প্রতি বছর পলিমাটি জমে বাংলাদেশের নদীগুলোর তলদেশ ভরাট হয়ে যায়। এর ফলে এসব নদীতে (যমুনা, মহানন্দা) চরের সৃষ্টি হয় এবং নৌযান চলাচলের অসুবিধা হয়।

জলযানের অভাব: প্রয়োজনের তুলনায় নৌকা, লঞ্চ স্টিমার প্রভৃতির সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীদের নদীপথে যাতায়াত করতে হয়।

জলযান প্রস্তুত ও মেরামতের কারখানার অভাব: বাংলাদেশে জলযান প্রস্তুত ও মেরামতের কারখানা খুবই কম। এটা নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে।

যাত্রীদের সুযোগ সুবিধার অভাব: নদীপথে যাত্রীদের বিশ্রামাগার ও পণ্য গুদামজাতকরণের সুযোগ সুবিধার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে যাত্রীদের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না এবং মালামালেরও ক্ষতি হয়।

দক্ষ চালকের অভাব: বাংলাদেশে প্রায়ই লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটে। দক্ষ চালক ও নাবিকের অভাব এসব দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

বেতার যোগাযোগের অভাব: নৌ পরিবহনের নিরাপত্তার জন্য ছোটবড় সব নৌযানেই বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশের নদীপথে সর্বত্র এর ব্যবস্থা নেই। এতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

সংকেত ব্যবস্থার অভাব: বাংলাদেশের নদীপথে প্রয়োজনীয় সংকেত ব্যবস্থা নেই। এর ফলে রাতের বেলায় লঞ্চ ও স্টিমার চলাচল করতে বেশ অসুবিধা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ পেশাগত কারণে আরিফ ঢাকায় অবস্থান করেন। তিনি প্রতি মাসে ছুটিতে একবার বাড়ি যান। তিনি যে পথে বাড়ি যান সেই পথটি গড়ে ওঠার পেছনে ভৌগোলিক অবস্থানই অনেকাংশে দায়ী। উক্ত পথটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. বাংলাদেশের মানুষের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম কোনটি? ১

খ. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সড়কপথের ঘনত্ব কম কেন? ২

গ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরিফের চলাচলকারী পথটির ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত পথে পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মানুষের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম সড়কপথ।

খ যেকোনো দেশের পরিবহন ব্যবস্থার উপর সেই দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে এ কারণেই সড়ক পথের ঘনত্ব কম।

ঢালযুক্ত, উঁচু নিচু স্থানে সড়কপথ তৈরি করা কষ্টকর, ব্যবহুল ও সময়সাপেক্ষ। অর্থাৎ বেশি ঢাল (steep slope) সড়কপথ তৈরির বাধাস্বরূপ। এজন্য বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চল তথা দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে সড়ক পথের ঘনত্ব কম।

গ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো জলপথ। অর্থাৎ উদ্দীপকে আরিফের চলাচলকারী পথটি হলো জলপথ।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশের ছোট, বড় অসংখ্য নদ-নদী পরিবহন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের সর্বত্র অসংখ্য নদ-নদী জালের ন্যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নদী পথে পণ্য, যাত্রী পরিবহন সহজ ও সুলভ। বাংলাদেশে অসংখ্য খাল-বিল ও নদী মিলে প্রায় ৮,৫০০ কি.মি. দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ আছে। এর মধ্যে প্রায় ৫,৬০০ কি.মি. জলপথ কেবল বর্ষা মৌসুমে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশের দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ চলাচলের বেশি উপযোগী। বর্তমানে বাংলাদেশে ১২১টি লঞ্চঘাট ও ৪৩টি ফেরিঘাট আছে। এদেশের অসংখ্য বন্দরের মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, বরিশাল, খুলনা, ভৈরব বাজার, আশুগঞ্জ, চাঁদপুর, ঝালকাঠি, আরিচা, আজমিরিগঞ্জ, মোহনগঞ্জ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত জলপথে প্রতিনিয়ত অসংখ্য লঞ্চ, স্টিমার, সি-ট্রাক, কার্গো, ট্রলার, দেশীয় নৌকা প্রভৃতি যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করে থাকে।

ঘ আরিফের চলাচলকারী পথটি হলো জলপথ।
বাংলাদেশের জলপথ পরিবহন মাধ্যম হিসেবে সহজ, সুলভ ও আরামদায়ক। তথাপি এ পথে রয়েছে বেশ কিছু সমস্যা। জলপথে পরিবহন ব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করা হলো–
বাংলাদেশের জলপথ পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে সস্তা, সহজ ও আরামদায়ক। তথাপি এ পথে রয়েছে বেশ সমস্যা। দেশে জলপথে পরিবহন ব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করা হলো–
নদী ভরাট: প্রতি বছর পলিমাটি জমে বাংলাদেশের নদীগুলোর তলদেশ ভরাট হয়ে যায়। এর ফলে এসব নদীতে চরের সৃষ্টি হয় এবং নৌযান চলাচলের অসুবিধা হয়।
জলযানের অভাব: প্রয়োজনের তুলনায় নৌকা, লঞ্চ স্টিমার প্রভৃতির সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীদের নদীপথে যাতায়াত করতে হয়।
জলযান প্রস্তুত ও মেরামতের কারখানার অভাব: বাংলাদেশে জলযান প্রস্তুত ও মেরামতের কারখানা খুবই কম। এটা নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে।
যাত্রীদের সুযোগ সুবিধার অভাব: নদীপথে যাত্রীদের বিশ্রামাগার ও পণ্য গুদামজাতকরণের সুযোগ সুবিধার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে যাত্রীদের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না এবং মালামালেরও ক্ষতি হয়।
দক্ষ চালকের অভাব: বাংলাদেশে প্রায়ই লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটে। দক্ষ চালক ও নাবিকের অভাব এসব দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।
বেতার যোগাযোগের অভাব: নৌ পরিবহনের নিরাপত্তার জন্য ছোটবড় সব নৌযানেই বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশের নদীপথে সর্বত্র এর ব্যবস্থা নেই। এতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।
সংকেত ব্যবস্থার অভাব: বাংলাদেশের নদীপথে প্রয়োজনীয় সংকেত ব্যবস্থা নেই। এর ফলে রাতের বেলায় লঞ্চ ও স্টিমার চলাচল করতে বেশ অসুবিধা হয়।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি, উল্লিখিত সমস্যাসমূহ সমাধান করা গেলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে জলপথ বাংলাদেশে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৮ শারমিনের বাড়ি রাজশাহী। সে রাজশাহী থেকে সড়কপথে ঢাকা আসে। পরে ঢাকা থেকে একই পথে চট্টগ্রাম যায়। সেখান থেকে সে ঢাকা ফিরবে। ঢাকায় ফিরে ঢাকা থেকে সিলেট যাওয়ার ইচ্ছা আছে। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. রপ্তানি পশ্চাদভূমি কী? ১
খ. চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব লিখো। ২
গ. উদ্দীপকে শারমিনের যাতায়ত পথগুলো চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বাইরেও বাংলাদেশে এ ধরনের অজানা অনেক পথ রয়েছে– কথাটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রপ্তানি পশ্চাদভূমি হচ্ছে বন্দরের সেবাগ্রহণকারী দেশ বা অঞ্চল থেকে পণ্য বা দ্রব্যগুলো বন্দরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট দেশে বা অবস্থানে পৌঁছানো।

খ দেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যাপক গুরুত্ব লক্ষ করা যায়।
চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে পাট, পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, ওষুধ, চা, হিমায়িত খাদ্য, প্রসাধনীসামগ্রী ইত্যাদি রপ্তানি হয়। আবার বিদেশ থেকে এ বন্দরের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য শিল্পের বিভিন্ন কাঁচামাল, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যসামগ্রীক খনিজ তেল ইত্যাদি আমদানি করা হয়ে থাকে। এ বন্দরকে কেন্দ্র করে এখানে অনেক ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ও চট্টগ্রাম নগর সম্প্রসারিত হচ্ছে।

গ উদ্দীপকের শারমিনের যাতায়াতের পথগুলো হলো ঢাকা-রাজশাহী সড়কপথ ও ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কপথ।
উদ্দীপকের শারমিন রাজশাহী থেকে ঢাকা-রাজশাহী সড়কপথে ঢাকা আসে। এই সড়কপথটি ২৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। এ ক্ষেত্রে নাটোর ও পাবনা শহরের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেতু পার হয়ে এরপর টাঙ্গাইলের ভেতর দিয়ে ঢাকায় আসতে হয়। এবার ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কপথে যেতে হয়। এটি বাংলাদেশের প্রধান সড়কপথ। এই সড়কপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৯৫ কিলোমিটার। এ পথটি ঢাকা থেকে দাউ কান্দি সেতু পার হয় এরপর কুমিল্লা ও ফেনীর মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। চট্টগ্রাম থেকে এর একটি শাখাপথ কক্সবাজার হয়ে টেকনাফ, একটি কাপ্তাই, একটি শাখাপথ রাঙামাটি এবং অপরটি বান্দরবান পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঢাকা-রাজশাহী সড়কপথ ও ঢাকা- চট্টগ্রাম সড়কপথটি অত্যন্ত ব্যস্ত ও দীর্ঘতম সড়কপথ।

ঘ উদ্দীপকের শারমিনের যাতায়াতের পথগুলো হলো ঢাকা-রাজশাহী সড়কপথ ও ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কপথ।
বাংলাদেশে এ ধরনের আরও অনেক পথ রয়েছে। যেমন–
ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক: রাজধানী ঢাকা থেকে এই সড়কপথটি মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাট হয়ে ফরিদপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, যশোর জেলার উপর দিয়ে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী খুলনায় গিয়ে শেষ হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক পথটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৪৬ কি.মি.।
ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক: এই মহাসড়কটি রাজধানী থেকে নরসিংদী, ভৈরব, আশুগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার মধ্য দিয়ে সিলেট গিয়ে শেষ হয়েছে। প্রায় ৩০০ কি.মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই সড়ক পথে ভৈরবে মেঘনা নদীর উপর একটি অত্যাধুনিক দৃষ্টি নন্দন সেতু আছে।
ঢাকা-রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়ক: বাংলাদেশের দীর্ঘতম মহাসড়ক। ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, সৈয়দপুর হয়ে দিনাজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহাসড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ কি.মি.। বাংলাদেশের দীর্ঘতম সড়কসেতু "বঙ্গবন্ধু সেতু" এই মহাসড়কের টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জের মধ্যবর্তী যমুনা নদীর উপরে অবস্থিত।

প্রশ্ন ▶ ৯ কুসুমপুর কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাসফরে চট্টগ্রাম গিয়ে দেখল, কর্ণফুলী নদীর মোহনা দিয়ে বড় বড় জাহাজ বন্দরের দিকে যাচ্ছে। কোনো জাহাজ থেকে মালামাল বন্দরে নামানো হচ্ছে। এ ঘটনা তাদের ভীষণভাবে বিমোহিত করেছে।
◀ *শিখনফল: ৪*

ক. ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট সড়কপথের দূরত্ব কত? ১
খ. বাংলাদেশে রেল পরিবহনব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নতিতে কী কী ভূমিকা রাখছে— উল্লেখ করো। ২
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত এলাকার সমুদ্রবন্দর বাংলাদেশের মানচিত্রে অংকন করে নির্দেশ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের পক্ষে ও বিপক্ষে তোমার মতামত উপস্থাপন করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কপথের দূরত্ব প্রায় ২৯৫ কি.মি. এবং ঢাকা-সিলেট সড়কপথের দূরত্ব প্রায় ২৪৩ কি.মি.।

খ বাংলাদেশের সব গুরুত্বপূর্ণ শহর, বন্দর, বাণিজ্য কেন্দ্রের সাথে রেলপথের যোগাযোগ থাকায় বিভিন্ন কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য আদান-প্রদানে তা সহায়ক হয়েছে।
কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য চাহিদাপূর্ণ এলাকায় প্রতিদিন যোগান দিয়ে রেলপথ এদেশের সম্পদের সুষম বণ্টনে সহায়তা করছে যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গ উদ্দীপকে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর কর্ণফুলী নদীর মোহনায় গড়ে ওঠেছে। নিচে বাংলাদেশের মানচিত্রে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের অবস্থান দেখানো হলো:

ঘ উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর যথাক্রমে কর্ণফুলি ও মংলা নদীর খাড়ি অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। এ বন্দরগুলো অগভীর। এ প্রেক্ষিতে গভীর সমুদ্র বন্দর প্রয়োজন বলেই মনে হয়।
গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন করায় মালামাল পরিবহনে সুবিধার পাশাপাশি অসুবিধাও দেখা যায়। নিচে গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত উপস্থাপন করা হলো।
সমুদ্রের গভীরে সমুদ্র বন্দর স্থাপন করলে বড় বড় জাহাজগুলো সহজেই বন্দরে ভিড়তে পারবে এবং মালামাল পরিবহন সহজ হবে। অপরদিকে গভীর সমুদ্রে সমুদ্রবন্দর স্থাপিত হলে বড় কোনো সামুদ্রিক দুর্যোগে মালামাল দেশের অভ্যন্তরে পরিবহন করা অসুবিধাজনক। তাছাড়া পশ্চাদভূমি থেকে সমুদ্র বন্দর দূরে হলে পণ্য পরিবহনে অধিক সময় ব্যয় হয়। সমুদ্র তীরে বন্দর গড়ে ওঠলে অনেক সময় পললায়নের কারণে জাহাজ চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিন্তু গভীর সমুদ্রে বন্দর স্থাপন করলে সহজেই জাহাজ চলাচল করতে পারে। গভীর সমুদ্র বন্দর থাকলে জাহাজ চলাচল সুবিধাজনক হলেও জরুরি প্রয়োজনে মালামাল পশ্চাদভূমিতে পৌঁছাতে দেরি হবে।
পরিশেষে বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মালামাল পরিবহনে গভীর সমুদ্রবন্দরের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ শ্যামনগরের বাসিন্দা আজমল পেশায় একজন মৌয়াল। তিনি সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ করে কম দামে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। ভালো দামে মধু বিক্রি করার জন্য তাকে শহরে যেতে হয়। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় তিনি শহরে যেতে পারেন না। *◀ শিখনফল: ৪ ও ৫*

ক. বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর কোনটি? ১
খ. পশ্চাদভূমি বলতে কী বোঝ? ২
গ. আজমলের এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার কীরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর হলো চট্টগ্রাম।

খ বন্দরের মাধ্যমে যে অঞ্চলে পণদ্রব্য রপ্তানি ও প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য আমদানি করা হয় তাকে ঐ বন্দরের পশ্চাদভূমি বলে।
পশ্চাদভূমির আয়তন ব্যাপক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হলে বন্দরের উন্নতি হয়। পশ্চাদভূমি যদি উদ্বৃত্ত অঞ্চল হয় তাহলে রপ্তানি বাণিজ্য আর ঘাটতি অঞ্চল হলে আমদানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।

গ আজমলের এলাকাটি হলো সুন্দরবন। এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ার কারণ নিম্নভূমির প্রাধান্য ও মৃত্তিকার গঠন মজবুত না হওয়া।
সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। ফলে জোয়ার-ভাটার সময় এ বনভূমিতে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে। অসংখ্য ছোট ছোট নদী এখানে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।
নিম্নভূমি ও নদীপূর্ণ অঞ্চলে মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত হয় না। ফলে বৃষ্টি কিংবা জোয়ার-ভাটার সময় মৃত্তিকা ক্ষয় হয়। এ কারণে এসব অঞ্চলে রেলপথ কিংবা সড়কপথ নির্মাণ করা খুবই কষ্টসাধ্য এবং অনেকক্ষেত্রে অসম্ভব। তাই সুন্দরবন অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করেনি।

ঘ আজমলের এলাকা সুন্দরবন নিম্নভূমি হওয়ায় এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করেনি। এ কারণে উক্ত এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নও সম্ভব হয়নি।
কোনো দেশ বা অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। যে দেশ বা অঞ্চল যোগাযোগ ব্যবস্থায় যত উন্নত সে দেশ বা অঞ্চল অর্থনৈতিক ভাবেও তত উন্নত। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন না হলে মানুষ সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে মানুষ তার উৎপাদিত পণ্য সহজে দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দিতে পারে। ফলে একজন মানুষ যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হয়, তেমনি এর মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনীতিও শক্তিশালী হয়।

আজমল যদি স্থানীয় বাজারে কম দামে মধু বিক্রি না করে শহরে গিয়ে বেশি দামে বিক্রি করতেন তাহলে তিনি অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভবান হতেন। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ায় তার শহরে যাওয়া সম্ভব হয় না। যার ফলে তার পণ্যের ন্যায্যমূল্য তিনি পান না। সুন্দরবনের সাথে যদি অন্যান্য শহরের যোগাযোগ ভালো থাকত তাহলে সেখান থেকে লোকজন এখানে আসত। আবার এখানকার বসবাসরত লোকজন শহরে তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে যেতে পারত। ফলে এ এলাকায় স্থানীয় হাট-বাজার গড়ে উঠত এবং এলাকাটির অর্থনীতি শক্তিশালী হতো।

সুতরাং বলা যায়, কোনো অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ অভিষেক এইএসসি পরীক্ষা শেষে খুলনা অঞ্চলে ঘুরতে যায়। সেখানে সে সুন্দরবন দেখতে যায়। পরে ওই অঞ্চলে অবস্থিত সমুদ্রবন্দর দেখতে যায়। এটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. ডুয়েলগেজ রেলপথ কী? ১

খ. আঞ্চলিক মহাসড়ক সম্পর্কে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে অভিষেক দেশের কোন সমুদ্রবন্দর দেখেছে? নিরূপণ করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভিষেকের দেখা সমুদ্রবন্দরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রেলপথে মিটারগেজ ও ব্রডগেজ উভয় ব্যবস্থাই থাকে তাই ডুয়েলগেজ রেলপথ।

খ আঞ্চলিক মহাসড়ক হলো বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান সড়ক ব্যবস্থা। অঞ্চলভিত্তিক এ ধরনের সড়ক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক মহাসড়কের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এ ধরনের সড়কের প্রশস্ততা জাতীয় মহাসড়ক থেকে কিছুটা কম এবং গুরুত্বও জাতীয় মহাসড়ক থেকে কিছুটা কম থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে এ ধরনের সড়কের মোট পরিমাণ ৪,২৭৮ কিলোমিটার।

গ উদ্দীপকে অভিষেক দেশের মংলা সমুদ্র বন্দর দেখেছে।

মংলা বন্দর খুলনা থেকে ৫১.৪৮ কিলোমিটার দক্ষিণে বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। ১৯৫৪ সালে মংলা বন্দর তার কার্যক্রম শুরু করে। মংলা সমুদ্র বন্দর চালুর আগে এর কার্যক্রম খুলনায় পশুর নদীর তীরে চালনা নদীর বন্দরের মাধ্যমে চালু ছিল। কিন্তু পশুর নদীতে পলিমাটির আধিক্যের কারণে এ বন্দরের কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ফলে বন্দরকে পরবর্তীকালে পশুর ও মংলা নদীর সংযোগস্থলে মংলা নামক স্থানে স্থানান্তর করা হয়। এ বন্দরের কার্যক্রম চট্টগ্রামের তুলনায় অনেক কম। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত বন্দর হিসেবে বাংলাদেশের মংলা বন্দরের বিশেষ পরিচিত রয়েছে। কিন্তু পশ্চাদভূমির সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগের অভাবে এ বন্দরের পণ্য ওঠানামার পরিমাণ কম। এ বন্দরে ৪টি জেটি, ৪টি ট্রানজিট সেতু, ৩টি কনটেইনার ওয়ার্ড ও ২টি ওয়্যারহাউজ রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ বন্দরের আয়ের পরিমাণ ছিল ১০৪.৭৩ কোটি টাকা।

ঘ অভিষেকের দেখা মংলা বন্দরের গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো–

i. মংলা বন্দর চালু হওয়ায় রপ্তানিযোগ্য পণ্য সহজে সমুদ্রপথে বিদেশে পাঠানো সম্ভব হয়েছে।

ii. এ বন্দরে বহুলোক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

iii. এ বন্দরের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয় বলে মংলা বন্দর কৃষির উন্নতিতে সহায়ক।

iv. অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরের সাথে সংযোগ থাকায়, এ বন্দরে স্বল্প মূল্যে পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি সম্ভব হয়েছে।

v. বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করা হয়ে থাকে।

vi. শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানি হয়ে থাকে।

vii. দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে এ বন্দর সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশের মোট রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৩% মংলা বন্দরের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। অতএব, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মংলা সমুদ্রবন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১২ মামুন সাহেব একজন ইলেক্ট্রনিকস ব্যবসায়ী। তিনি হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে ঘড়ি, কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি সামগ্রী আমদানি করেন। এজন্য তাকে আকাশপথ ব্যবহার করতে হয়। ◀ *শিখনফল: ৬*

ক. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স গঠিত হয় কত সালে? ১

খ. বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয় কত সালে এবং কোন দেশে? ২

গ. বাংলাদেশের বিমানবন্দরগুলোর নাম লেখ এবং চিত্রের মাধ্যমে দেখাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশের বিমান সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স গঠিত হয়।

খ বাংলাদেশের বিমান সংস্থার নাম বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

বাংলাদেশের সাথে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশের বিমান যোগাযোগ চালু রয়েছে। বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয় ৪ মার্চ ১৯৭২ সালে এবং প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাংলাদেশের ঢাকা থেকে যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরে যায়।

গ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। বিমানপথ তার মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশের বিমানবন্দরগুলোর নাম হলো–

১. সৈয়দপুর বিমানবন্দর, নীলফামারী, ২. রাজশাহী বিমানবন্দর, ৩. ঈশ্বরদী বিমানবন্দর, ৪. যশোর বিমানবন্দর, ৫. কুমিল্লা বিমানবন্দর, ৬. কক্সবাজার বিমানবন্দর, ৭. বরিশাল বিমানবন্দর, ৮. হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা; ৯. আন্তর্জাতিক ওসমানী বিমানবন্দর, সিলেট ও ১০. হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।

নিচে চিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিমানবন্দরগুলোর অবস্থান দেখানো হলো –

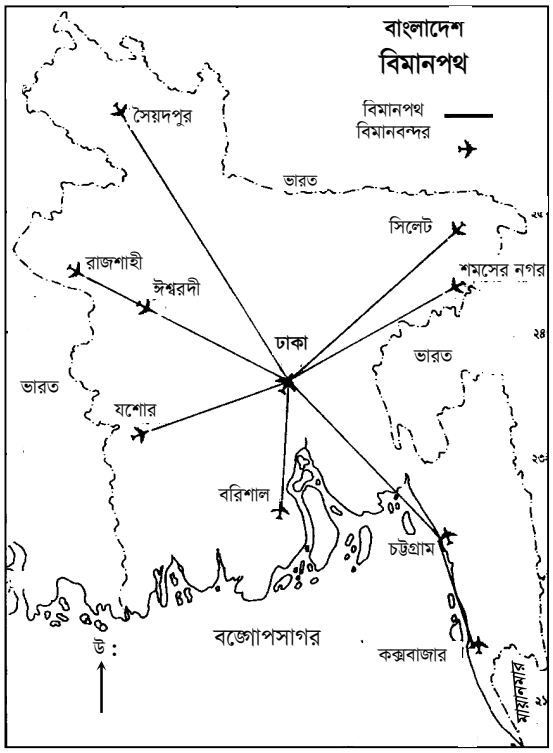

চিত্র : বাংলাদেশের বিমানপথ

ঘ বাংলাদেশের বিমান সেবা বর্তমানে যথেষ্ট আধুনিক ও অগ্রসর। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৪টি অপারেশনাল বিমান বন্দর রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক, ৫টি অভ্যন্তরীণ এবং ৫টি স্টল পোর্ট এবং আরও ২টি নতুন স্টল পোর্ট নির্মাণাধীন আছে।

১৯৯৭ সালের শেষে এয়ার পারাবত ও ১৯৯৮-এর প্রথম দিকে জিএমজি নামের দুটি বেসরকারি এয়ারলাইন্স চালু হয়। তবে বর্তমানে আকাশ পথে পণ্যদ্রব্য ও যাত্রী দ্রুত পরিবহনের লক্ষ্যে বিস্‌মিল্লাহ এয়ারলাইন্স নামে একটি বেসরকারি এয়ারলাইন্স স্টল সার্ভিস চালু হয়েছে। এরা টেকনোলজি লিঃ ও সাউথ এশিয়ান এয়ারলাইন্স নামক ১টি বেসরকারি সংস্থা হেলিকপ্টার সার্ভিসে নিয়োজিত আছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিসের মাধ্যমে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, সৈয়দপুর, কক্সবাজার, বরিশাল ও রাজশাহী যাতায়াত করা যায়। এছাড়া বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক সার্ভিসের মাধ্যমে ২৫টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যস্থলে বিমান সার্ভিস দিচ্ছে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶১৩ নুরপুর গ্রামের অধিকাংশ লোক কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু শহরের সাথে গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীরা কৃষিকাজে তেমন লাভবান হচ্ছে না। সম্প্রতি সড়ক ও জনপথ বিভাগ গ্রামের সাথে জেলা শহরের মধ্যে একটি পাকা রাস্তা নির্মাণ করেছে। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. ব্রডগেজ রেলপথ কাকে বলে? ১

খ. সমুদ্রবন্দর গড়ে উঠতে পোতাশ্রয় প্রয়োজন হয় কেন? ২

গ. নুরপুর গ্রামের কৃষির উন্নয়নে সড়ক ও জনপথ কর্তৃক নির্মিত পথটি কীভাবে ভূমিকা রাখছে- ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নুরপুর গ্রামের বাসিন্দারা উক্ত পথ নির্মিত হওয়ার ফলে আর কী কী ধরনের সুবিধা পেতে পারে বলে তুমি মনে করো। বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রেলের দুটি লাইনের মধ্যবর্তী ব্যবধান যদি ১.৬৭ মিটার হয় তবে ঐ রেলপথকে ব্রডগেজ রেলপথ বলে।

খ পোতাশ্রয় একটি আদর্শ বন্দরের পূর্বশর্ত।

মাল বোঝাই বা খালাসের পূর্বে জাহাজকে অপেক্ষা করতে হয়। পোতাশ্রয় ব্যতীত উন্মুক্ত সমুদ্রে অপেক্ষা করা জাহাজগুলোর জন্য বিপজ্জনক। এছাড়া জাহাজের মেরামতের টুকিটাকি কাজ সব সময় থাকেই। পোতাশ্রয়ে জাহাজ মেরামতের ব্যবস্থা থাকে। সমুদ্রে ঝড়-ঝঞ্ঝা থাকা স্বাভাবিক। এসময় পোতাশ্রয় জাহাজগুলোর নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। এ কারণে পোতাশ্রয় ব্যতীত বন্দরের কথা চিন্তাও করা যায় না।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ কৃষির উন্নয়নে সড়কপথের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

ঘ সড়কপথের সুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ করো।

অষ্টম অধ্যায়
বাণিজ্য

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ হাবীব সাহেব স্বাধীনতার পর তৎকালীন সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী একটি কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করতেন। কৃষিজাত পণ্যটির রপ্তানি হ্রাস পাওয়ায়, বর্তমানে তিনি সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক অপর একটি শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করছেন।

◀ *শিখনফল: ৪ [দি. বো. ২০১৭]*

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কী বোঝ? ১

খ. বাংলাদেশের ওপর মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষিজাত পণ্যটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩

ঘ. হাবীব সাহেবের রপ্তানি পণ্য পরিবর্তন করার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক দেশের সাথে অন্য দেশের পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান বা ক্রয় বিক্রয়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। যেমন- বাংলাদেশের সাথে ভারতের বাণিজ্য।

খ মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পণ্যের গুণ ও মান সুরক্ষায় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

বাংলাদেশি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোও আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করে অবাধ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের পোশাক ও ওষুধ শিল্প এর প্রমাণ। তবে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের বিভিন্ন ধরনের কোটা - যেমন GSP সুবিধা মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে হ্রাস করা উচিৎ নয়। মূলত তা শিল্প ধ্বংস করে। তা না হলে, অবশ্যই বলা যায়, বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতির সুবিধা ভোগ করে।

গ উদ্দীপকে হাবীব সাহেবের রপ্তানিকৃত কৃষিজাত পণ্যটি হলো পাট।

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। এটি স্বর্ণতন্তু নামে পরিচিত। বাংলাদেশ পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। নিচে পাটের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো–

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পাটের ব্যাপক চাহিদা ছিল। তবে বিগত কয়েক দশকে এর চাহিদা কমে আসে, ফলে উৎপাদন কম হয় এবং বিশ্ববাজারেও এর চাহিদা কমে যায়। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে একীভূত করায় এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সূত্রে জানা যায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ১৯.৬২ লাখ বেল পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ৭ হাজার ২৯৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা আয় করে। যা পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৮৭৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা বেশি। দেশে মোট কাঁচাপাটের উৎপাদনের পরিমাণ ৮০ থেকে ৮৫ লাখ বেল। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা হচ্ছে ৬৩ লাখ বেল, যা মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৫ শতাংশ। পাশাপাশি বছরে প্রায় ১২ লাখ বেল কাঁচাপাট বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। অবশিষ্ট ৭ থেকে ১০ লাখ বেল পাট ব্যবহার হচ্ছে গৃহস্থালি কাজে। সুতরাং বলা যায় যে, পাটের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ হাবীব সাহেবের বর্তমানে রপ্তানিকৃত শিল্প পণ্যটি হলো তৈরি পোশাক।

হাবীব সাহেব স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কৃষিপণ্য পাট রপ্তানি করতেন। কিন্তু পাটের উৎপাদন ও ব্যবহার কমে যাওয়ায় তিনি তার রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিবর্তন করেন। বর্তমানে তিনি শিল্পপণ্য তৈরি পোশাক রপ্তানি করে থাকেন। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের পাটের চাহিদা কমে যাওয়া, দেশীয়ভাবে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া এবং তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণই হাবীব সাহেবের রপ্তানি পণ্য পরিবর্তনের মূল কারণ।

সোনালি আঁশ নামে পরিচিত পাটের চাহিদা এক সময় বাংলাদেশ ছাড়িয়ে বিশ্ব বাজারে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে পাটের চাষ হতো। ফলে এদেশের তৈরিকৃত পাটজাত পণ্য যেমন- চট, বস্তা, থলে, কার্পেট, ম্যাট, পুতুল, শোপিস প্রভৃতি এবং কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানি হতো। সময়ের পরিবর্তনে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে না পারা, অন্যান্য দেশের বাজার দখল, বিকল্প সিনথেটিক দ্রব্যের ব্যবহার, অব্যবস্থাপনা, চাষীদের পাট চাষে অনীহা প্রভৃতি কারণে এদেশের পাটের উৎপাদন হ্রাস পায় এবং রপ্তানি কমে যায়।

অন্যদিকে আশির দশকে এ দেশে তৈরি পোশাক শিল্পের উত্থান ঘটে। ভৌগোলিক কারণ, সস্তা শ্রমশক্তি, অনুকূল জলবায়ু, কাঁচামালের প্রাচুর্য প্রভৃতি নানাবিধ কারণে পোশাক শিল্পের আন্তর্জাতিক চাহিদা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানি করে সর্বোচ্চ পরিমাণ (BGMEA এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৫-১৬ সালে ২৮০৯৪.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে যা মোট রপ্তানির প্রায় ৮২.০১ শতাংশ) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। সস্তা শ্রমের কারণে এদেশে পোশাক তৈরির খরচ কম। আবার আন্তর্জাতিক

বাজারে চাহিদার কারণে বর্তমানে অনেক উদ্যোক্তাই তৈরি পোশাক শিল্পে বিনিয়োগ করে লাভবান হচ্ছেন।

তাই বলা যায় যে, উপরিউক্ত কারণগুলোর কারণেই হাবীব সাহেব তার রপ্তানিকৃত কৃষিপণ্য পাট পরিবর্তন করে তৈরি পোশাক রপ্তানি করছেন।

প্রশ্ন ▶২ যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রসমূহের নাম

ক	খ	গ
যশোর	চাঁদপুর	পায়রা
খুলনা	সোয়ারীঘাট	মংলা
ঈশ্বরদী	ভৈরব	চট্টগ্রাম

◀ *শিখনফল: ১ [বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর]*

ক. বাণিজ্যের লেনদেনের ভারসাম্য কাকে বলে? ১

খ. পশ্চাদভূমি কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে 'ক' ও 'খ' নামের স্থানসমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কলাম গ এর গুরুত্ব অনেক বেশি- বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে বিস্তর পার্থক্যই বাণিজ্যের লেনদেনের ভারসাম্য

খ যে অঞ্চলের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্যগুলো কোন বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং ঐ বন্দরের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যাদি যে অঞ্চলে বণ্টন করা হয়, সেই অঞ্চলকে ঐ বন্দরের পশ্চাদভূমি বলে।

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল চট্টগ্রাম বন্দরের পশ্চাদভূমি।

গ ছকের 'ক' দ্বারা স্থলবন্দর ও 'খ' দ্বারা নদীবন্দর বোঝানো হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে স্থল ও নদী বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম।

সম্পদের সুষম বণ্টনে স্থল ও নদীবন্দরগুলো ব্যবহার করা হয়। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যগুলো দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর জন্য স্থল ও নদীবন্দরগুলো ব্যবহার করা হয়। যশোরের বেনাপোল সবচেয়ে ব্যস্ততম স্থলবন্দর। দেশের অধিকাংশ আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্য এ বন্দরের মধ্য দিয়ে আদান-প্রদান করা হয়। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য এসব স্থল ও নদীবন্দরের সাহায্যে খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতাদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। ঢাকার সোয়ারীঘাটে দক্ষিণাঞ্চল থেকে উৎপাদিত পণ্য নদীপথে আনা হয় এবং এখান থেকে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে(কারওয়ান বাজার, মালিবাগ বাজার) প্রেরণ করা হয়। চাঁদপুর, ভৈরব নদীবন্দর থেকে প্রচুর মাছ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। সুতরাং বলা যায়, কৃষিজাত পণ্য থেকে শুরু করে শিল্পজাত পণ্য, আমদানিকৃত পণ্য প্রভৃতি সুষম বন্টনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে স্থলবন্দর ও নদীবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ উদ্দীপকে 'গ' কলামে উল্লিখিত সমুদ্রবন্দরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে পায়রা তৃতীয় সমুদ্রবন্দর। এ বন্দরটি পায়রা বন্দর এখনও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয় নি।

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দেশের মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। মংলা বন্দর দিয়ে মোট রপ্তানির প্রায় ১৩ শতাংশ এবং আমদানির প্রায় ৮ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। (সূত্র:বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭)

চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি লেনদেনের কাজ সম্পাদিত হয়। এই বন্দরগুলোতে প্রশাসনিক এবং পরিচালনার কাজে বহুলোক নিয়োজিত রয়েছে। এতে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমুদ্রবন্দরগুলোকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে বহু শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য এ বন্দরগুলোর মাধ্যমে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, চা, চামড়া প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। মংলা সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে চিংড়ি, হিমায়িত খাদ্য প্রভৃতি বেশকিছু পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। উল্লেখ্য পায়রা বন্দর পুরোদমে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ শুরু করলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য অনেক সহজ হবে।

সর্বোপরি বলা যায়, দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য তথা সামগ্রিক অর্থনীতিতে সমুদ্র বন্দরগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এসব বন্দরের মাধ্যমে সরকারের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্বও আয় হয়।

প্রশ্ন ▶৩ ইফতেখার খান গাজীপুরে একটি পোশাক তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। এ কারখানার জন্য যে সুতা প্রয়োজন হয় তা তিনি চীন থেকে নিয়ে আসেন। আবার তার কারখানার তৈরি পণ্য বিভিন্ন দেশে রফতানি করেন। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ইফতেখার খানের কারখানায় উৎপাদিত পণ্য দ্বারা কী ধরনের বাণিজ্য সংঘটিত হয় ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত বাণিজ্য সংঘটনে কী কী নিয়ামক প্রভাব ফেলে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদান হয়, তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। যেমন- বাংলাদেশের সাথে ভারতের বাণিজ্য।

খ মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

বাণিজ্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়ে থাকে।

গ ইফতেখার খানের কারখানায় উৎপাদিত পণ্য দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে। দুই বা ততোধিক

সার্বভৌম দেশের অধিবাসীদের মধ্যে দ্রব্য ও সেবা কার্যাদির আদান-প্রদানকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।
সাধারণত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে কোনো দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য চাহিদাপূর্ণ অন্য দেশে রপ্তানি এবং নিজের দেশের প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করা হয়।
ইফতেখার খান তার কারখানায় পোশাক তৈরির জন্য চীন থেকে সুতা আমদানি করেন। আবার এই সুতা দ্বারা তৈরি পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেন। এভাবে এক দেশের সাথে অন্য দেশের পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জড়িত দেশগুলো নিজেদের পক্ষে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে। এ প্রেক্ষিতেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য যেসব নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো–
পরিবেশগত বৈষম্য: পৃথিবী বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত। কোথাও নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য, কোথাও বর্ষাবিধৌত মৌসুমি আবার কোথাও শুষ্ক অঞ্চল, কোথাও উষ্ণ কিংবা নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ, কোথাও হিমশীতল তুষারশুভ্র ভূপ্রকৃতি অর্থাৎ দেশ-দেশান্তরে পরিবেশের বৈষম্য লক্ষ করা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের এ বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করেই আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব হয়।
জনসংখ্যাগত বৈষম্য: যেসব দেশে লোকবসতি পাতলা এবং স্থানীয় চাহিদা কম সেখান থেকে উদ্বৃত্ত কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। আবার জনসংখ্যার চাপ অধিক এবং এর ফলে চাহিদাও বেশি, অথচ কিছু দেশে নিজ উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে এদের পক্ষে চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। ফলে তারা আমদানি করে।
সামাজিক অবস্থানগত বৈষম্য: উন্নত জীবনযাত্রার মান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিফলিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু আয় অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা অধিক থাকায় স্বাভাবিকভাবেই তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক।
পরিবহন ব্যবস্থাগত বৈষম্য: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এটি স্থানগত এবং কালগত অসুবিধা দূর করে। বর্তমান বিশ্বে পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। যে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা যত উন্নত সে দেশের বাণিজ্য তত বেশি প্রসার লাভ করে। যেমন– জাপান সমুদ্র পথে অবাধে বাণিজ্য করার সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।
সরকারি নীতিগত বৈষম্য: কোনো দেশের বাণিজ্যিক গতি-প্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে দেশের সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দেশের শিল্প রক্ষার প্রয়োজনে সরকার সংরক্ষণ শুল্ক প্রবর্তন করে আমদানি নিষিদ্ধ করতে পারে। সরকারি মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বহিঃবাণিজ্যের উন্নতি বা অবনতি ঘটে থাকে।
উপরের আলোচিত নিয়ামকসমূহের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৪ রহমত একজন ব্যবসায়ী। সে প্রতি বছর রমজানের আগে সৌদি আরব থেকে খেজুর আমদানি করে। রমজান মাসে খেজুরের প্রচুর চাহিদা থাকে। তাই রহমত লাভবান হয়।

◀ শিখনফল: ১ [অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য; অনু-১]

ক. বাণিজ্য কী? ১
খ. বাণিজ্য কত প্রকার ও কী কী? ২
গ. রহমতের সৌদি থেকে খেজুর আমদানি কোন বাণিজ্যের শ্রেণিভুক্ত এবং কেন? ৩
ঘ. বাণিজ্য কীভাবে অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে আলোচনা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে।

খ পণ্যদ্রব্য ও পরিসেবামূলক ক্রয়-বিক্রয় এবং আদান-প্রদানকে বাণিজ্য বলে।
বাণিজ্য প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে যথা: i. অভ্যন্তরীণ ও ii. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

গ মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে মানুষের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। ফলে চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষকে অন্যদেশ থেকে খাদ্যসহ অন্যান্য সামগ্রী আমদানি এবং উৎপাদিত পণ্যের উদ্বৃত্ত অংশ রপ্তানি করতে হচ্ছে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমত রমজান মাসে সৌদি আরব থেকে খেজুর আমদানি করে। কারণ রমজান মাসে খেজুরের চাহিদা বেশি থাকে। রহমতের খেজুর আমদানি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শ্রেণিভুক্ত।
কেননা যখন এক দেশের সাথে অন্য দেশের পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান বা ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নামে পরিচিত। রহমত যেহেতু সৌদি থেকে খেজুর বাংলাদেশে নিয়ে আসে বলে তাকে আমদানিমূলক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নামেও অভিহিত করা যায়।

ঘ উন্নত জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। কোনো দেশ বা অঞ্চলের পক্ষে তার প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব না। তাই অন্যদেশ থেকে উদ্বৃত্ত পণ্য আমাদানি করে চাহিদা মেটানো হয়। এই চাহিদা মেটানোর দরুণ বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়।
শুধু এই চাহিদা মেটানোই বাণিজ্যের মূল কারণ নয়। বাণিজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো অর্থনৈতিক। বাণিজ্য অর্থনীতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করে। কারণ অনেক দেশেরই অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত পণ্য থেকে যায়। যেসব দেশে এসব উদ্বৃত্ত পণ্যের চাহিদা রয়েছে তা উক্ত দেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। আর বৈদেশিক মুদ্রা যে কোনো দেশের অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।
উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখছে। আবার বাংলাদেশ বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল অন্য দেশ থেকে আমদানি করছে। ফলে ঐসব দেশও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে।
সুতরাং বলা যায়, অর্থনীতির সাথে বাণিজ্যের সম্পর্ক নিবিড়।

প্রশ্ন ▶৫ ঘটনা-১ : উত্তরবঙ্গের সাইফুল তার জমির উৎপাদিত শাক-সবজি ট্রাকযোগে ঢাকার কাওরান বাজারে নিয়ে আসেন। এখান থেকে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীরা সেগুলো দেশের অন্যত্র নিয়ে যান।

ঘটনা-২ : বাংলাদেশের একটি কোম্পানি জাপানের একটি কোম্পানির সাথে বাণিজ্য করে থাকে। এর ফলে উভয় দেশের মধ্যে পণ্য আনা নেওয়া করা হয়। বছর শেষে দেখা যায়, জাপানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে।

◀ শিখনফল-১ ও ৬

ক. বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য কোন নিয়মনীতি দ্বারা পরিচালিত? ১

খ. বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো? ২

গ. ঘটনা-১ এর বাণিজ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এর ঘাটতির কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সরকারি নিয়মনীতি দ্বারা পরিচালিত।

খ বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্য। এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হয়।

পণ্যদ্রব্যের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে তা আর্থসামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখে। যেমন– জাপানের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণে দেশটি আমাদের পরিবেশ উন্নয়নেও (জাপানি সংস্থা JICA-র নগর পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম) সহায়তা করছে। সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়নের ভিতকে শক্তিশালী করতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূমিকা অপরিসীম।

গ ঘটনা-১ দ্বারা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বোঝানো হয়েছে।

কোনো দেশের অভ্যন্তরে পণ্য বিক্রির জন্য এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে উৎপাদক থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে এবং তাদের কাছ থেকে খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ভোক্তার কাছে বিক্রি পর্যন্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

সাইফুল তার উৎপাদিত শাকসবজি উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকায় নিয়ে আসে। ঢাকা থেকে এসব পণ্য পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে এবং তাদের কাছ থেকে খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হয়। এভাবে সাইফুলের উৎপাদিত পণ্য এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে আদান প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

ঘ ঘটনা-২ এ বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

বিশ্বের যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্য এবং সেই সঙ্গে উন্নয়ন নির্ভর করে। উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা বা অসম বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের একটি কোম্পানি জাপানের একটি কোম্পানির সাথে বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয়। কারণ বাংলাদেশ অনুন্নত এবং জাপান একটি উন্নত দেশ। জাপানে প্রচুর সম্পদ এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্য অধিক থাকায় দেশটি বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বাংলাদেশে রপ্তানি করে থাকে। পক্ষান্তরে এসব রপ্তানিকৃত দ্রব্য বাংলাদেশ আমদানি করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ অনুন্নত দেশ হওয়ায় ঐ দেশে সে পরিমাণ উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করতে পারে না। ফলে বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে সম্পদের প্রাপ্যতা ও অর্থনৈতিক কারণে বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করে।

প্রশ্ন ▶৬ জনাব তানভীর আহমেদ একজন ব্যবসায়ী। তিনি তৈরি পোশাক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক। তিনি তার গার্মেন্টসের জন্য ভারত ও চীন থেকে সুতা ও তুলা আমদানি করেন। তিনি তার গার্মেন্টসের তৈরি পোশাক ইউরোপ ও আমেরিকায় বিক্রি করেন। তিনি মাসে দুবার তুলা ও সুতা আমদানি করেন এবং মাসে দুবার তৈরি পোশাক বিক্রি করেন। এতে তার ভালো লাভ থাকে।

◀ শিখনফল: ৩

ক. অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য কী? ১

খ. রপ্তানি বাণিজ্যের দুটি সুবিধা লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব তানভীর আহমেদের কার্যক্রমকে বাণিজ্য বলা যায় কি? নিরূপণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব তানভীর আহমেদের কার্যক্রমের আলোকে বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি তুলনামূলকভাবে প্রচলিত পণ্যদ্রব্যের চেয়ে কম তাই অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য। যেমন– ব্যাঙের পাঁ।

খ একটি দেশ তার অধিক উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মাধ্যমে নিজ দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদা অর্জন করে তখন তাকে রপ্তানি বাণিজ্য বলে। দুটি সুবিধা হলো–

১. রপ্তানি পণ্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার লাভ এবং

২. সেবাখাতে আধাদক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ লাভ।

গ উদ্দীপকে জনাব তানভীর আহমেদের কার্যক্রমকে বাণিজ্য বলা যায়। কারণ, তিনি পোশাক তৈরির জন্য অন্য দেশ থেকে তুলা ও সুতা আমদানি করেন এবং তৈরি পোশাক বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেন।

বাণিজ্য মূলত ব্যবসায়ের একটি অংশ। পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের মাধ্যমেই বাণিজ্য সংঘটিত হয়। বাণিজ্য পণ্য ও সেবার বিনিময় প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। বাণিজ্যের মূলকথাই হচ্ছে অর্থ উপার্জন করা, যার মাধ্যমে পণ্যের আদান-প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বাণিজ্যের জন্যই পণ্যের কেনাবেচা হয়ে থাকে। বাণিজ্য সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উপযোগিতা তৈরি করে। বাণিজ্য প্রকৃতির প্রধান শর্তই হলো নিয়মিত লেনদেন। তাই বলা যায়, তানভীর আহমেদের কার্যক্রম বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে জনাব তানভীর আহমেদের কার্যক্রমটি বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যে লক্ষ করা যায়। সেগুলো হলো–

i. বাণিজ্য বলতে পণ্যের আদান-প্রদানই বোঝায়। বাণিজ্য মূলত ব্যবসায়েরই একটি অংশ।

ii. বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা যায়। কারণ, অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পণ্যের আদান-প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
iii. বাণিজ্য ঐ ধরনের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে, যার মাধ্যমে তার লাভ হবে।
iv. বাণিজ্য পণ্য ও সেবার বিনিময় প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ পণ্য ও সেবার বিনিময় বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।
v. বাণিজ্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো লাভ করার মনোভাব। কারণ, বাণিজ্যের মূলকথাই হলো লাভ করা।
vi. বাণিজ্যের উপযোগীতা সৃষ্টি হয়।
vii. বাণিজ্য সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উপযোগিতা তৈরি করে।
viii. বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যই হলো নিয়মিত লেনদেন। বিচ্ছিন্ন কোনো লেনদেন বাণিজ্যের অংশ হতে পারে না।

সুতরাং বলা যায় যে, বাণিজ্য বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত রূপ।

প্রশ্ন ▶ ৭ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সাল	পণ্য আমদানি ব্যয়	পণ্য রপ্তানি আয়
২০১৩-১৪	৪০৭৩২	৩০১৭৭
২০১৪-১৫	৪০৭০৪	৩১২০৯
২০১৫-১৬	৪২৯২১	৩৪২৫৭

◀ শিখনফল: ২

ক. রপ্তানি বাণিজ্যে পোশাক শিল্পের অবদান কত শতাংশ? ১
খ. বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি বা ধরন ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উপরের ছকে কোন বছর রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্যের ভারসাম্য সবচেয়ে কম? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উপর্যুক্ত ছকে বর্ণিত পণ্যসমূহের বিবরণ দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রপ্তানি বাণিজ্যে পোশাক শিল্পের অবদান ৮২ শতাংশ।

খ বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি বা ধরন মূলত আমদানিনির্ভর। আমাদের জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

আমদানি-রপ্তানি ভারসাম্য বিচারে বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতির দেশ। এ ঘাটতির পরিমাণ কোনো বছর কম থাকে, আবার কোনো বছর বৃদ্ধি পায়। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও শিল্পের কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রধান। অপরদিকে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে তৈরি পোশাক, মৎস্য, কৃষিজাত দ্রব্য প্রধান।

গ উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ২০১৫-১৬ সালে রপ্তানি আয় ছিল ৩৪,২৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানি ব্যয় ছিল ৪২,৯২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ বছর আমদানি ও রপ্তানির ব্যবধান ছিল ৮৬৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২০১৩-১৪ সালে রপ্তানি আয় ছিল ৩০,১৭৭ এবং আমদানি ব্যয় ৪০,৭৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয়ের ব্যবধান ১০,৫৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আবার ২০১৪-১৫ সালে রপ্তানি আয় ছিল ৩১২০৯ এবং আমদানি ব্যয় ছিল ৪০৭০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানি ও রপ্তানি ব্যয়ের ব্যবধান ৯৪৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৬-১৬ সালে আমদানি ও রপ্তানির ব্যবধান থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি ব্যবধান ২০১৩-১৪ সালে। যার পরিমাণ ১০,৫৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানি ও রপ্তানি আয়ের এত বিশাল ব্যবধান থেকে বোঝা যায় যে, ২০১৩-১৪ সালে বাণিজ্য ভারসাম্য কম ছিল।

ঘ উল্লিখিত ছক দ্বারা বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কলকারখানার যন্ত্রপাতি, লৌহ ইস্পাত, পেট্রোল, সিমেন্ট, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানি করে। অন্যান্য আমদানি দ্রব্যের মধ্যে চাল, গম, ভোজ্যতেল, বিভিন্ন প্রকার তেলবীজ, চিনি, সার, ডিজেল, তুলা, সুতা ও সুতিবস্ত্র, পশমবস্ত্র, সিল্কের কাপড়, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, স্লিপার, কৃষি যন্ত্রপাতি, সিগারেট, শিশুখাদ্য, কাচের দ্রব্য, টায়ার ড্রাইসেল ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক বাল্ব, মোটরগাড়ি, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, গ্রামোফোন, খুচরা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে–

প্রাথমিক পণ্য: প্রাথমিক পণ্যসমূহ হলো হিমায়িত খাদ্য, চা, কৃষিজাত পণ্য, কাঁচামাল ও অন্যান্য।

শিল্পজাত পণ্য: শিল্পজাত পণ্যসমূহ হলো তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার চামড়া, পাটজাত পণ্য, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য, পাদুকা, সিরামিক দ্রব্য, প্রকৌশল সামগ্রী, পেট্রোলিয়াম উপজাত, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য ও অন্যান্য।

পরিশেষে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বহুবিধ রপ্তানি পণ্য থাকলেও এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সর্বদাই প্রতিকূল। যদিও তা অগ্রগতির ধারা বজায় রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ **ঘটনা-১:** নাজমুল সাহেবের খুলনায় কয়েকটি চিংড়ি মাছের ঘের রয়েছে। এসব মাছের বিদেশে প্রচুর চাহিদা থাকায় তিনি এগুলো বিদেশে রপ্তানি করেন। *◀ শিখনফল: ৩*

ঘটনা-২: নাজমুল সাহেবের খুলনা শহরে দুটি তেলের পাম্পও রয়েছে। এই পাম্পের তেল তাকে সৌদি আরব থেকে নিয়ে আসতে হয়।

ক. হাট কাকে বলে? ১
খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঘটনা-১ এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ঘটনা-২ এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সপ্তাহে দুই বা তিন দিন যে অস্থায়ী ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র দেখা যায়, তাকে হাট বলে।

খ মানুষ বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে। এক দেশের সাথে অন্য দেশের দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদির বিনিময়কেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়।

সাধারণত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে কোনো দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য চাহিদাপূর্ণ অন্য দেশে রপ্তানি এবং নিজের দেশের চাহিদা সম্পন্ন পণ্য আমদানি করা হয়।

গ উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ নাজমুল সাহেব বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি মাছ বিদেশে পাঠান। এর ফলে রপ্তানি বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রপ্তানি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

স্বল্প সংখ্যক রপ্তানি দ্রব্য: বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে স্বল্পসংখ্যক দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশের রপ্তানিজাত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, পাট, চা, চামড়া ইত্যাদি।

অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য: বাংলাদেশে বর্তমানে অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি পণ্যগুলো শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। যেমন: তৈরি পোশাক, চিংড়ি, ফুল, হিমায়িত খাদ্য ইত্যাদি।

কৃষিভিত্তিক রপ্তানি পণ্যের অভাব: কৃষিজাত রপ্তানি পণ্য এখন আগের অবস্থায় নেই। পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে। তবে চিনি, চা ইত্যাদির বাজার বেশ সংকুচিত।

সমুদ্র পথে রপ্তানি: বাংলাদেশ তার রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় পুরোটাই সমুদ্রপথে সম্পন্ন করে থাকে। চট্টগ্রাম ও মংলার পর পায়রা সমুদ্র বন্দরের কাজ পুরোদমে শুরু হলে তা আরও বৃদ্ধি পাবে।

বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণ: ব্যাক, বীমা, বিদেশি জাহাজ ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সুনির্দিষ্ট কিছু দেশের সাথে বাণিজ্য: বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কিছু দেশ, যেমন- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত প্রভৃতির সাথে সংঘটিত হয়।

সরকারি নিয়ন্ত্রণ: দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদার বাণিজ্য নীতি বেশ কিছু ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্যকে সংকুচিত করে থাকে। যেমন: পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে।

ওয়েজ আর্নার্স স্কিম: ওয়েজ আর্নার্স স্কিমের আওতায় বাংলাদেশে শিল্প বিনিয়োগে প্রবাসীদের অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে। ফলে রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন ও বাণিজ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানি বাণিজ্যে যথেষ্ট প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও ঋণাত্মক অবস্থানে রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ঘটনা-২ এ নাজমুল সাহেব দেশে তেল আমদানি করে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পন্ন করে থাকেন।

বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে আমদানি বাণিজ্যের বিকল্প নেই।

নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমদানি বাণিজ্যের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো—

আমদানি দ্রব্যের আধিক্য: বাংলাদেশে রপ্তানি দ্রব্যের তুলনায় আমদানি দ্রব্যের পরিমাণ অনেক বেশি। কারণ বাংলাদেশ এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। অধিক জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে পণ্য আমদানি করা হয়।

বিলাস দ্রব্যের আমদানি হ্রাস: দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধে কিছু বিদেশি বিলাস দ্রব্যে আমদানি নিষিদ্ধ, আবার কিছু আমদানি হ্রাস করা হয়েছে। এর মধ্যে মোটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি আমদানি: বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরি ও আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি আমদানি করে শিল্প কলকারখানার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি: বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রচুর শিল্পের যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং শিল্পের কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা এ সকল যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করতে পারে।

সুনির্দিষ্ট কিছু দেশের সাথে বাণিজ্য: বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্য ভারত, চীন প্রভৃতি অল্প কয়েকটি দেশের সাথে সংঘটিত হয়।

শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি: বাংলাদেশ শিল্পের কাঁচামালের পাশাপাশি শিল্পজাত পণ্য ও আমদানি করে। শিল্পে উন্নত নয় বিধায় বহুবিধ শিল্পদ্রব্য এদেশের আমদানি পণ্য। যেমন-মোটর গাড়ি, ইলেকট্রনিকস ইত্যাদি।

সমুদ্র পথে আমদানি: বাংলাদেশ খাদ্যশস্য, ভারি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানি পণ্য পরিবহনে সমুদ্রপথ ব্যবহার করে। সিংহভাগ আমদানি বাণিজ্য সমুদ্রপথেই সংঘটিত হয়।

খাদ্য ঘাটতি পূরণ: বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্যের ঘাটতি হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশের আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে খাদ্য আমদানি করে খাদ্যঘাটতি পূরণ করা হলে দেশীয় মুদ্রার ওপর চাপ কম পড়বে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমদানি বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৯ দুই ব্যবসায়ী নোমান ও সিফাত। নোমান বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে আর সিফাত দেশ থেকে বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে। তবে দুইজনের বাণিজ্যই দেশের অর্থনীতিতে সমান গুরুত্বপূর্ণ। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. কত সালে OPEC গঠিত হয়? ১

খ. বাণিজ্যের প্রয়োজন হয় কখন? ২

গ. নোমান ও সিফাতের বাণিজ্যের গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নোমানের ব্যবসায় উন্নতির ক্ষেত্রে কোনটির ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত— বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬০ সালে সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, কুয়েত ও ভেনেজুয়েলাকে নিয়ে OPEC গঠিত হয়।

খ মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে।

আমাদের ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রী একই স্থানে উৎপাদন বা তৈরি হয় না যার ফলে পণ্যগুলো বণ্টনের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর তখনই বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়।

গ নোমান ও সিফাত বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত, যার গুরুত্ব বর্তমান বিশ্বে অপরিসীম।

নোমান বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি এবং সিফাত দেশ থেকে পণ্য রপ্তানি করে। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করে।

নিম্নে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো—

পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়: দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বাংলাদেশে বেশ কিছু উদ্বৃত্ত কৃষিজ ও শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে। এ থেকে দেশটি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। এ অর্থ দ্বারা প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য আমদানি করে থাকে।

কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি আমদানি: বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরি ও আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি আমদানি করে শিল্প কলকারখানার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি: বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য শিল্পের যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা এ সকল যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করতে পারে।

বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস: বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। একমাত্র পণ্যদ্রব্য রপ্তানি বৃদ্ধি করে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। তাহলে বাংলাদেশের বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে।

দেশীয় পণ্যদ্রব্যের বাজার প্রসার: বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের চাহিদাপূর্ণ বাজার সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে দেশের পণ্যদ্রব্য বিশ্ববাণিজ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করবে।

খাদ্য ঘাটতি পূরণ: বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্যের ঘাটতি হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে খাদ্য আমদানি করে খাদ্যঘাটতি পূরণ করা হলে দেশীয় মুদ্রার ওপর চাপ কম পড়বে।

বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল বৃদ্ধি: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল বৃদ্ধি করা সম্ভব।

শ্রমশক্তির গতিশীলতার প্রসার: বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে শ্রমশক্তির গতিশীলতা বৃদ্ধি করে, জনশক্তি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

ঘ নোমানকে পণ্য আমদানির পরিমাণ হ্রাস করে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

সময়ের সাথে সাথে শিল্পের প্রসার ঘটায় কৃষি পণ্যের পাশাপাশি শিল্পদ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি নিটওয়্যার, প্লাস্টিক সামগ্রী, জুতা, সিরামিক সামগ্রী এমনকি ওষুধও রপ্তানি করা হয়। এসবই রপ্তানিযোগ্য। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। হিমায়িত মাছ, শুঁটকি, পোশাক শিল্প, চামড়াজাত পণ্য, হস্তশিল্প ইত্যাদি রপ্তানিযোগ্য পণ্য থেকে প্রতিবছর রপ্তানি শুল্ক আদায়ের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়। এছাড়া রপ্তানি দ্রব্যের অধিকাংশেরই কাঁচামাল কৃষি থেকে আসে। তাই রপ্তানি পণ্যগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ প্রতিবছর খাদ্য ঘাটতি ও পণ্য ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে প্রচুর পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে। রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে দেশের অর্থ দেশেই থাকবে এবং খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করা যাবে। রপ্তানিজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন দেশে রপ্তানির লক্ষ্যে সরকার অবাধ বাণিজ্য নীতির সুফল পাবে। অবাধ বাণিজ্য নীতির কারণে উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা সম্ভব। ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশ রপ্তানি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে পূর্বের তুলনায় অধিক বৈদেশিক মুদ্রার্জন করছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদনে বৃদ্ধি পেলে এর ব্যাপক বহুমুখীকরণ সম্ভব এবং উক্ত পণ্যগুলোর বহুমুখীকরণই দেশটির অর্থনীতি চাঙ্গা করবে।

সুতরাং, নোমানেরও ব্যবসায়ের উন্নতিতে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১০ হাসান কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে এসে একটি তৈরি পোশাক কারখানায় যোগদান করে এবং ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে হাসানের ভাই আহসান গ্রামে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন করে এবং অবসর সময়ে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করে সেও আস্তে আস্তে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। *◀ শিখনফল: ৫*

ক. বাণিজ্য কী? ১

খ. বাণিজ্য কত প্রকার ও কী কী? ২

গ. হাসানের তৈরি পণ্যটি বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে হাসান এবং আহসানের তৈরি পণ্যগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

খ বৃহৎ পরিসরে বিভিন্ন দেশ পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় এবং আদান প্রদান করে বাণিজ্যে সংঘটিত করে।

বাণিজ্য প্রধানত দুই প্রকার। যথা: ১. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। ২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

গ হাসানের তৈরি পণ্যটি হলো তৈরি পোশাক।

বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে শিল্প প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করায় দেশে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এখানে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হচ্ছে। যেমন– এ দেশের পোশাক শিল্পের অনুকূল জলবায়ু, সস্তা ও প্রচুর শ্রমিক, উন্নত কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য প্রভৃতি কারণ বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করেছে।

জলবায়ু: বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু কারখানায় শ্রমিকদের অধিক সময় কাজ করার বিশেষ উপযোগী। এজন্য এদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

কাঁচামাল: পোশাক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল বস্ত্র। দেশীয় উন্নতমানের বস্ত্র ব্যবহার করে এদেশে বেশ কিছু তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে।

শক্তি সম্পদ: বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো শহর কেন্দ্রিক গড়ে ওঠায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে অসুবিধা হয় না। তাই ঢাকা শহরের আশপাশে তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে ওঠছে।

মূলধন: শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধন অন্যতম পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি পোশাক শিল্পের অর্থ যোগান দেয়। এ কারণে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যাপক বিস্তার হয়েছে।

শ্রমিক: বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়ায় এখানে সুলভে শ্রমিক পাওয়া যায় এবং স্বল্প মজুরিতে কাজ করানো যায়।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উল্লিখিত নিয়ামকগুলোর কারণেই হাসানের তৈরি পণ্যটি তথা পোশাক শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ছে।

ঘ উদ্দীপক অনুসারে হাসানের তৈরি পণ্যটি তৈরি পোশাক এবং আহসানের তৈরি পণ্যগুলো হলো কৃষিজাত পণ্য এবং হস্তশিল্পজাত দ্রব্য। হাসান এবং আহসানের উভয়ের তৈরি পণ্যগুলোই বাংলাদেশে রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বিশ্বের অপরাপর উন্নয়নশীল দেশের মতো এদেশকেও উন্নতির ধাপগুলো অতিক্রম করতে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। তাই রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব অত্যধিক।

সময়ের সাথে সাথে শিল্পের প্রসার ঘটায় কৃষি পণ্যের পাশাপাশি শিল্পদ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি নিটওয়্যার, প্লাস্টিক সামগ্রী, জুতা, সিরামিক সামগ্রী এমনকি ওষুধও রপ্তানি করা হয়। এসবই রপ্তানিযোগ্য। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। হিমায়িত মাছ, শুঁটকি, পোশাক শিল্প, চামড়াজাত পণ্য, হস্তশিল্প ইত্যাদি রপ্তানিযোগ্য পণ্য থেকে প্রতিবছর রপ্তানি শুল্ক আদায়ের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়। এছাড়া রপ্তানি দ্রব্যের অধিকাংশেরই কাঁচামাল কৃষি থেকে আসে। তাই রপ্তানি পণ্যগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ প্রতিবছর খাদ্য ঘাটতি ও পণ্য ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে প্রচুর পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে। রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে দেশের অর্থ দেশেই থাকবে এবং খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করা যাবে। রপ্তানিজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন দেশে রপ্তানির লক্ষ্যে সরকার অবাধ বাণিজ্য নীতির সুফল পাবে। অবাধ বাণিজ্য নীতির কারণে উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা সম্ভব। ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশ রপ্তানি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে পূর্বের তুলনায় অধিক বৈদেশিক মুদ্রার্জন করছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদনে বৃদ্ধি পেলে এর ব্যাপক বহুমুখীকরণ সম্ভব এবং উক্ত পণ্যগুলোর বহুমুখীকরণই দেশটির অর্থনীতি চাঙ্গা করবে।

প্রশ্ন ▶ ১১ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে উৎপাদিত একটি দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। তখন ঐ দ্রব্যটিই ছিল সর্বোচ্চ রপ্তানিকারী পণ্য। পরবর্তীকালে বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনে উক্ত দ্রব্যের জায়গায় বিভিন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এভাবেই এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি।

◀ শিখনফল: ৫ ও ৬

ক. WTO-এর প্রতিষ্ঠাকাল কত সালে? ১

খ. বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বর্তমানে অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধির পেছনের কারণগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক WTO-এর প্রতিষ্ঠাকাল হলো ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি।

খ বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি বা ধরন মূলত আমদানিনির্ভর। আমাদের জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

আমদানি-রপ্তানি ভারসাম্য বিচারে বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতির দেশ। এ ঘাটতির পরিমাণ কোনো বছর কম থাকে, আবার কোনো বছর বৃদ্ধি পায়। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও শিল্পের কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রধান। অপরদিকে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে তৈরি পোশাক, মৎস্য, কৃষিজাত দ্রব্য প্রধান।

গ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বর্তমানে অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ প্রচলিত পণ্যসমূহই রপ্তানি করত। পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে দেশ এগিয়ে যেতে থাকে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিম্নে অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করা হলো:

প্রচলিত পণ্যের উৎপাদন হ্রাস: ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বংলাদেশ থেকে প্রচলিত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ বেশি ছিল। বিভিন্ন কারণে দেশের প্রচলিত পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপ্রচলিত পণ্যের শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি: বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে নানা ধরনের অপ্রচলিত পণ্য যেমন- ওভেন গার্মেন্টস, নিটওয়্যার, তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়া ইত্যাদির প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি: বিশ্ববাজারে অপ্রচলিত পণ্যের চাহিদা থাকায় দেশে এসব পণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায় এবং রপ্তানির পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে প্রচলিত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ছিল

৪৪৭.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিন্তু অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৭১.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আবার ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রচলিত পণ্যের রপ্তানির শতকরা হার ৩% এবং অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি মূল্যের শতকরা হার ৯৭%।
সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ অনেক উন্নয়নশীল দেশ আছে যারা নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে খুব কম সংখ্যক পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে কিন্তু বাংলাদেশ দিন দিন রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে।
উদ্দীপকের আলোকে বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের রপ্তানির পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিদেশে হিমায়িত খাদ্যের চাহিদা বেশি থাকায় এসব দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এসব পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলে বিদেশে এগুলোর রপ্তানি যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলে কৃষিতে বাংলাদেশ যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, তেমনি বিদেশেও প্রচুর কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করা যাবে।
বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিযোগ্য শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, পাদুকা, হোম টেক্সটাইল, চামড়া, ওভেন গার্মেন্টস, পেট্রোলিয়াম, রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
এসব পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলে দেশে শিল্পের প্রসার ঘটবে, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ ঘটনা-১: জনাব বদরুল একজন কৃষক। বিদেশে প্রচুর চাহিদা থাকায় তার উৎপাদিত চা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়।
ঘটনা-২: জনাব কামরুল সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি বিদেশ থেকে চাল আমদানি করেন। ◀ *শিখনফল: ৭*

ক. সিল্ক রোড কী? ১
খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটনে অর্থনৈতিক নিয়ামকের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব বদরুল ও কামরুল সাহেবের আমদানি-রপ্তানির সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত বাণিজ্যের ফলে কী কী অসুবিধা হতে পারে-বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মধ্য এশিয়া থেকে উপমহাদেশ হয়ে চীন পর্যন্ত বাণিজ্য বিস্তৃতির জন্য যে রোড গড়ে উঠেছিল তাই সিল্ক রোড নামে পরিচিত।

খ অর্থনৈতিক কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটন লক্ষণীয়।
বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণ বিশেষ করে উৎপাদন ব্যয়, মুদ্রা বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি, সরকারি নীতি, জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈষম্য প্রভৃতি নিয়ামকের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

গ জনাব বদরুল ও কামরুল সাহেব যথাক্রমে চা রপ্তানি ও চাল আমদানি করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে এ ধরনের পণ্য আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরি হয়। এ সম্পর্কের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশ বিভিন্ন সুবিধা পায়। যেমন—
মোট উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি: বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ফলে দেশের মোট উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: বাণিজ্যের দ্বারা বৈদেশিক বাজারের সুযোগ গ্রহণ করা যায় বলে দেশের রপ্তানি দ্রব্যের বাজারের বিস্তৃতি ঘটে। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক বাজারে বিপুল পরিমাণ পণ্য দ্রব্য রপ্তানি করা সম্ভব হয়।
অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের সুবিধা: কোনো দেশই তার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না। বাংলাদেশ যেসব দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না সেগুলো আমদানি করে থাকে।
উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং কম দামে ক্রয় বিক্রয়: বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশ বাণিজ্যের দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের সুবিধা লাভ করতে পারে। এতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং কম দামে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভব হয়।
অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি: বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা: প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর খাদ্যশস্য নষ্ট হলে এবং খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের ঘাটতি দেখা দিলে বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্যে খাদ্যশস্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করা হয় এবং দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতি হতে দেশকে রক্ষা করা হয়।
সম্পদের বণ্টন ও বিনিয়োগ: বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত হয়। বাংলাদেশও এ সুবিধা ভোগ করে।
উৎপাদনকারীর দক্ষতা: বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে বাংলাদেশের উৎপাদনকারীদের দক্ষতা বাড়ে। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার জন্য দ্রব্যের মান উন্নয়ন ও দাম কম করা প্রয়োজন হয়।
সুতরাং বলা যায়, বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করে বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করে।

ঘ উদ্দীপকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বলতে বৈদেশিক বাণিজ্যকে বোঝানো হয়েছে।
আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যভুক্ত দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক গভীর হলেও যেসব অসুবিধা সৃষ্টি হয় সেগুলো হলো—
সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা: কোনো দেশ কৃষিজাত দ্রব্য আবার কোনো দেশ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে। ফলে কৃষি ও শিল্পের এক সাথে সুষম উন্নয়ন ঘটে না।
আত্মনির্ভরশীলতার পরিপন্থী: বাংলাদেশ বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শিতা অর্জন করলেও অনেক দ্রব্যের কাঁচামালের (যেমন— তৈরি পোশাকের জন্য সুতা) জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল

হয়ে পড়েছে। এরূপ পরনির্ভরশীলতা বিদেশি শক্তিশালী দেশগুলো বাংলাদেশের ওপর আগ্রাসন সৃষ্টি করতে পারে।

ভবিষ্যৎ স্বার্থ ক্ষুণ্ন: বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে কোনো কোনো দেশের প্রাথমিক ও বর্তমান লাভ অর্জনের স্পৃহা এত বেশি প্রবল হয় যে ঐ দেশগুলোর ভবিষ্যৎ স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে।

ক্ষতিকর দ্রব্য আমদানি: বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগে ব্যবসায়ীগণ বেশি মুনাফা অর্জনের আশায় ক্ষতিকর (যেমন— ইয়াবা, হেরোইন) ও বিলাস দ্রব্য আমদানি করে। এগুলোর বেশির ভাগই জনগণের আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি করছে।

দেশীয় শিল্প প্রসারের পরিপন্থী: বিদেশ হতে আমদানিকৃত দ্রব্য কম দামে পাওয়া গেলে জনগণ দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করতে চায় না। ফলে দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

উন্নত দেশের অবাধ শোষণের সুযোগ: বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে উন্নত দেশের সাথে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের অসম প্রতিযোগিতার ফলে অনুন্নত দেশগুলো বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দ্বন্দ্ব ও সংঘাত: বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে কাঁচামাল আমদানি ও শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির উদ্দেশে নতুন নতুন বাজার খুঁজতে গিয়ে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারে। ফলে যে কোনো সময় বাণিজ্যভুক্ত দেশের সাথে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

ডাম্পিং: বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে এক দেশ অন্য দেশের শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য কম দামে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য রপ্তানি করতে পারে। এতে দ্বিতীয় দেশটির শিল্প বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে অনেক অসুবিধা ভোগ করছে। তবে সুষ্ঠু বাণিজ্য কৌশল অবলম্বন করে এসব অসুবিধা কাটিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য সচল রাখতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ নজরুল ইসলাম জনসংখ্যা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা। তিনি জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে দেখতে পেলেন উন্নয়নশীল একটি দেশ থেকে বিভিন্ন আমদানিকারক দেশ প্রচুর জনশক্তি আমদানি করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে এবং এর ফলে উক্ত দেশের অর্থনীতি সচল থাকছে। ◀ *শিখনফল: ৮*

ক. OPEC কী? ১

খ. বাংলাদেশের আমদানি পণ্যগুলোর নাম লেখো। ২

গ. জনসংখ্যা রপ্তানির ফলে উন্নয়নশীল দেশটির অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব পড়ছে ব্যাখ্যা করো? ৩

ঘ. উক্ত দেশ হতে আমদানিকারক দেশগুলোর জনসংখ্যা আমদানির কারণ বিশ্লেষণ করো? ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক OPEC হলো পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশসমূহের সংগঠন।

খ বাংলাদেশ আমদানিনির্ভর রাষ্ট্র। এদেশের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে শিল্পের যন্ত্রাংশ ও কৃষিজাত দ্রব্যই প্রধান।

বাংলাদেশের শিল্পজাত আমদানি পণ্যগুলো হলো- ভোজ্যতেল, পেট্রোলিয়াম, সার, ক্লিংকার, ফাইবার, সুতা ইত্যাদি। এ দেশের কৃষিজাত আমদানি পণ্যগুলো হলো- চাল, গম, তেলবীজ, কাঁচা তুলা ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে আলোচিত উন্নয়নশীল দেশটি হলো বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ জনবহুল একটি দেশ, এই দেশের রপ্তানি আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলো জনশক্তি রপ্তানি। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য সামগ্রীর আমদানি-রপ্তানির মতো জনশক্তিও আমদানি-রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য দেশে জনশক্তি রপ্তানি করছে। যেমন— সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক সংখ্যক দক্ষ, আধাদক্ষ এবং অদক্ষ জনশক্তি কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমন করছে। জনশক্তি রপ্তানি বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এই জনশক্তি রপ্তানি হয়। এর দ্বারা বেকার সমস্যা লাঘব হওয়ার সাথে সাথে বিনিয়োগও বাড়ছে। ফলে কমসংস্থান হচ্ছে। অর্থনীতি হচ্ছে উন্নত।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জনশক্তি রপ্তানি থেকে আয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত দেশটি হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন আমদানিকারক দেশ জনশক্তি আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আগ্রহের কারণ হচ্ছে বাঙালিদের শ্রম, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা। এছাড়া আরও কিছু কারণ রয়েছে। যেমন—

জাতীয় আয় বৃদ্ধি: বাংলাদেশি শ্রমিক নিষ্ঠার সাথে কাজ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাই অধিক উৎপাদনের ফলে আমদানিকারক দেশ অতিরিক্ত পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এবং তা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

শিল্পোন্নয়ন: শিল্পের উন্নতির ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই শিল্পোন্নয়নের জন্য অধিক শ্রমের প্রয়োজন। আমদানিকারক দেশগুলোর শিল্পোন্নয়নে যে সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন তা না থাকায় বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানি করে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন: মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে প্রচুর জনশক্তি আমদানি করে থাকে। এতে ঐ সব দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে যোগ হয়। যে দেশ যত বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম সে দেশ শিল্পায়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বিদেশি পণ্যের আমদানি বন্ধ: আমদানিকারক দেশগুলো উৎপাদন বৃদ্ধি করে অধিক রপ্তানির চেষ্টা করে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর এসব দেশ জনশক্তি আমদানি করে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশি জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঐসব দেশ নিজ দেশের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করছে।

দ্রব্যের মান উন্নয়ন: আমদানিকারক দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে কারণ বাংলাদেশি শ্রমিক ঐসব দেশে

গিয়ে নতুন পরিবেশে নিজেকে বাঁচিয়ে এবং টিকিয়ে রাখতে মনোযোগী হয়ে শ্রম প্রদান করে। এতে উন্নত পণ্য বিদেশে রপ্তানি সহজ ও সুবিধাজনক হয়।

সস্তায় শ্রমিক আমদানি: বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়ায় দেশের জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য স্বল্প মূল্যে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করে। আর আমদানিকারক দেশগুলো এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে সস্তায় বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে।

উল্লিখিত কারণে জনশক্তি আমদানিকারক দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ রাসেলদের এলাকার কয়েকজন লোক কর্মসংস্থানের জন্য সরকারিভাবে মালয়েশিয়া যায়। ◀ *শিখনফল: ৮*

ক. WTO কী? ১

খ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রাসেলদের এলাকার লোকজন জাতীয় অর্থনীতিতে কীরূপ ভূমিকা পালন করে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোর এরূপ লোক নেওয়ার কারণগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক WTO হলো বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন।

খ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য মূলত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্য।

কোনো দেশের অভ্যন্তরে পণ্য বিক্রির জন্য এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে উৎপাদক থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে এবং তাদের কাছ থেকে খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে অবশেষে ভোক্তার কাছে বিক্রি পর্যন্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

গ রাসেলদের এলাকার লোকজন মালয়েশিয়ায় প্রবাসী তাদের প্রেরিত অর্থ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশ জনবহুল একটি দেশ, এই দেশের রপ্তানি আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলো জনশক্তি রপ্তানি। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য সামগ্রীর আমদানি-রপ্তানির মতো জনশক্তিও আমদানি-রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য দেশে জনশক্তি রপ্তানি করছে। যেমন— সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক সংখ্যক দক্ষ, আধাদক্ষ এবং অদক্ষ জনশক্তি কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমন করছে। জনশক্তি রপ্তানি বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এই জনশক্তি রপ্তানি হয়। এর দ্বারা বেকার সমস্যা লাঘব হওয়ার সাথে সাথে বিনিয়োগও বাড়ছে। ফলে কমসংস্থান হচ্ছে। অর্থনীতি হচ্ছে উন্নত।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, রাসেলদের এলাকার জনশক্তি রপ্তানি থেকে আয় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত দেশটি হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন আমদানিকারক দেশ জনশক্তি আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আগ্রহের কারণ হচ্ছে বাঙালিদের শ্রম, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা। এছাড়া আরও কিছু কারণ রয়েছে। যেমন-

জাতীয় আয় বৃদ্ধি: বাংলাদেশি শ্রমিক নিষ্ঠার সাথে কাজ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাই অধিক উৎপাদনের ফলে আমদানিকারক দেশ অতিরিক্ত পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এবং তা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

শিল্পোন্নয়ন: শিল্পের উন্নতির ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই শিল্পোন্নয়নের জন্য অধিক শ্রমের প্রয়োজন। আমদানিকারক দেশগুলোর শিল্পোন্নয়নে যে সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন তা না থাকায় বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানি করে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন: মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে প্রচুর জনশক্তি আমদানি করে থাকে। এতে ঐ সব দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে যোগ হয়। যে দেশ যত বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম সে দেশ শিল্পায়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বিদেশি পণ্যের আমদানি বন্ধ: আমদানিকারক দেশগুলো উৎপাদন বৃদ্ধি করে অধিক রপ্তানির চেষ্টা করে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর এসব দেশ জনশক্তি আমদানি করে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশি জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঐসব দেশ নিজ দেশের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করছে।

দ্রব্যের মান উন্নয়ন: আমদানিকারক দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে কারণ বাংলাদেশি শ্রমিক ঐসব দেশে গিয়ে নতুন পরিবেশে নিজেকে বাঁচিয়ে এবং টিকিয়ে রাখতে মনোযোগী হয়ে শ্রম প্রদান করে। এতে উন্নত পণ্য বিদেশে রপ্তানি সহজ ও সুবিধাজনক হয়।

সস্তায় শ্রমিক আমদানি: বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়ায় দেশের জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য স্বল্প মূল্যে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করে। আর আমদানিকারক দেশগুলো এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে সস্তায় বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে।

উল্লিখিত কারণে জনশক্তি আমদানিকারক দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে স্বল্প দক্ষ ও আধা-দক্ষ জনশক্তি আমদানি হ্রাস পেয়েছে। সরকার জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য এসব বিষয় খতিয়ে দেখছে।

◀ *শিখনফল: ৮*

ক. EFTA সংস্থাটি কোথায় গঠিত হয়? ১

খ. বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যগুলো কী কী? ২

গ. বাংলাদেশে এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টির কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ক্ষেত্রে সরকার কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক EFTA (European Free Trade Association) সংস্থাটি ১৯৬০সালে যুক্তরাজ্যের স্টকহোমে গঠিত হয়।

খ বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য দুই ধরনের। যথা: i. প্রচলিত; এবং ii. অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য।

প্রচলিত রপ্তানি পণ্য : কাঁচাপাট, চা, পাটজাত দ্রব্য ইত্যাদি।

অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য : তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, নিটওয়্যার, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, চামড়া, ওষুধ, হস্তশিল্প, জুতা, টেক্সটাইল, ফেব্রিক্স ইত্যাদি।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী বর্তমানে অনেক দেশে (সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া) বাংলাদেশ থেকে স্বল্প ও আধাদক্ষ জনশক্তি আমদানি হ্রাস পেয়েছে।

জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে।

সম্প্রতি দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেলেও স্বল্পদক্ষ ও আধাদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার তুলনামূলক কমেছে। ২০১৬ সালে পূর্বের চেয়ে স্বল্প ও আধাদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার যথাক্রমে ১৭ ও ৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে সময়ে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৪১ শতাংশ। একই স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ৫৮ থেকে কমে ৪১ শতাংশে এবং আধাদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ২২ থেকে কমে ১৬ শতাংশে দাড়িয়েছে। এ শ্রমিকেরা কম মজুরিতে কাজ করছে। নতুন শ্রমিক রপ্তানির ক্ষেত্রেও কাঙ্ক্ষিত শ্রমিকের অভাবে বাজারে টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আমদানিকারক দেশগুলো ক্রমশ আগ্রহ হারাচ্ছে। [সূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭]

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। এ খাতটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারি, বেসরকারি ও নাগরিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

এক্ষেত্রে যেসব বিষয়গুলোতে নজর দেওয়া আবশ্যক তা হলো–

উপযুক্ত সরকারি নীতি: ১৯৮২ সালের অভিবাসী আইনের সংস্কার করে এতে শ্রমিকদের জন্য সহায়ক প্রয়োজনীয় নীতি সংযোজন ও সংস্করণ আবশ্যক। এছাড়া বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের ভূমিকার স্বীকৃতি ও অর্জিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন আবশ্যক।

মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা: দেশে এবং বিদেশে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং করার ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ ও জোরদার করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে BMET (Bureau of Manpower, Employment and Training) -এর মনিটরিং ইউনিটকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদানও জরুরি।

যোগ্য ব্যক্তিদের সার্টিফিকেট প্রদান: যেসব শ্রমিক বিভিন্ন কাজে দক্ষ, সরকারের উচিত একমাত্র তাদেরই যথাযথ সার্টিফিকেট প্রদান করা এবং বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া।

উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাবর্ধক কর্মসূচি: জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টি কেবল শ্রমিকদের নিজেদের চেষ্টা ও রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর ব্যবস্থার কাছে ছেড়ে না দিয়ে সরকারের উচিত এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। সেজন্য দেশত্যাগের পূর্বে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকে সকল শ্রমিকের জন্য বাধ্যতামূলক করা উচিত ।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার: বাংলাদেশে প্রচলিত কেরানি শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে তাকে কারিগরি ও কর্মমুখী করা আবশ্যক; সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে ট্রেড কোর্স চালু এবং উচ্চতর পর্যায়ে কারিগরি ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া জরুরি।

যেহেতু বাংলাদেশ প্রতিবছর জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে সেহেতু জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অত্যাবশ্যক।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ১৬ পোশাক শিল্পের মালিক সাইফ সাহেব। তার শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেন। অপরদিকে তার বন্ধু ফাহাদ যশোরের একজন ফুল ব্যবসায়ী। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ফুল সরবরাহ করেন। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. সুইজারল্যান্ডের রাজধানী কোথায়? ১

খ. মুক্তবাজার অর্থনীতির একটি কুফল ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সাইফ সাহেবের কারখানাটি বাংলাদেশে গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাইফ ও ফাহাদের বাণিজ্যের ধরন কি একই রকম। বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায়।

খ সারা বিশ্বে বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রসার ঘটেছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির কুফল হলো– মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে অনেক সময় বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর বিলাসদ্রব্য যা একেবারেই প্রয়োজন নয় তা আমদানি করা হয়ে থাকে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যবহার করা হয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য বিশ্লেষণ করো।

নবম অধ্যায়

দূষণ ও দুর্যোগ

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে লোকমান নৌপথে চাঁদপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়। নৌপথে আসতে সে দেখল গ্রামীণ বসতিগুলো নদী পাড়ে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। অনেকেই নদীতে স্নান করছে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী নদীতে তার নৌযানটি প্রবেশ করার পর দেখল নদীর দু'ধারে শুধুই কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান। নদীর পানিতে সে কাউকে স্নান করতে দেখল না।

◀ শিখনফল: ১ [ঢা.বো., রা.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো., ২০১৭]

ক. দূষক কাকে বলে? ১

খ. মোটরযানের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে বায়ুদূষণের সম্পর্ক– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. লোকমান-এর দেখা গ্রামীণ বসতির ধরনের বৈশিষ্ট্য লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনামতে নদীতে স্নান করার দৃশ্যমান পার্থক্য মূল্যায়ন করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব উপাদানের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয় তাকে দূষক বলে। যেমন– CO, CO_2।

খ মোটরযান থেকে প্রতিদিন প্রচুর দূষণকারী পদার্থ নির্গত হয়ে বায়ুকে দূষিত করছে। মোটর গাড়ির কারণে বায়ুদূষণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ উৎস থেকে যে উপাদানগুলো নির্গত হয়ে বায়ুকে দূষিত করছে সেগুলো হলো হাইড্রোকার্বন, কার্বন ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড, আলোক রাসায়নিক ধোঁয়া (photochemical smog) ইত্যাদি।

গ লোকমান নদীর পাড়ে সারিবদ্ধ গ্রামীণ বসতি দেখতে পায়।

যে বসতিগুলো পাশাপাশি অবস্থিত হয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন সারি সৃষ্টি করে তাকে সারিবদ্ধ বসতি বলে। এ ধরনের বসতি কখনও কখনও ৫/৬ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। একে রৈখিক বসতিও বলা হয়। এ ধরনের বসতির বৈশিষ্ট্য–

i. এ ধরনের বসতি দীর্ঘ সময় নিয়ে গড়ে ওঠে।

ii. সেবা সুবিধাসমূহ (বাজার, শিক্ষা) সুবিধাজনকভাবে গড়ে তোলা যায় না।

iii. অধিবাসীদের সামাজিক যোগাযোগ গড়ে তোলা কঠিন হয়।

বাংলাদেশের ছোট বড় সব নদীর তীরে এবং রেললাইন ও রাস্তার পাশে প্রধানত এ বসতি গড়ে উঠেছে। মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ অঞ্চলে সারিবদ্ধ বসতি দেখা যায়। বরেন্দ্র অঞ্চলের নদীসমূহ খুব একটা সক্রিয় নয়। তাই নদীর দুই পাড়েই সারিবদ্ধ বসতি দেখা যায়। সিলেটের চা বাগান অঞ্চলে ও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলেও সারিবদ্ধ বসতি গড়ে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণনায় নদীতে স্নান করার দৃশ্যের পার্থক্যের মাধ্যমে পানি দূষণের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে লোকমান নৌপথে চাঁদপুর থেকে ঢাকায় আসার পথে অনেককে নদীতে স্নান করতে দেখে। কিন্তু ঢাকার পার্শ্ববর্তী নদীতে সে এরূপ দৃশ্য দেখতে পায় না। কেননা ঢাকার পার্শ্ববর্তী নদী বুড়িগঙ্গার পানি খুবই দূষিত।

বুড়িগঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছে অনেক ইট ভাটা ও কলকারখানা। এসব উৎস থেকে ময়লা ও রাসায়নিক বর্জ্য নদীতে মিশে পানি দূষণ ঘটায়। দেশের রাজধানী শহর ঢাকার গৃহস্থালি ময়লা ও বর্জ্য পদার্থ পয়ঃপ্রণালির মাধ্যমে নদীতে গিয়ে পড়ে এবং পানি দূষিত করে। কৃষিজমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতি বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নদীতে গিয়ে মিশে। এসব দূষক উৎসই ঢাকার পার্শ্ববর্তী বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষণে ক্রিয়াশীল। দীর্ঘ সময় ধরে এ দূষণ প্রতিরোধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপও নেওয়া হয়নি। ফলে এ নদীর পানি এখন ঘন কালো বর্ণ ধারণ করেছে। পরিণতিতে এ পানিতে মানুষ গোসলও করে না।

সুতরাং উদ্দীপকের নদীতে স্নান করার দৃশ্যমান পার্থক্য মূলত ভয়াবহ নদীদূষণের ইঙ্গিত বহন করে।

প্রশ্ন ▶ ২

◀ শিখনফল: ৪ [দি. বো. ২০১৭]

ক. মানবসৃষ্ট দূষণ কাকে বলে? ১

খ. শিল্পবর্জ্য বুড়িগঙ্গার পানি দূষণের অন্যতম কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাব্য প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'খ' অঞ্চলে সংগঠিত দুর্যোগসমূহ সংঘটনের কারণ ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে রক্ষার উপায় বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের যেকোনো কর্মকান্ডের মাধ্যমে পরিবেশের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তাকে মানবসৃষ্ট দূষণ বলে। যেমন- শিল্পবর্জ্যের মাধ্যমে পানি দূষণ।

খ শিল্পবর্জ্য বুড়িগঙ্গার পানি দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ।
ঢাকা ও তার আশপাশের বিভিন্ন শিল্প যেমন- কাগজ ও কাগজমণ্ড, বস্ত্র, ট্যানারি, রাবার, রং ও প্লাস্টিক, লৌহ জাতীয় ধাতু, ওষুধ প্রভৃতি শিল্প হতে নির্গত বর্জ্যসমূহ পয়ঃনিষ্কাশন লাইনের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গার পানিতে মিশেছে। ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদানে গঠিত এসব শিল্পবর্জ্যই বুড়িগঙ্গার পানিকে দূষিত করছে।

গ উদ্দীপকের 'ক' পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বিধৌত অঞ্চল।
অঞ্চলটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা ও নদী ভাঙনের নিয়মিত ও ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। অন্যান্য দুর্যোগসমূহ যেমন- ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির প্রভাব এ অঞ্চলে খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় না। এছাড়া এ অঞ্চলটিতে ভূমিকম্পের ঝুঁকিও অনেক কম।
নিচে 'ক' অঞ্চলের প্রধান দুর্যোগ বন্যা ও নদী ভাঙনের সম্ভাব্য প্রভাব ব্যাখ্যা করা হলো-

বন্যার প্রভাব: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যা অন্যতম। এর ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি, এমনকি মানুষের প্রাণহানিও ঘটতে পারে। এছাড়া স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। পশুপাখির জীবন বিনষ্ট ও বিপন্ন হয়। ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৪ সালে অঞ্চলটিতে বন্যার প্রভাব ছিল ভয়াবহ।

নদী ভাঙনের প্রভাব: উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলটিতে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি প্রধান নদীর সম্মিলিত প্রভাবে নদী ভাঙন একটি নিয়মিত ঘটনা। প্রতি বছর এ অঞ্চলে নদী ভাঙনের ফলে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন লোক প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদের মধ্যে প্রায় ৩ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছাড়ায় প্রায় ২০০ কোটি টাকা। এছাড়াও প্রতিবছর প্রচুর জমি নদীভাঙনে নিঃশেষ হয়ে যায়।
তাই বলা যায়, উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলটিতে বন্যা ও নদী ভাঙনের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের 'খ' অঞ্চলটি হলো বাংলাদেশে দক্ষিণ অঞ্চল, যা ভৌগোলিকভাবে দুর্যোগপ্রবণ।
উদ্দীপকের অঞ্চলটিতে প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। মূলত ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুগত কারণেই এ অঞ্চল অধিক দুর্যোগপ্রবণ।
বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলের একটি দেশ। তাই এখানে প্রায় প্রতিবছর ক্রান্তীয় গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় এবং এর প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়। এছাড়া বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ঘূর্ণিঝড় হয়ে থাকে। সর্বোপরি বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর ফানেল (Cone) আকৃতি বিশিষ্ট হওয়ার কারণে অঞ্চলটি অধিক দুর্যোগপ্রবণ।
উদ্দীপকের অঞ্চলটিতে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে রক্ষার জন্য দুর্যোগ পরবর্তীতে সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দুর্যোগ পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়া, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ, ব্যাপক তল্লাশি ও উদ্ধার তৎপরতা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রভৃতি সাড়াদান পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। আবার দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে চিহ্নিত করে তাদের চিকিৎসাসেবা, বাসস্থান ও খাবারের ব্যবস্থা করা, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৩ জাহিদ জেএসসি পরীক্ষা শেষে মাগুরা থেকে টঙ্গী শিল্প এলাকায় তার খালার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল। পাশের নদীতে গোসল করতে চাইলে তার খালা জানালো ঐ নদীর পানি গোসল করা তো দূরের কথা গৃহস্থালিসহ তেমন কোনো কাজেই ব্যবহার করা যায় না। পরে সে নদীর কাছে গিয়ে দেখল পানি কালচে ও দুর্গন্ধযুক্ত। *[সকল বোর্ড-২০১৬]* ◀ ***শিখনফল: ১***

ক. দূষণ কী? ১
খ. বায়ু দূষণের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দূষণ পরিবেশের ওপর কী বিরূপ প্রভাব ফেলছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দূষণরোধে কী কী বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের যেকোনো পরিবর্তন হলো দূষণ। যেমন- পানি দূষণ।

খ বায়ু হলো কতিপয় গ্যাসীয় উপাদান, যা সর্বদা পৃথিবীকে আবৃত করে বিরাজমান।

বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যখন দূষিত ধোঁয়া, গ্যাস, বাষ্প, ইত্যাদি অনিষ্টকর উপাদানের সমাবেশ ঘটে এবং যার দরুন মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ জগতের ক্ষতি হয়, তখন তাকে বায়ু দূষণ বলে।

বায়ু দূষণের ৩টি কারণ হলো–

i. মোটর যানবাহন ও শিল্পকারখানা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া (CO, CO_2 প্রভৃতি)।
ii. রেফ্রিজারেটর ও এয়ারকন্ডিশনার থেকে নির্গত ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC)।
iii. গাছপালা নিধনের ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি।

গ উদ্দীপকে পানি দূষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জাহিদের খালার বাসার পাশের নদীটিতে মূলত পানি দূষণ ঘটেছে। এটি একটি শিল্প এলাকা হওয়ায় বিভিন্ন শিল্পকারখানার বর্জ্য নদীর পানিকে দূষিত করেছে। নদীর পানি দূষিত হওয়ার ফলে জলজ উদ্ভিদ, প্লাঙ্কটন, কচুরিপানা, ছোট মাছ প্রভৃতির ওপর প্রভাব পড়ছে। তাদের খাদ্যের অভাব হচ্ছে। ফলে নদীতে ছোট মাছ কমে যাচ্ছে। এতে করে বড় মাছগুলোর খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। যার ফলে নদীর জলজ বাস্তুসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এভাবে পানি দূষণের ফলে নদীটির জলজ উদ্ভদ ও প্রাণী এবং এর আশপাশে বসবাসকৃত মানুষের ওপর তথা পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দূষণটি হলো পানি দূষণ।

শিল্প কারখানার বর্জ্যের ফলে সৃষ্ট পানি দূষণ রোধে যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেখা উচিত সেগুলো হলো–

১. শিল্পকারখানা থেকে যেসব বর্জ্য পদার্থ নদীতে ফেলা হয় তা বন্ধ করে কৃত্রিমভাবে জলাশয় সৃষ্টি করে সেখানে বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ফেলতে হবে।

২. শিল্পকারখানার দূষিত অপ্রয়োজনীয় তরল বর্জ্য 'শোধন কেন্দ্র' বা ট্রিটমেন্ট প্লান্টে পাইপযোগে সরবরাহ করে এ কেন্দ্রগুলোতে ময়লা পানিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবর্জনা ও দূষণমুক্ত করার পর নদীতে ছেড়ে দেয়া।

৩. পরিবেশ বিষয়ক কঠোর আইন প্রণয়ন করা ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত নদীটির পানি দূষণ রোধ করা যেতে পারে। এজন্য উপরের বিষয়গুলোর ওপর যথাযথ গুরুত্ব দেখা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ৪ রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার নির্মাণ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কিন্তু তবুও যেন শহরটিতে যানজট কমছে না। ক্রমাগত যানবাহন বেড়েই চলেছে। এসব যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে একটি শক্তি সম্পদ ব্যবহৃত হয়। এটি বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক ব্যবহৃত শক্তি সম্পদ।

◀ ৫ ও ৯ অধ্যায়ের সমন্বয়ে

ক. গ্রাফাইট কী? ১

খ. গ্রাফাইটের ব্যবহার ব্যাখ্যা করো। ২

গ. যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত শক্তি সম্পদটির আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশগুলো উল্লেখ করো। ৩

ঘ. উক্ত নগরটি যানজটমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব করতে কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাফাইট হলো এক প্রকার ধূসর বর্ণের খনিজ পদার্থ।

খ গ্রাফাইট ধূসর বর্ণের অধাতব খনিজ।

গ্রাফাইট পেন্সিলের সিস তৈরিতে, ধাতু গলানোর পাত তৈরিতে, ছাপাখানার অক্ষর ও রং তৈরিতে, যান্ত্রিক ক্ষয় নিবারক এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ মানুষ এক স্থান হতে অন্য স্থানে দ্রুত গমন ও পণ্য পরিবহনের জন্য যানবাহন ব্যবহার করে। আর এসব যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত খনিজ তেল বর্তমানে বিশ্বে সর্বাধিক ব্যবহৃত শক্তি সম্পদ ।

খনিজ তেলের বহুমুখী ব্যবহারের কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে খনিজ তেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বে জ্বালানি শক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ খনিজ তেল পূরণ করে থাকে।

খনি হতে উত্তোলিত অপরিশোধিত তেল রপ্তানিতে সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, ইরান, ভেনিজুয়েলা, ইরাক, আলজেরিয়া, লিবিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ এবং আমদানিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কলম্বিয়া, পেরু, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, ভারত, জাপান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে রপ্তানিতে সৌদি আরব প্রথম, রাশিয়া দ্বিতীয় এবং নরওয়ে তৃতীয় এবং আমদানিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, জাপান দ্বিতীয় এবং চীন তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। মূলত OPEC (Organization of Petrolium Exporting Countries) বিশ্বের খনিজ তেলের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, খনিজ তেলের বাণিজ্য সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত।

ঘ উদ্দীপকের নগরটি হলো ঢাকা।

অস্বাভাবিক যানযট ও অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে ঢাকায় জীবনযাপন কঠিন হয়ে উঠেছে। শহরটিকে যানজটমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা—

i. ঢাকা শহরের জনসংখ্যা হ্রাস করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলা শহরগুলোতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এতে করে কাজের আশায় সবাই ঢাকামুখী না হয়ে অন্য জেলাগুলোতে যাবে।

ii. পরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ করতে হবে। রাস্তার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। এতে যানজট কমে আসবে।

iii. মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ি চলতে দেওয়া যাবে না। পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

iv. শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ শিল্পকে শহর থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে। ঢাকায় বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ভবন প্রভৃতি একই জায়গায় গড়ে ওঠার ফলে যানজট ও পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো শহরের বাইরে কোথাও স্থানান্তর করা যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকেরা সেখানে চলে যাবে। ফলে যানবাহনের চাপ কমবে। সেই সাথে পরিবেশও দূষণমুক্ত হবে।

v. ঢাকা শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখতে ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে হবে।

vi. ঢাকার বস্তিবাসীরা নোংরা পরিবেশে বাস করে ও দূষণ ঘটায়। সরকারিভাবে তাদের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতন করতে হবে।

সর্বোপরি বলা যায়, ঢাকা শহরে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষা, চাকরি ইত্যাদির আশায় মানুষ এসে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করায় যানজট, পরিবেশ দূষণের মতো নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে পারলে ঢাকা নগরীর যানজট অনেকটাই নিরসন এবং সুস্থ পরিবেশ পাওয়া সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ৫ একদল শিক্ষার্থী বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌভ্রমণে যায়। সেখানে তারা পানির স্বাভাবিক রং না দেখে রীতিমতো বিস্মিত হয়।

◀ শিখনফল: ১

ক. দূষণ কাকে বলে? ১

খ. মাটি দূষিত হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শিক্ষার্থীদের দেখা নদীর পানির রং স্বাভাবিক নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত নদীর পানির রং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? তোমার মতামত দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের যেকোনো পরিবর্তন হলো দূষণ। যেমন- পানি দূষণ।

খ মানুষের বিভিন্ন কাজের ফলে মাটি দূষিত হয়।
অতিরিক্ত পানি সেচের ফলে মাটিতে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার সৃষ্টি হয়। মাটির নিচের লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে উপরে উঠে এসে মাটিকে অনুর্বর করে তোলে। এছাড়া বন ও গাছপালার ধ্বংস, অতিমাত্রায় কৃষিকাজ, জমিতে কীটনাশক, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার প্রভৃতি মাটি দূষণের অন্যতম কারণ।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত একদল শিক্ষার্থী বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌভ্রমণে যায় এবং নদীর পানির স্বাভাবিক রং না দেখে বিস্মিত হয়। পানি দূষণের কারণেই এমনটি হয়েছে।
ঢাকা শহর বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং শহরের নর্দমাগুলো বুড়িগঙ্গার সাথে সংযুক্ত। এ নর্দমার মাধ্যমে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মলমূত্র ও অন্যান্য ময়লা আবর্জনা বুড়িগঙ্গা নদীর পানিতে পড়ে। ফলে পানি তার স্বাভাবিক রং হারিয়ে ফেলে। এছাড়াও বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম পোশাক শিল্প, রাসায়নিক কারখানা। এসব শিল্প-কারখানা থেকে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য (যেমন– সিমেন্ট কারখানা থেকে ফ্লাই অ্যাশ) নির্গত হয় যা বুড়িগঙ্গার পানির সাথে মিশে পানি দূষণ ঘটায়। এর ফলে পানির স্বাভাবিক রং নষ্ট হচ্ছে।

গ বুড়িগঙ্গা নদীর পানির স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

পানি দূষণ মানবসৃষ্ট (man-made) কারণেই হয়ে থাকে। মূলত মানুষের অপরিণামদর্শী এবং যথেচ্ছ কর্মকাণ্ড এর জন্য দায়ী। তাই নদীর পানির স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনতে আমাদেরই সচেতনভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

বুড়িগঙ্গা নদীর পানির স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনতে যেসব উদ্যোগ নিতে হবে:

১. নদীর তীরবর্তী ফসলি জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।
২. জলযানের নির্গত বর্জ্য যাতে নদীর পানিতে না মিশে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
৩. শিল্প-কারখানার রং, গ্রিজ, রাসায়নিক দ্রব্য, উষ্ণ পানি যাতে নদীর পানিতে না মিশে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪. আবাসস্থলের বর্জ্য নদীর পানিতে ফেলা যাবে না।
৫. নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতার মাধ্যমেই বুড়িগঙ্গা নদীর পানির রং স্বাভাবিক রাখা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৬ বুড়িগঙ্গা নদীতে এক মাঝি নৌকা চালাতে চালাতে যাত্রীদের বলছে আগের দিনে এ নদীতে গোসল করেছি, নদী থেকে মাছ ধরেছি, এমনকি নদীর পানি খেয়ে জীবন ধারণ করেছি। এখন নদীর এ কী হাল! ◀ *শিখনফল: ১*

ক. শিল্পকারখানা থেকে নিঃসৃত ৪টি দূষিত গ্যাসের নাম লিখ। ১
খ. বায়ু দূষণের মনুষ্যসৃষ্ট কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি ঘটার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা শহরের পরিবেশগত কী বিপর্যয় দেখা দিতে পারে বলে তুমি মনে করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্পকারখানা থেকে নিঃসৃত ৪টি দূষিত গ্যাস হলো: ১. CO ২. SO_2 ৩. NO_2 এবং ৪. NH_3

খ বায়ু দূষণের মানবসৃষ্ট কারণগুলো হলো: মোটর যানবাহন, শিল্প-কারখানা, পাওয়ার প্লান্ট, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, আবর্জনাসমূহ, পরিবহন সেবা, বাণিজ্যিক ও কৃষিকাজ ইত্যাদি।
মোটর যানবাহন থেকে প্রতিদিন প্রচুর দূষণকারী পদার্থ নির্গত হয়ে বায়ুকে দূষিত করছে। শিল্প-কারখানার বিভিন্ন পদার্থ বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করছে। উন্মুক্ত স্থানে মানুষের পৌর বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, বাণিজ্যিক এলাকার বর্জ্য পুড়িয়ে বায়ুকে নানাভাবে দূষিত করছে।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি হলো পানি দূষণ।
বর্তমানে বুড়িগঙ্গা নদীতে ব্যাপকভাবে পানি দূষণ ঘটছে। উদ্দীপকে মাঝি এ কারণেই বলছে 'এখন নদীর এ কী হাল!'
পানি দূষণের কারণ ব্যাখ্যা করা হলো:
নানা কারণে পানি দূষিত হয়। মূলত এজন্য মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডই দায়ী।
শিল্পকারখানার রং, বর্জ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, উষ্ণ পানি ইত্যাদি নদীনালা, জলাশয় কিংবা পুকুরে মিশে পানি দূষিত করে। শিল্প কারখানার অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য বৃষ্টির পানির সাথে মিশে কিংবা যেকোনো জলাশয়ে পতিত হলে এগুলো ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয়। ব্যাকটেরিয়াসমূহের এ ধরনের কার্যাবলির জন্য প্রচুর অক্সিজেন খরচ হয়। ফলে পানি দূষিত হয়। এভাবে পানিতে সরাসরি দূষক মিশ্রিত হয়ে অথবা জৈব ও অজৈব উপাদানগত ক্রিয়ায় পানি দূষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষিতে বলা যায় ঢাকা শহরে পরিবেশগত বিভিন্ন বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।
উদ্দীপকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, পানি দূষণের ফলে বুড়িগঙ্গার আশপাশের পরিবেশ হুমকির মুখে পড়তে পারে। বুড়িগঙ্গার পানি দূষণের কারণে ঢাকা শহরের পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। বুড়িগঙ্গার পানি এখন গোসলেরও অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং এ পানি পরিবেশ উপাদান হিসেবে এতটাই অস্বাভাবিক যে তা পরিবেশের বিপর্যস্ত করছে। এখানে মাছ ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন হুমকির মুখে। বুড়িগঙ্গা নদীর জলজ বাস্তুসংস্থান

ভেঙে যাচ্ছে। বুড়িগঙ্গার পানি ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়। এ পানির ব্যবহারের ফলে নগরের অধিবাসীরা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। উপরন্তু এই নদীর পানি ব্যবহারের কারণে নদী পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের চর্মরোগসহ বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দিচ্ছে। এ অসুস্থ পরিবেশ সামাজিক পরিবেশ এবং যুগপৎ প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিপর্যস্ত করছে।

পরিশেষে বলা যায়, ঢাকা শহর বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত হওয়ায় বুড়িগঙ্গাকে কেন্দ্র করে লাখ লাখ মানুষ তাদের বাসস্থান তৈরি করেছে এবং এই নদীর পানি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। তাই এই দূষিত পানি ব্যবহারের কারণে মানুষ ও পরিবেশের ওপর বিভিন্ন বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৭

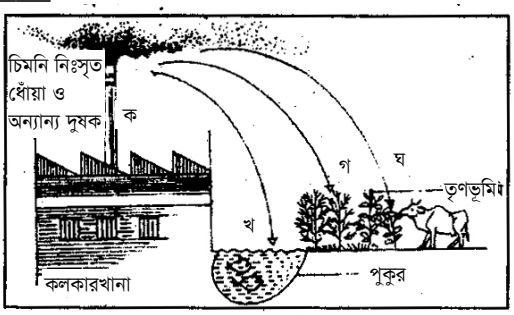

◀ *শিখনফল: ১ [খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ, খুলনা; সরকারি এম.এম. কলেজ, যশোর]*

ক. দূষণ কী? ১

খ. সিডর বলতে কী বোঝায়? ২

গ. চিত্রে উল্লিখিত 'ক' এর প্রভাবে 'খ' 'গ' ও 'ঘ-এর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. চিত্রে উল্লিখিত 'ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ' এর মধ্যে পারিবেশিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কী ধরনের ভূমিকা নেওয়া যেতে পারে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দূষণ হলো মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে পরিবেশের উপাদানে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। যেমন– বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি।

খ সিডর একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড়ের নাম।

১৫ নভেম্বর, ২০০৭ সালে সিডরের আঘাতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অনেক ঘরবাড়ি, গাছপালা বিনষ্ট হয়।

গ চিত্রে উল্লিখিত শিল্পকারখানার ধোঁয়া ক এর প্রভাবে অর্থাৎ বায়ু দূষণের প্রভাবে খ, গ, ঘ অর্থাৎ পানি, গাছপালা, মাটি এক কথায় পরিবেশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কলকারখানা, মোটরগাড়ি থেকে নির্গত বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড (যেমন– CO_2, NO, SO_2) বাতাসের জলীয়বাষ্পের সঙ্গে মিশে তৈরি করে সালফার এবং নাইট্রোজেনের এসিড (H_2SO_4, HNO_3)। এর ফলে এসিড বৃষ্টি সৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টির ফলে মাটি, পানিতে এসিডের পরিমাণ বাড়ে। এতে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও বায়ু দূষণের ফলে মানুষের বিভিন্ন রোগ যেমন- মাথাধরা, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, দীর্ঘস্থায়ী ব্রংকাইটিস, ফুসফুসের ক্যান্সার ইত্যাদি সৃষ্টি হয়।

অর্থাৎ বায়ু দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবে পানি, গাছপালা, তৃণভূমি, মাটি এক কথায় পুরো পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঘ চিত্রে উল্লিখিত ক, খ, গ ও ঘ তথা শিল্প-কারখানার ধোঁয়া, পানি, গাছপালা ও মাটির মধ্যে পারিবেশিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সচেতনতামূলক ভূমিকা নেয়া যেতে পারে–

পরিবেশ দূষণ মূলত মানুষের কর্মকাণ্ডের (human activities) ফল। তাই মানুষের সচেতন কার্যক্রম পরিবেশ দূষণ রোধ করে পারিবেশিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে একক বা সরকারি উদ্যোগ নয় বরং সবাইকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় যেসব ভূমিকা নেওয়া যেতে পারে–

i. যেসব শিল্প-কারখানা থেকে ক্ষতিকারক ধোঁয়া বা গ্যাস বের হয় তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পাশাপাশি বিকল্প শক্তি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস, সৌরশক্তি প্রভৃতি নির্ভর যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

ii. যেসব বর্জ্য পদার্থ পানিতে ফেলা হয় তা বন্ধ করে শিল্প এলাকায় কৃত্রিমভাবে জলাশয় সৃষ্টি করে সেখানে বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ফেলতে হবে। অথবা শিল্প-কারখানা লোকালয় থেকে দূরে স্থানান্তর করতে হবে।

iii. কারখানার আশপাশে প্রচুর বৃক্ষরোপণ করতে হবে।

iv. শিল্প এলাকার (Industrial area) বর্জ্য যাতে মাটির গুণাগুণ নষ্ট না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে বায়ু, পানি, গাছপালা ও মাটির মধ্যে পারিবেশিক ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৮

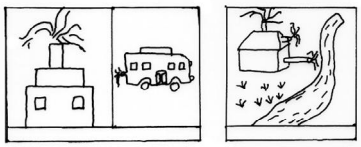

চিত্র-ক চিত্র-খ

◀ *শিখনফল: ১ [বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. দূষণ কী? ১

খ. দুর্যোগ প্রস্তুতির ৪টি গুরুত্ব লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' এর কারণসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' উদ্দীপক যে ধরনের দুর্যোগ সৃষ্টি করে তা প্রতিরোধ করার পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের যেকোনো পরিবর্তন হলো দূষণ। যেমন- পানি দূষণ।

খ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুতি অতীব গুরুত্ববহ।

দুর্যোগ প্রস্তুতির ৪টি গুরুত্ব নিম্নরূপ:

i. জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়।

ii. অল্প সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে ত্রাণ পৌঁছানো সম্ভব হয়।

iii. পূর্বপ্রস্তুতির মাধ্যমে দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা যায়।
iv. এছাড়াও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা যায়।

গ চিত্র 'ক' দ্বারা শিল্পকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া বোঝানো হয়েছে, যা বায়ু দূষিত করে।
শিল্পকারখানা থেকে উৎপন্ন ধোঁয়ার সাথে কার্বন-মনোক্সাইড, অ্যামোনিয়া গ্যাস, সালফার ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি নির্গত হয়। এই সব উৎস হতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের জ্বালানিসমূহের দহন ক্রিয়ার ফলে বা দহনকৃত বস্তুর নির্গত গ্যাস বাতাসের সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করছে।
যানবাহনের কারণে বায়ু দূষণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যানবাহনের ধোঁয়ার সঙ্গে অবাধে পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ বাতাসে মিশে যায়। ফলে বায়ু দূষিত হয়।

ঘ চিত্র 'ক' দ্বারা বায়ু দূষণ এবং 'খ' দ্বারা পানি দূষণ বোঝানো হয়েছে।
শিল্পকারখানার ধোঁয়া, যানবাহনের ধোঁয়া এবং শিল্পকারখানার বর্জ্য দ্বারা দূষণের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ বেড়ে যায়। যার ফলে গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।
এসব দুর্যোগ প্রতিরোধে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। যথা—
বেড়িবাঁধ নির্মাণ: সাধারণত নদী ও উপকূলবর্তী এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে বেশি পতিত হয়। তাই উপকূলবর্তী জনগণ, সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষার জন্য বেড়িবাঁধ নির্মাণ করে দুর্যোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।
আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ: দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলগুলোতে সাধারণত ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। তাই দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে এসব এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে দুর্যোগ প্রতিরোধে সহায়তা করা যায়।
নদী খনন: যেসব এলাকা প্রতিবছর বন্যার দ্বারা প্লাবিত হয়ে খাল-বিল, নদ-নদী, পলি-বালি, কাদায় ভরে যায় সেসব এলাকার নদ-নদী খনন বা ড্রেজিং করে নদীর প্রবাহ সচল রাখার ব্যবস্থা করতে হবে যেন বন্যার সময় নদী বেশি পানি ধারণ করতে পারে।
প্রশিক্ষণ প্রদান: প্রতিরোধ একটি দুর্যোগ পূর্ববর্তী মোকাবিলা। তাই দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের জনগণকে পূর্ব থেকেই দুর্যোগের ভয়াবহতা ও দুর্যোগকালীন কী করণীয় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে রাখা, যেন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হয়।
এভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে দূষণজনিত দুর্যোগ প্রতিরোধ করা যায়।

প্রশ্ন ▶৯ লিলিদের বাসার পাশে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারখানাটিতে বিকট শব্দ হয়। ফলে এলাকাবাসীর সমস্যা হচ্ছে। এলাকাবাসী এ সমস্যার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ পেশ করে। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি কত? ১
খ. কৃষি ক্রিয়াকলাপ কীভাবে মাটিদূষণ করে? ২
গ. উদ্দীপকে লিলিদের এলাকার পরিবেশের কোন উপাদান দূষিত হচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে লিলিদের এলাকার সমস্যা নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তিগত উপায় সুপারিশ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি ৫৫-৬০ dB।

খ আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে মাত্রাতিরিক্ত ও অপরিকল্পিত রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকা দূষিত হয়। এ ছাড়া খামার চাষ; যথা পোলট্রি এবং পশুপালনের ফলে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থের (যথা: মল, খাদ্য অবশেষ) অসতর্ক স্থানান্তর এবং স্তূপীকরণ কৃষিজনিত মৃত্তিকা দূষণের একটি প্রধান কারণ।

গ উদ্দীপকে লিলিদের এলাকার পরিবেশে কারখানার বিকট শব্দে শব্দদূষণ হচ্ছে।
শব্দদূষণ মানবস্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। মানুষের উচ্চঃস্বরে কথা বলার শব্দ, মাইক, বিমান ওড়ার সময় সৃষ্ট শব্দ, জেনারেটর চলার শব্দ, কারখানার মেশিনের শব্দ, আতশবাজি ইত্যাদি শব্দদূষণের প্রধান কারণ। জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধি, মানুষের ব্যক্তিগত অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপ, পরিবহনব্যবস্থার অবাধ বিস্তার, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, যেগাযোগব্যবস্থার ত্রুটি এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে লাউড স্পিকারে বিবর্ধিত শব্দের ব্যাপকতায় শব্দদূষণ বর্তমানে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। বর্তমানের যান্ত্রিক সময়ের কলকারখানার সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলছে। আর এসব কলকারখানা আবার আবাসিক এলাকায়ও গড়ে উঠছে। যার ফলে কলকারখানা থেকে সৃষ্ট বিকট শব্দ শব্দদূষণের সৃষ্টি করছে। যা জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলছে।
পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে লিলিদের এলাকায় কলকারখানা থেকে সৃষ্ট শব্দ দ্বারা পরিবেশে শব্দ দূষণের সৃষ্টি হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে লিলিদের এলাকায় সৃষ্ট শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তিগত উপায়গুলো নিচে সুপারিশ করা হলো–
প্রযুক্তির বিকাশের দ্বারা শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। প্রযুক্তিগত উপায়ে মেশিন বা যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি থেকে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা হ্রাস করা সম্ভব। কারখানা বা শিল্প সংস্থার সুরবর্জিত শব্দ উৎপন্নকারী মেশিন বা যন্ত্রপাতি অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন এবং কম শব্দ উৎপন্নকারী মেশিনে বা যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে উৎসস্থলে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কারখানা বা শিল্প সংস্থায় সুরবর্জিত শব্দ উৎপন্নকারী মেশিন বা যন্ত্রপাতি শব্দ অপরিবাহী বস্তুর দ্বারা আচ্ছাদিত করে শব্দদূষণ হ্রাস করা যায়।
শব্দদূষণ স্থলে শব্দ প্রতিরোধক ডিভাইস যথা 'ইয়ারমাফ' ব্যবহার করে শব্দ দূষণের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শব্দ প্রতিরোধক ডিভাইস শব্দ প্রতিরক্ষা কৌশল (Hearing Portection Device) বা (HPD) নামেও পরিচিত। প্রধানত তিন ধরনের HPD পাওয়া যায় যথা– (ক) ইয়ার প্লাগ (Ear plugs), (খ) ক্যানাল ক্যাপ (Canal Caps) এবং (গ) ইয়ার মাফ (ear muff)। 'ইয়ার প্লাগ' কম স্পন্দনযুক্ত এবং 'ইয়ার মাপ' অধিক স্পন্দনযুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী। শব্দের তীব্রতা 90dB-এর নিচে বজায়

রাখতে (8 ঘণ্টা) HPD সাহায্যে করে। শিল্প-কারখানায় বায়ু বা কঠিন মাধ্যমে সুর বর্জিত শব্দের সঞ্চারণ প্রতিরোধ 'অ্যাকুয়াসটিক জোনিং'-এর দ্বারা শব্দদূষণ প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।
উপরিউক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রযুক্তিগত উপায়ে বিভিন্নভাবে শব্দদূষণ রোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১০ কাজলদের পরিবার পদ্মা নদীর তীরে বসবাস করত। গত বছর বর্ষাকালে নদী ভাঙনের ফলে তাদের বসতবাড়ি ও একখণ্ড জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কাজলদের মতো পদ্মা নদীর পাড়ে আরও অনেক পরিবার রয়েছে যারা নদী ভাঙন দুর্যোগের শিকার হয়ে পূর্বের ন্যায় জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে পারে না। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. নদী ভাঙন কী ধরনের দুর্যোগ? ১
খ. দুর্যোগ মোকাবিলা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কাজলদের পরিবার যে ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার তার কারণ উপস্থাপন করো। ৩
ঘ. কাজলদের পরিবারের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনতে কী ধরনের ব্যবস্থা দরকার? তোমার মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নদী ভাঙন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

খ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী যাবতীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা সংগঠন, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণসহ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন পর্যন্ত সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাকে দুর্যোগ মোকাবিলা বলে।
বস্তুত দুর্যোগ মোকাবিলা মানে এই নয়, যে আমরা দুর্যোগ মুক্ত থাকব। বরং এর অর্থ এই যে, দুর্যোগপূর্ব স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনা।

গ কাজলদের পরিবার নদী ভাঙনের শিকার। নদী ভাঙন বলতে নদীর পানি প্রবাহের ফলে নদীর পাড় বা তীর ভাঙনকে বোঝায়।
বাংলাদেশে বর্ষা মৌসুমে প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন অতিরিক্ত পানি এবং নদীর উজানের পানি প্রবলবেগে প্রবাহের ফলে নদী ভাঙনের সৃষ্টি হয়। এছাড়া অনেক সময় ক্ষয়জনিত ফাটলের সৃষ্টি হলে তার প্রভাবেও নদী ভাঙন হয়।
জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, শীত ঋতুতে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হওয়ার সময় এর দ্বারা বাহিত শিলা ও বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতির কারণে নদী ভাঙন দেখা দেয়। নদীর তীরের গাছ কাটার ফলে নদীর তীরের মাটি আলগা হয়ে পড়ে। ফলে নদী ভাঙনের সৃষ্টি হয়। এছাড়া দুই বা ততোধিক নদীর মিলিত স্রোতের কারণে নদী ভাঙন হয়ে থাকে।

ঘ কাজলদের পরিবার নদী ভাঙনের শিকার। এর ফলে কাজলদের বসতবাড়ি ও এক খণ্ড জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কাজলদের পরিবারের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনতে যে সমস্ত ব্যবস্থা দরকার তা নিচে দেওয়া হলো—
পুনরায় বসত বাড়ি নির্মাণ: নদী ভাঙনের ফলে কাজলদের বসতবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তাই তাদের বসতবাড়ি পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে।
কৃষি পুনর্বাসন: নদী ভাঙনের ফলে কাজলদের এক খণ্ড জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তাই তাদের পুনরায় কৃষিজমির ব্যবস্থা এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।
কৃষি ঋণের চাহিদা নিরূপণ ও প্রদান: কাজলদের কৃষিকাজ পুনরায় চালু করার জন্য তাদেরকে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।
বৃক্ষরোপণ: পুনরায় যাতে নদী ভাঙনে তাদের কোনো ক্ষতি না হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে এবং নদী ভাঙন ঠেকাতে নদীর উভয় তীরে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
উপরোক্ত কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১১ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ হচ্ছে এবং জনজীবন হুমকির মুখে পড়ছে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. মৃত্তিকা কাকে বলে? ১
খ. পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় কেন? ২
গ. পরিবেশের উক্ত উপাদানগুলো দূষণে মানবসৃষ্ট দুটি করে কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূপৃষ্ঠের ওপর জৈব এবং অজৈব শক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট সূক্ষ্ম শিলাচূর্ণ ও জৈব পদার্থের কোমল স্তরকে মৃত্তিকা বলে।

খ পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়া মূলত পানি দূষণের ফলাফল।

পুকুরের পানিতে মানুষের মলমূত্র, গৃহস্থালির বর্জ্য ইত্যাদি মিশলে পুকুরের পানি দূষিত হয়। এ সমস্ত পচা আবর্জনা পানিতে ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তবে এ প্রক্রিয়াতে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন খরচ হয়। ফলে পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়।

গ পরিবেশের উপাদানগুলো হলো মাটি, পানি ও বায়ু।

পরিবেশের উপাদান যখন প্রাকৃতিকভাবে দূষিত হয়, তা প্রকৃতি নিজেই স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসে। তাই পরিবেশের উপাদানগুলো দূষণে মূলত মানুষই দায়ী। মূলত মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের দ্বারা এসব উপাদান দূষিত হচ্ছে।

নিচে পরিবেশের উপাদানগুলো দূষণে মানবসৃষ্ট দুটি করে কারণ উল্লিখিত হলো—

বায়ু দূষণের কারণ:

i. যানবাহনের কারণে বায়ু দূষণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাইড্রোকার্বন, নাইট্রোজেন অক্সাইড ইত্যাদি যানবাহন থেকে নির্গত হয়ে বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করছে।
ii. মানুষের প্রয়োজনে গাছপালা কাটা হচ্ছে। ফলে বনভূমির পরিমাণ কমে গিয়ে বায়ুতে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে, যা বায়ু দূষিত করছে।

মাটি দূষণের কারণ:

i. অতিমাত্রায় কৃষিকাজের ফলে মাটির উর্বর স্তর ক্ষয় হয়ে অনুর্বর হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ মাটি দূষিত হচ্ছে।

ii. মানুষের ব্যবহৃত পলিথিন, প্লাস্টিক ইত্যাদি পদার্থ প্রকৃতিতে পচনশীল নয়। ফলে এসব পদার্থ মাটিতে মিশে যায় না, তবে দূষণ ঘটায়।

পানি দূষণের কারণ:

i. কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বৃষ্টির পানির সাথে মিশে পানিকে দূষিত করে।

ii. শিল্পকারখানা ও গৃহস্থালির বর্জ্য পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে।

ঘ বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্যই পরিবেশের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্য কাজ করা। তবে পরিবেশের দূষণ রোধে জনগণের সংশ্লিষ্টতা আবশ্যক। পরিবেশ অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপগুলো সেভাবেই গৃহীত।

বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা উল্লেখ করা হলো-

i. পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন করা হয়েছে।

ii. টু-স্ট্রোক যানবাহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসব যানবাহনের নির্গত ধোঁয়ার কার্বন-ডাইঅক্সাইড, সিসা, কার্বন মনোঅক্সাইডসহ ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল।

iii. পরিবেশ দূষণরোধে CNG জ্বালানির ব্যবহার আরম্ভ করেছে।

iv. মেয়াদ উত্তীর্ণ যানবাহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

v. বনায়ন কর্মসূচির ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

vi. পরিবেশ আদালত গঠন করা হয়েছে। এ আদালতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশে পরিবেশ অপরাধের সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা।

vii. সরকার দেশের পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) বিল ২০০২ এবং পরিবেশ আদালত (সংশোধন) বিল ২০০২ নামে দুটি আইন পাস করেছে।

viii. জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করে সবাইকে সচেতন করছে।

সুতরাং বলা যায়, উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়িত হলে পরিবেশ দূষণ অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ টিভিতে ব্রেকিং নিউজ দেখাছে। সারোয়ার দেখতে পেল উপকূলীয় এলাকায় মানুষকে মাইকে সতর্ক করা হচ্ছে। তাদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হচ্ছে। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. দুর্যোগ প্রশমন কাকে বলে? ১

খ. কীভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ করতে হয়? ২

গ. উদ্দীপকের কার্যক্রমে দুর্যোগ মোকাবিলার কোন পর্যায় প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সারোয়ারের দেখা সংবাদে দুর্যোগ মোকাবিলার সবগুলো পর্যায় নেই -কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির দীর্ঘস্থায়ী হ্রাস এবং পূর্বপ্রস্তুতিকেই দুর্যোগ প্রশমন বলে।

খ প্রতিরোধ হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনা। যখন কোনো স্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়, তখন ওই পরিস্থিতি মোকাবিলায় যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তাই হলো প্রতিরোধ কর্মসূচি। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর জোর দেওয়া হয়। যেমন– উচ্চ জোয়ার এবং ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার সময় কোনো মানুষ বা প্রাণীকে উপকূলের কাছাকাছি অবস্থানের সুযোগ না দেওয়া, বাঁধ উঁচু করা, যাতে বন্যা বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের পানি ভূভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে।

গ উদ্দীপকের কার্যক্রমে দুর্যোগ মোকাবিলার পূর্বপ্রস্তুতি পর্যায় প্রতিফলিত হয়েছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রধান। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রচুর মানুষ মারা যায়, গৃহহীন হয়ে পড়ে, আহত হয় এবং দেশের অনেক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থা নিতে হয়। দুর্যোগ মোকাবিলার ধাপগুলোর মধ্যে একটি হলো প্রস্তুতি (Preparedness)। প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরুর আগে যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তা হলো প্রস্তুতি। এ ক্ষেত্রে দেশের বেসামরিক প্রশাসনের পাশাপাশি সামরিক বাহিনীসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অংশগ্রহণ করে থাকে। যেমন– উপকূলীয় ও দুর্যোগকবলিত এলাকার জনগণকে মাইকের সাহায্যে সতর্ক করা, যাতে জনগণ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার আগে নিরাপদে আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যেতে পারে। এ সময় ঘূর্ণিঝড় সময়কালীন ও পরবর্তী অবস্থান মোকাবিলায় পর্যাপ্ত খাদ্য, ওষুধ, পানীয়, অর্থের মজুত ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, দুর্যোগ পূর্ববর্তী 'প্রস্তুতি' গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। তাই দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে 'প্রস্তুতি' জরুরি।

ঘ উদ্দীপকে সারোয়ারের দেখা সংবাদে দুর্যোগ মোকাবিলায় সবগুলো পর্যায় নেই, কথাটি বিশ্লেষণ করা হলো–

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ধাপগুলোকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়, এগুলো হলো– প্রতিরোধ, প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার। প্রতিরোধ হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনা। যখন কোনো স্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়, তখন ওই পরিস্থিতি মোকাবিলায় যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তাই হলো প্রতিরোধ কর্মসূচি। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর জোর দেওয়া হয়। যেমন– উচ্চ জোয়ার এবং ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার সময় কোনো মানুষ বা প্রাণীকে উপকূলের কাছাকাছি অবস্থানের সুযোগ না দেওয়া, বাঁধ উঁচু করা, যাতে বন্যা বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের পানি ভূভাগের অভ্যন্তরে আসতে না পারে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের পর মানুষ ও গৃহপালিত পশু নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া, তল্লাশি ও উদ্ধার, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং পূনর্বাসনই দুর্যোগে সাড়াদান। এক্ষেত্রে বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের প্রাধান্য দিতে হবে। পুনরুদ্ধার হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়কাল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানার পর আহতদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হয়। গুরুতর আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে প্রেরণ এবং নিহতদের সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। বৃদ্ধ ও শিশুদের এ সময় অধিক যত্ন নিতে হয়। এছাড়া ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘর নির্মাণ করে দেওয়া, সার ও বীজ সরবরাহ করা, পুকুরের পানি লবণাক্ত হয়ে গেলে পুরো পানি সেঁচে লবণমুক্ত করা, গো-মহিষ সরবরাহ ও ভর্তুকি প্রদান করা হয়। এ সময় তাদের মনোবল চাঙা করার জন্য নিয়মিত কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এ পর্যায়ে কর্মসূচি ব্যক্তিপর্যায় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

সুতরাং উপরিউক্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, দুর্যোগ মোকাবিলায় যেসব বিষয় গ্রহণ করা উচিত, তা উদ্দীপকে সারোয়ারের দেখা সংবাদে দেখা যায়নি।

প্রশ্ন ▶ ১৩

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. Dirty Pollution কী? ১

খ. পানি দূষণের মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলো লেখো। ২

গ. ছকে উল্লিখিত শেষ পর্যায়টি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছকে উল্লিখিত প্রথম পর্যায়টি কেন অধিক প্রয়োজন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যারোসল ব্যবহারে সৃষ্ট বায়ু দূষণ হচ্ছে Dirty Pollution।

খ প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণ পানিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে।

পানি দূষণের বিভিন্ন মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে: তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ, মড়ক ও আগাছা দমনকারী ঔষধ, এসিডসমূহ, নর্দমার ময়লা, শিল্পের আবর্জনা ইত্যাদি।

গ ছকে উল্লিখিত শেষ পর্যায়টি হলো সাড়াদান।

দুর্যোগের পরপরই উপযুক্ত সাড়াদানের প্রয়োজন হয়। সাড়াদান কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হলে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়। দুর্যোগ মোকাবিলার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

সাড়াদান এর কার্যক্রমগুলো হলো:

অপসারণ: দুর্যোগের পরপরই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সম্পদ, জীবজন্তু ও মানুষের বিভিন্ন সাহায্যের প্রয়োজন হয়। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর একটি অন্যতম সাড়াদান কার্যক্রম।

তল্লাশি ও উদ্ধার তৎপরতা: সাড়াদান প্রক্রিয়াতে মানুষ ও জীবজন্তু তল্লাশি করা হয়। বিপদগ্রস্ত মানুষ বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থলের খোঁজ না পেলে স্বেচ্ছাসেবক দল তল্লাশি চালিয়ে তাদেরকে একত্রিত করে। অনেক সময় মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় নিজ বাড়ির চালে বা ছাদে অথবা গাছে অবস্থান করে। এসব বিপদ থেকে উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে আনা হয়।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ: প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সাড়াদান কার্যক্রমে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। এতে কী পরিমাণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কত, কী পরিমাণ জীবজন্তু মারা গেছে, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত ইত্যাদি নিরূপণ করে তার তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম: প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ সাড়াদান প্রক্রিয়া। এই কার্যক্রমে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার নির্দিষ্ট একটি স্থান থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হয় এবং পুনর্বাসনের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়।

ঘ ছকে উল্লেখিত প্রথম পর্যায়টি হলো পূর্ব প্রস্তুতি।

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি বলতে দুর্যোগপূর্ব সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থাসমূহকে বোঝায়। ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ড্রিল বা ভূমিকা অভিনয় এবং রাস্তাঘাট, যানবাহন, বেতার যন্ত্র ইত্যাদি দুর্যোগের পূর্বে প্রস্তুত রাখা দুর্যোগ প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ প্রতিবছর এদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে এবং জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। যেহেতু প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রতিহত করা সম্ভব নয় সেহেতু এসব দুর্যোগকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, কাঠামোগত ব্যবস্থার পাশাপাশি অবকাঠামোগত ব্যবস্থা হিসেবে সুষ্ঠু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করলে বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অতিবৃষ্টি আর নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় কুলসুমরা বেশ আতঙ্কের মধ্যে ছিল। একদিন সকালে কুলসুমরা দেখল পানি ধীরে ধীরে উঠোন, উঠোন থেকে ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, মাচা তৈরি করে কোনো রকমে নিজেরের রক্ষা করল। কিন্তু পানি বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ ভালো না। সামনে তার নির্বাচনী পরীক্ষা, কবে এলাকা পানিমুক্ত হবে, বিদ্যালয় আবার ক্লাস উপযোগী হবে, নিজেদের গুছিয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে এসব নিয়ে সে বেশ চিন্তিত। জীবনযাত্রার এ বিপর্যকর অবস্থায় কুলসুমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী তেমন কোনো সহযোগিতা পায়নি। বন্যা পরবর্তী সময়ে এলাকার মানুষের অবস্থা স্বাভাবিক করতে নানামুখী সহায়তার প্রয়োজন বলে সে মনে করে।

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. নদীতে পানির প্রবাহ কম থাকে কখন? ১
খ. উন্নয়নশীল কার্যক্রম কীভাবে পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়? ২
গ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যগুলোর আলোকে কুলসুমের এলাকায় সরকারের করণীয় ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় ও জাতীয় কমিটিগুলো কীভাবে কাজ করলে কুলসুমের প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানির প্রবাহ কম থাকে।

খ উন্নয়নশীল কার্যক্রম পরিবেশের বাইরে নয়। আর স্বাভাবিক পরিবেশ সবার কাম্য। এ বিবেচনায় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত।

উন্নয়নমূলক কাঠামো নির্মাণের সময় পরিবেশের অবস্থা বিবেচনায় নিতে হয়। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যাবলি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এজন্য উন্নয়নশীল কার্যক্রম পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

গ কুলসুমদের এলাকা বন্যাকবলিত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যগুলোর আলোকে কুলসুমদের বন্যাকবলিত এলাকায় সরকারের করণীয় দায়িত্বের পর্যায়ে পড়ে।

সরকারের উচিৎ জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি হ্রাস করতে দুর্যোগকালীন নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের জন্য কুলসুমদের এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ। এছাড়া বন্যা প্রতিরোধের জন্য বাঁধ নির্মাণ ও সামাজিক বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ করা সরকারের দায়িত্ব। পরিকল্পিত পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং উক্ত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে সকল প্রকার ত্রাণ পৌঁছানো ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা সরকারেরই কাজ।

বন্যায় উক্ত এলাকার যে সকল সম্পদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ইত্যাদির ক্ষতি হয়েছে তা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে এ এলাকার জনগণকে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সরকারের কর্তব্য ।

ঘ উদ্দীপকে কুলসুমদের প্রত্যাশা বন্যাকবলিত এলাকার লোকবল দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে।

কুলসুমদের বন্যাকবলিত এলাকার মানুষদের জীবনযাত্রার বিপর্যয়কর অবস্থা দূর করতে নানামুখী সহায়তার প্রয়োজন। এজন্য এদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় ও জাতীয় কমিটিগুলো কাজ করেছে।

উল্লিখিত কমিটিগুলো তৎপরতা চালায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার করতে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাদ্য, পানীয়, ঔষধ ও সেবা প্রদান করে। ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান করে। প্রয়োজনে বিদেশি সাহায্য-সহযোগিতার ব্যবস্থা করে। ক্ষতিগ্রস্তদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে। ক্ষতিগ্রস্তরা ঋণগ্রস্ত থাকলে ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা করে।

উপরোক্ত কাজগুলো করার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় ও জাতীয় কমিটিগুলো কুলসুমদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ কুয়াকাটার কলাপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তার এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধে বিভিন্ন অবকাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি জানেন এর মাধ্যমেও দুর্যোগ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই তিনি দুর্যোগের পরপর উপযুক্ত সাড়াদানের জন্য একটি দল গঠন করেন। ◀ *পিছনফল: ৪*

ক. দূষণ কী? ১
খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য কী কী? ২
গ. চেয়ারম্যান সাহেব প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চেয়ারম্যান সাহেবের তৈরিকৃত দলটির কার্যক্রম আলোচনা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের যেকোনো পরিবর্তন হলো দূষণ। যেমন- পানি দূষণ।

খ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য তিনটি। এ তিনটি উদ্দেশ্য হচ্ছে–

i. প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের যে ক্ষতি হয় তা এড়ানো বা ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা।
ii. অল্প সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে সকল প্রকার ত্রাণ পৌঁছানো ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।
iii. দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা।

গ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে অবকাঠামোগত ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হলেও অধিক কার্যকর। উদ্দীপকে চেয়ারম্যান সাহেব এ ধরনের ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছেন।

চেয়ারম্যান সাহেব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় অবকাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুতরাং তার গৃহীত ব্যবস্থাদি হতে পারে:

বেড়িবাঁধ নির্মাণ: সাধারণত নদী ও উপকূলবর্তী এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে বেশি পতিত হয়। তাই উপকূলবর্তী জনগণ, সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষার জন্য বেড়িবাঁধ নির্মাণ করে দুর্যোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ: দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে সাধারণত ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে স্থায়ীভাবে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় নেই। তাই দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে এসব এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে দুর্যোগ প্রতিরোধে সহায়তা করা যায়।

ঘরবাড়ি নির্মাণ পদ্ধতি: ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে যে রকম বাড়ি তৈরি করা হবে বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় তেমন বাড়ি তৈরি করা সঠিক হবে না। তাই ঘরবাড়ি নির্মাণ পদ্ধতি অবলম্বন করে দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

উপরোক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে চেয়ারম্যান সাহেব সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে না পারলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমাতে পারবেন।

ঘ চেয়ারম্যান সাহেবের তৈরিকৃত দলটি দুর্যোগের পরপরই উপযুক্ত সাড়াদান কার্যক্রমে অংশ নেয়।
দুর্যোগের পরপরই উপযুক্ত সাড়াদানের প্রয়োজন হয়। সাড়াদান কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হলে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়। দুর্যোগ মোকাবিলার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।
সাড়াদানের কার্যক্রমগুলো হলো:
অপসারণ: দুর্যোগের পরপরই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সম্পদ, জীবজন্তু ও মানুষের বিভিন্ন সাহায্যের প্রয়োজন হয়। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর একটি অন্যতম সাড়াদান কার্যক্রম।
তল্লাশি ও উদ্ধার তৎপরতা: সাড়াদান প্রক্রিয়াতে মানুষ ও জীবজন্তু তল্লাশি করা হয়। বিপদগ্রস্ত মানুষ বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থলের খোঁজ না পেলে স্বেচ্ছাসেবক দল তল্লাশি চালিয়ে তাদেরকে একত্রিত করে। অনেক সময় মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় নিজ বাড়ির চালে বা ছাদে অথবা গাছে অবস্থান করে। এসব বিপদ থেকে উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে আনা হয়।
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ: প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সাড়াদান কার্যক্রমে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। এতে কী পরিমাণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কত, কী পরিমাণ জীবজন্তু মারা গেছে, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত ইত্যাদি নিরূপণ করে তার তালিকা প্রস্তুত করা হয়।
ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম: প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ সাড়াদান প্রক্রিয়া। এই কার্যক্রমে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার নির্দিষ্ট একটি স্থান থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হয় এবং পুনর্বাসনের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶১৬ নারায়ণগঞ্জে অনেক ধরনের শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব কারখানার মালামাল পরিবহনে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ব্যবহৃত হয়। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে কোন স্তর? ১
খ. ইটের ভাটা কীভাবে বায়ু দূষণ ঘটায়? ২
গ. নারায়ণগঞ্জে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে ওজোন স্তর।

খ ইটের ভাটা ধোঁয়া নির্গমনের মাধ্যমে বায়ু দূষণ ঘটায়।
ইট পোড়ানোর জন্য অবাধে বৃক্ষ নিধন করে ইটের ভাটায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে কয়লাও ব্যবহৃত হয়। এ সকল ইটের ভাটা থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হয়ে বায়ু দূষিত হয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বায়ু দূষণজনিত সমস্যা ব্যাখ্যা করো।

ঘ বায়ু দূষণ প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে- বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶১৭ বাড়তি জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশে শিল্প-কারখানা এবং চলাচলের জন্য অতিরিক্ত যানবাহনের প্রয়োজন হচ্ছে। যা পরিবেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. দূষক কী? ১
খ. মানবস্বাস্থ্যের ওপর শব্দ দূষণের প্রভাব বর্ণনা কর। ২
গ. বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট পরিবেশকে কেন হুমকির সম্মুখীন করছে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত পরিবেশ অনুকূলে রাখতে আমরা কী কী পদক্ষেপ নিতে পারি? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব উপাদানের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয় তাকে দূষক বলে। যেমন– CO_2, CO_2।

খ মানব স্বাস্থ্যের ওপর শব্দ দূষণের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে।
দূষণের ফলে শ্রবণেন্দ্রীয় অকেজো হওয়া, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া, স্নায়ুতন্ত্রের ওপর চাপ পড়ে অনিদ্রা এবং নানা প্রকার স্নায়ুরোগের সৃষ্টি হয়। এছাড়া উচ্চ শব্দের কারণে কলকারখানার আশপাশের স্থায়ী বাসিন্দার শিশু সন্তানদের কম বেশি বধির হতে দেখা যায়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বাংলাদেশে বায়ু দূষণের ফলাফল ব্যাখ্যা করো।

ঘ বায়ু দূষণ প্রতিরোধের উপায় বিশ্লেষণ করো।

দশম অধ্যায়
মানচিত্র অভিক্ষেপ

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১

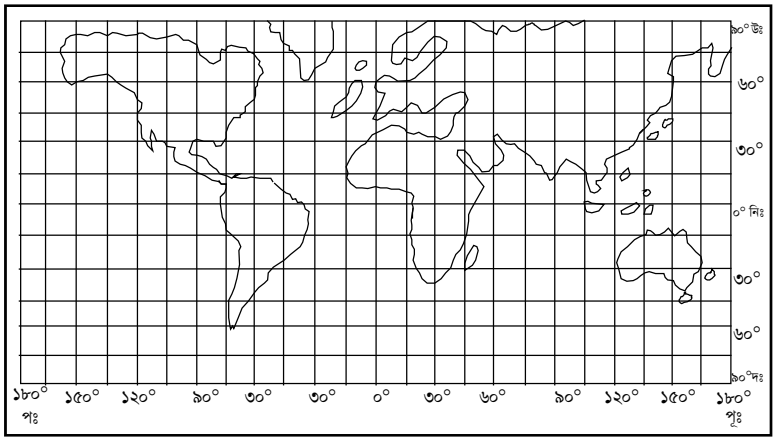

◀ শিখনফল: ১

ক. অচিত্রানুপাত অভিক্ষেপ কাকে বলে? ১
খ. কীভাবে বিভিন্ন প্রকার অভিক্ষেপের উদ্ভব হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের অভিক্ষেপটির অংকন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের অভিক্ষেপের যে কোনো তিনটি ধরন বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অভিক্ষেপে কোনো আলোকপাত না করে শুধু গাণিতিক হিসেবে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে ছক তৈরি করা হয় তাকে অচিত্রানুপাত অভিক্ষেপ (Non Perspective projective) বলে।

খ ভূগোলকের চারপার্শ্বের অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলোকে কীভাবে সমতল ক্ষেত্রের উপর স্থানান্তর করা যায় তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করে কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন। এ উপায় বা পদ্ধতিগুলোর ভিন্নতার উপর নির্ভর করেই বিভিন্ন প্রকার অভিক্ষেপের উদ্ভব হয়েছে।

গ উদ্দীপকের অভিক্ষেপটি বেলনাকার অভিক্ষেপ।
ভূগোলকের উপর বেলনাকার কাগজ বা অন্য কোনো বস্তু বসিয়ে কেন্দ্র থেকে আলোক বিচ্ছুরণ করলে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলো তার উপর দেখা যায়। এ অবস্থার চিত্র অঙ্কন করলে বেলনাকার অভিক্ষেপ পাওয়া যায়।
বেলনাকার অভিক্ষেপ অঙ্কন করা খুব সহজ। এতে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলো সমদূরবর্তী বলে এর অপর নাম সমদূরবর্তী বেলন অভিক্ষেপ। এ অভিক্ষেপের ছক বা গ্র্যাটিকুলে দ্রাঘিমারেখাগুলো অক্ষরেখাগুলোকে সমকোণে ছেদ করে। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলোর মধ্যবর্তী ব্যবধান সমান হওয়ায় গ্র্যাটিকুল সমান বর্গক্ষেত্রের সমষ্টিতে পরিণত হয়। অভিক্ষেপটিতে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার উপরে স্কেল নির্ভুল থাকে। তবে এ অভিক্ষেপে উচ্চ অক্ষাংশের দেশগুলোর আকৃতি বিকৃত হয় এবং অভিক্ষেপটি সমআয়নিক হয় না।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত অভিক্ষেপটি হলো বেলনাকার অভিক্ষেপ।
বেলনাকার অভিক্ষেপের মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য ধরন হলো- ১. প্রকৃত বেলন অভিক্ষেপ, ২. সরল বেলন অভিক্ষেপ ও ৩. সমআয়তনিক বেলনাকার অভিক্ষেপ।
নিম্নে এ অভিক্ষেপগুলোর ধরণ তুলে ধরা হলো–

প্রকৃত বেলন অভিক্ষেপ:
i. এ অভিক্ষেপে অক্ষ ও দ্রাঘিমারেখাগুলো সরল রেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয়; ii. অক্ষ ও দ্রাঘিমারেখাগুলো পরস্পর সমকোণে ছেদ করে; iii. সকল অক্ষাংশেই দ্রাঘিমারেখাগুলো সমদূরবর্তী; iv. অক্ষরেখাগুলো নিরক্ষরেখার সমান কিন্তু সমদূরবর্তী নয়; v. পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ উভয় দিকে ভূমির প্রকৃত দূরত্ব বিভিন্ন পরিমাণে বেড়ে গিয়ে আয়তন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় এবং আকৃতি বিকৃত হয়।

সরল বেলন অভিক্ষেপ:

i. এ অভিক্ষেপে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলো সরলরেখায় অঙ্কিত। ii. অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলোর ব্যবধান সমান। iii. দ্রাঘিমারেখাগুলো অক্ষরেখাগুলোকে সমকোণে ছেদ করে। iv. নিরক্ষরেখায় স্কেল নির্ভুল। v. দ্রাঘিমারেখার স্কেল নির্ভুল। vi. নিরক্ষরেখা থেকে দূরবর্তী স্থানে অক্ষরেখার স্কেল বর্ধিত হওয়ায় উচ্চ অক্ষাংশের দেশগুলোর আকৃতি বিকৃত হয়ে যায়। vii. অভিক্ষেপটি সম-আয়তনিক নয়।

সমআয়তনিক বেলন অভিক্ষেপ:

i. এটি একটি সম-আয়তনিক বেলন অভিক্ষেপ। ii. অক্ষ ও দ্রাঘিমারেখাগুলো সরল এবং পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে। iii. নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে অক্ষরেখাগুলোর ব্যবধান ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর হ্রাস পায়। iv. এ অভিক্ষেপে সকল অক্ষরেখার দৈর্ঘ্য নিরক্ষরেখার সমান। v. নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে উচ্চ অক্ষাংশের দেশগুলোর আকৃতি ক্রমশ বিকৃত হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, বেলন অভিক্ষেপের সুবিধা-অসুবিধা উভয়ই আছে। বস্তুত বিভিন্ন ধরনের বেলন অভিক্ষেপ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এক একটি নির্দিষ্ট স্থানের জন্য সুবিধাজনক। যেমন : সমআয়তনিক বেলন অভিক্ষেপ ক্রান্তীয় অঞ্চলে চালের বণ্টন দেখাতে ব্যবহৃত হয়।

উল্লেখ্য বেলনাকার অভিক্ষেপের উপরিউক্ত ৩টি ভাগ ছাড়াও মার্কেটরের অভিক্ষেপ ও গলের অভিক্ষেপ নামে আরো ২টি অভিক্ষেপ রয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ ভূগোল ব্যবহারিক ক্লাসে শিক্ষক সরল বেলনাকার অভিক্ষেপের বিভিন্ন সুবিধা, অসুবিধা পড়ানোর পর এর অঙ্কন পদ্ধতি শেখালেন এবং শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ হিসেবে প্রতিভূ অনুপাত ১ঃ২৫০,০০০,০০০ এর সাহায্যে ১৫° অন্তর ব্যবধান দেখিয়ে অভিক্ষেপে মানচিত্রাঙ্কন করে আনতে বললেন। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. Zenithal projection এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? ১

খ. অভিক্ষেপ বলতে কী বোঝ? ২

গ. শিক্ষকের বাড়ির কাজ দেয়া প্রতিভূ অনুপাত দ্বারা উদ্দীপকে আলোচিত একটি অভিক্ষেপ অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিভূ অনুপাতের দ্বারা অঙ্কিত অভিক্ষেপের অঙ্কন পদ্ধতিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Zenithal projection এর বাংলা প্রতিশব্দ শীর্ষদেশীয় অভিক্ষেপ।

খ মানচিত্র অভিক্ষেপ বলতে কোনো সমতলের উপর সৃষ্ট গ্রাটিকুলকে (graticule) বুঝায়।

কোনো সমতল কাগজের উপর সমগ্র পৃথিবী বা এর কোনো অংশের মানচিত্র অঙ্কন করার জন্য নির্দিষ্ট স্কেলে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলো জালের ন্যায় ছকে প্রকাশ করা হয়। একে অভিক্ষেপ বলে।

গ শিক্ষকের বাড়ির কাজ দেয়া প্রতিভূ অনুপাত ১ঃ২৫০,০০০,০০০।

উদ্দীপকে আলোচিত একটি সরল বেলনাকার অভিক্ষেপ নিচে উক্ত স্কেলে অঙ্কন করা হলো —

যেহেতু প্র. অ. ১ ঃ ২৫০,০০০,০০০″

আমরা জানি, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ = ২৫০,০০০,০০০″

$$\text{সূত্র} = \frac{\text{পৃথিবীর ব্যাসার্ধ}}{\text{প্রদত্ত স্কেল}}$$

মানচিত্রের ১″ = ভূপৃষ্ঠের ২৫০,০০০,০০০″

অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের ২৫০,০০০,০০০″ = মানচিত্রের ১″

$$\therefore \quad ,, \quad ১'' \quad = \quad ,, \quad \frac{১}{২৫০,০০০,০০০}$$

$$\therefore \quad ,, \quad ২৫০,০০০,০০০'' = \frac{২৫০,০০০,০০০}{২৫০,০০০,০০০} = ১''$$

অতএব সঙ্কুচিত পৃথিবীর ব্যাসার্ধ = ১ ইঞ্চি

নিরক্ষরেখার দৈর্ঘ্য $= 2\pi r \left[\therefore \pi = \frac{২২}{৭} = ৩.১৪\right]$

$= ২ \times ৩.১৪ \times ১'' \quad [r = \text{পৃথিবীর ব্যাসার্ধ} = ১'']$

$= ৬.২৮''$

যেহেতু ৩৬০° = ৬.২৮″

$$\therefore \quad ১^\circ = \frac{৬.২৮}{৩৬০}$$

$$\therefore \quad ১৫^\circ = \frac{৬.২৮ \times ১৫''}{৩৬০} = ০.২৬''$$

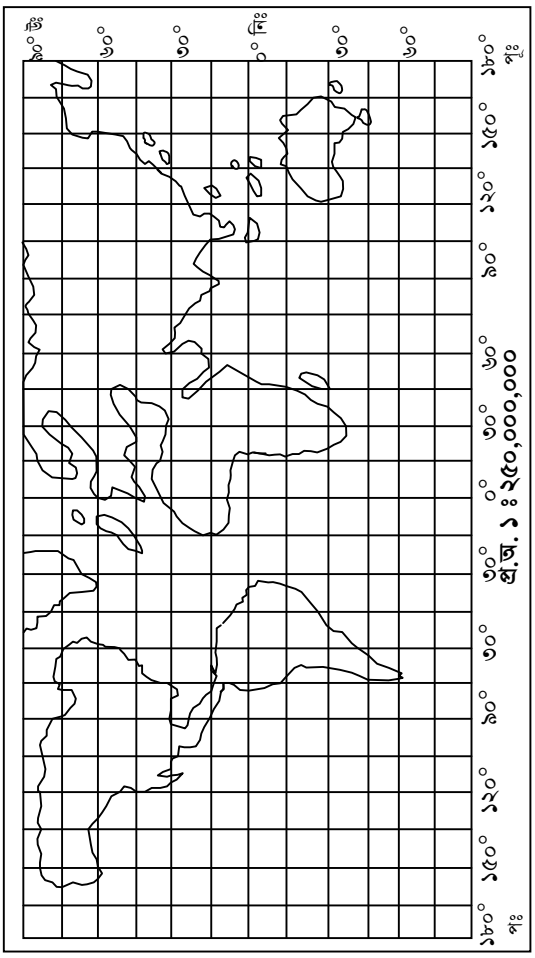

ঘ বেলনাকার অভিক্ষেপ অঙ্কন খুবই সহজ। চিত্র থেকে তা স্পষ্ট।

উদ্দীপকের প্রতিভূ অনুপাত ১ ঃ ২৫০,০০০,০০০ দ্বারা অঙ্কিত সরল বেলনাকার অভিক্ষেপটির অঙ্কন পদ্ধতি নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো–

অঙ্কন করার পদ্ধতি: প্রথমে ৬.২৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটি নিরক্ষরেখা নিয়ে তার দুই প্রান্তে সমকোণে দুটি রেখা অঙ্কন করা হলো। নিরক্ষরেখা থেকে রেখা দুটি বরাবর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ০.২৬″ মাপ নিয়ে ১৫°, ৩০°, ৪৫°, ৬০°, ৭৫°, ৯০° অক্ষরেখার অবস্থান চিহ্নিত করে রেখাগুলোর ডান ও বামে যুক্ত করে রেখা অঙ্কন করলে অক্ষরেখাগুলো পাওয়া যায়। এরপর নিরক্ষরেখাকে সমান দু'ভাগে বিভক্ত করে মূল মধ্যরেখা (০°) দেখিয়ে এবং তার ডান ও বাম দিকের অংশকে যথাক্রমে ১২ ভাগে বিভক্ত করে খাড়াভাবে সরলরেখা অঙ্কন করে দ্রাঘিমারেখাগুলো অঙ্কন করা হলো। সবশেষে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সংখ্যাগুলো লেখা হয়েছে। চিত্রটির নিচে প্রঃ অঃ ১ ঃ ২৫০,০০০,০০০ ও লিখতে হবে। তারপর চিত্রের উপরে সুন্দর করে অভিক্ষেপটির নাম লেখা হয়েছে এবং উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম দিক লেখা হয়েছে।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারি সরল বেলনাকার অভিক্ষেপ আঁকা সহজ। তবে এর ব্যবহার উপযোগিতা কম।

প্রশ্ন ▶৩ নাহিদা দ্বাদশ শ্রেণির একজন ছাত্রী। ভূগোল ব্যবহারিক ক্লাসে সে জানল যে, ভূগোলকের ওপর অঙ্কিত উত্তর গোলার্ধের অক্ষরেখাগুলো সর্বদা উপরের দিকে বাঁকা থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে অক্ষরেখাগুলো নিচের দিকে বাঁকা থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অভিক্ষেপ উচ্চ ও নিম্ন অক্ষাংশের স্থানগুলো অঙ্কনে ব্যবহৃত হয়।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. শাঙ্কব অভিক্ষেপ কী? ১

খ. শাঙ্কব অভিক্ষেপের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো। ২

গ. শাঙ্কব অভিক্ষেপের সুবিধা-অসুবিধা ও ব্যবহার উল্লেখ করো। ৩

ঘ. ১: ১২৫,০০০,০০০ স্কেলে এবং ৪৫° পরিমিত অক্ষরেখা ধরে ১৫° ব্যবধানে একটি শাঙ্কব অভিক্ষেপ অঙ্কন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক খণ্ড কাগজকে মোচক বা শঙ্কু আকারে ভূগোলকের উপরে স্থাপন করে যে অভিক্ষেপ অঙ্কন করা হয় তাই শাঙ্কব অভিক্ষেপ।

খ এক খণ্ড কাগজকে শঙ্কু বা মোচক আকারে ভূগোলকের উপর স্থাপন করে শাঙ্কব অভিক্ষেপ অঙ্কন করা হয়।

শাঙ্কব অভিক্ষেপের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভূগোলকের ওপর স্থাপিত শাঙ্কবটি নির্দিষ্ট অক্ষরেখাকে স্পর্শ করে। শাঙ্কবটি ভূগোলকের যে নির্দিষ্ট অক্ষরেখার ওপর স্থাপন করা হয় তাকে পরিমিত অক্ষরেখা ধরা হয়। এই রেখার ওপর দিয়ে নির্দিষ্ট ব্যবধানে দ্রাঘিমারেখাগুলো অঙ্কিত হয়।

গ শাঙ্কব অভিক্ষেপটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক হলেও এর কিছু সুবিধা রয়েছে এবং সমগ্র পৃথিবীর মানচিত্র সঠিকভাবে না দেখানো গেলেও মধ্য অক্ষাংশের দেশগুলোর জন্য এই অভিক্ষেপের ব্যবহার সুবিধাজনক।

শাঙ্কব অভিক্ষেপের সুবিধা

i. এই অভিক্ষেপের অক্ষরেখাগুলো সমকেন্দ্রিক বৃত্ত।

ii. অঙ্কন হিসেবে দ্রাঘিমার দূরত্বের স্কেল নির্ভুল।

iii. পরিমিত অক্ষরেখার দূরত্বের স্কেল নির্ভুলরূপে দেখানো হয়।

iv. পরিমিত অক্ষরেখার উভয় পাশে স্বল্প পরিসর স্থানের আকৃতি সঠিক হয়।

শাঙ্কব অভিক্ষেপের অসুবিধা

i. পরিমিত অক্ষরেখার দূরত্বের স্কেল নির্ভুল হলেও অন্যান্য অক্ষরেখায় নির্ভুল নয়।

ii. সসীম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রেখা দ্বারা মেরু নির্দেশিত হয়। ফলে এটি অক্ষরেখাগুলোর কেন্দ্র থেকে আলাদা।

iii. পরিমিত অক্ষরেখা থেকে দূরবর্তী স্থানের পূর্ব পশ্চিম বিস্তৃতির বিকৃতি লক্ষ করা যায়। এর ফলে স্থানটির আয়তন সঠিক হয় না।

শাঙ্কব অভিক্ষেপের ব্যবহার

i. পরিমিত অক্ষরেখার উভয় পাশে স্বল্প পরিসর স্থানের আয়তন নির্ভুল বলে এ অভিক্ষেপটি কেবলমাত্র সেসব দেশের জন্য উপযুক্ত যে দেশগুলো পূর্ব-পশ্চিমে বেশি এবং উত্তর-দক্ষিণে কম বিস্তৃত।

ii. মধ্য অক্ষাংশে বা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকারে অঙ্কনের জন্য এ অভিক্ষেপ উপযোগী।

ঘ এক খণ্ড কাগজকে শঙ্কু বা মোচক আকারে ভূগোলকের উপর স্থাপন করে শাঙ্কব অভিক্ষেপ অঙ্কন করা হয়।

উল্লিখিত স্কেল অনুসারে নিচে একটি শাঙ্কব অভিক্ষেপ অঙ্কন করা হলো:

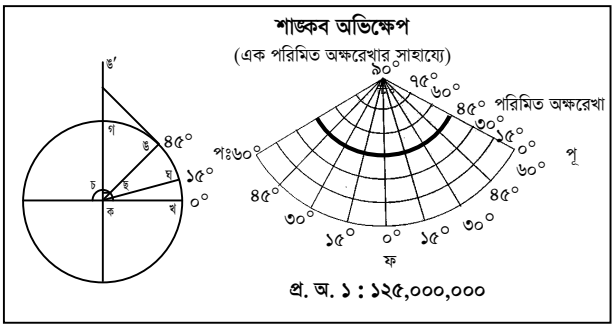

চিত্র : শাঙ্কব অভিক্ষেপ (আনুপাতিক)

সমাধান:

সূত্রানুসারে, ভূগোলকের ব্যাসার্ধ $= \frac{\text{পৃথিবীর প্রকৃত ব্যাসার্ধ}}{\text{প্রদত্ত প্র:অ: এর হর রাশি}}$

$= \frac{২৫০,০০০,০০০}{১২৫,০০০,০০০} = ২''$

ভূগোলকের পরিধি বা নিরক্ষরেখার দৈর্ঘ্য $= ২\pi r$

$$= ২\times \frac{২২}{৭} \times ২$$

$$= \frac{৮৮}{৭}$$

$$= ১২.৫৭''$$

১৫° ব্যবধানের জন্য চাপ দূরত্ব $= \frac{১২.৫৭\times ১৫^\circ}{৩৬০^\circ}$

$$= ০.৫২''।$$

চিত্রে মোটা দাগের ৪৫° অক্ষরেখাটি পরিমিত অক্ষরেখা।

প্রশ্ন ▶ ৪ ভূগোল শিক্ষক জনাব মুজিবুর রহমান পাটোয়ারী ছাত্রদের বলেন যে, একটি মোচকে বা শংকুকে ভূগোলকের উপর স্থাপন করে অক্ষরেখা বা দ্রাঘিমারেখা প্রক্ষেপ করবে এবং পরে মোচকটিকে ভূমি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত একটি সরলরেখা বরাবর কেটে খুলে সমতল করবে। এভাবে তোমরা যে অভিক্ষেপ পাবে তাকে শাঙ্কব অভিক্ষেপ বলে। তারপর তিনি বলেন, প্রতিভূ অনুপাত (R.F.) ১ ঃ ১৬৭,০০০,০০০ এর সাহায্যে ৪৫° পরিমিত অক্ষরেখা ধরে ১৫° অন্তর অন্তর অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা অঙ্কন করে একটি সরল শাঙ্কব অভিক্ষেপ অঙ্কন করো। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. অদৃশ্যানুগ অভিক্ষেপ কী? ১

খ. সরল বেলন অভিক্ষেপ কীভাবে আঁকতে হয়? ২

গ. উদ্দীপকে শিক্ষক জনাব মুজিবুর রহমান পাটোয়ারীর নির্দেশমতো অভিক্ষেপ অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শিক্ষকের নির্দেশমতো তোমার অঙ্কিত অভিক্ষেপের অঙ্কনপদ্ধতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অভিক্ষেপে কোনো আলোকসম্পাত না করে শুধু গাণিতিক হিসাবের সাহায্যে গ্রাটিকুল গুলো তৈরি ও অঙ্কন করা হয় তাই অদৃশ্যানুগ অভিক্ষেপ।

খ সরল বেলন অভিক্ষেপ একটি আলোকসম্পাতবিহীন অভিক্ষেপ। এ অভিক্ষেপ অঙ্কনপদ্ধতি সহজ। এতে কল্পনা করা হয় যে, বেলন বা নলটি পৃথিবীকে নিরক্ষরেখা বরাবর স্পর্শ করে আছে। নলটিকে এর অক্ষরেখা বরাবর কেটে বিছিয়ে ধরলে নিরক্ষরেখার দৈর্ঘ্য নলের দৈর্ঘ্যের সমান হবে এবং বৃত্তাকার নিরক্ষরেখা সরলরেখায় রূপান্তরিত হবে। এ অভিক্ষেপে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলো পরস্পর সমান দূরত্বে অবস্থান করে।

গ উদ্দীপকের শিক্ষক জনাব মুজিবুর রহমান পাটোয়ারীর নির্দেশমতো একটি সরল শাঙ্কব অভিক্ষেপ অঙ্কন করা হলো—

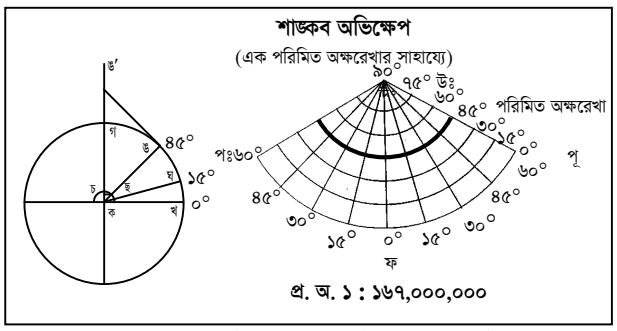

চিত্র : শাঙ্কব অভিক্ষেপ (আনুপাতিক)

সমাধান:

সূত্রানুসারে, ভূগোলকের ব্যাসার্ধ $= \frac{\text{পৃথিবীর প্রকৃত ব্যাসার্ধ}}{\text{প্রদত্ত প্র:অ: এর হর রাশি}}$

$$= \frac{২৫০,০০০,০০০}{১২৫,০০০,০০০} = ২''$$

ভূগোলকের পরিধি বা নিরক্ষরেখার দৈর্ঘ্য $= ২\pi r = ২\times \frac{২২}{৭} \times ২$

$$= \frac{৮৮}{৭}$$

$$= ১২.৫৭''$$

১৫° ব্যবধানের জন্য চাপ দূরত্ব $= \frac{১২.৫৭\times ১৫^\circ}{৩৬০^\circ}$

$$= ০.৫২''।$$

চিত্রে মোটা দাগের ৪৫° অক্ষরেখাটি পরিমিত অক্ষরেখা।

ঘ **অঙ্কন: প্রথম চিত্র:** ১.৫″ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন করে বিষুবরেখা 'কখ' অঙ্কন করা হলো। বৃত্তের কেন্দ্র ক। এবার ∠ঙকখ = ৪৫° পরিমিত অক্ষরেখা ও ∠ঘকখ = ১৫° দ্রাঘিমার ব্যবধান চিহ্নিত হলো। এছাড়া ∠গকখ = ৯০° চিহ্নিত হয়েছে। এখন বৃত্তের ৪৫° পরিমিত অক্ষরেখার সাথে সমকোণে একটি 'ঙঙ' স্পর্শক অঙ্কন করতে হবে। এরপর ১৫° ব্যবধানে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে একটি অর্ধবৃত্ত চাপ অঙ্কন করতে হবে যা ৪৫° পরিমিত অক্ষরেখাকে 'ছ' বিন্দুতে ছেদ করে। উক্ত ছেদবিন্দু হতে 'কগ' রেখার সাথে বিষুব রেখার সমান্তরাল করে একটি রেখা 'চছ' অঙ্কন করতে হবে।

দ্বিতীয় চিত্র: একটি উল্লম্ব রেখা অঙ্কন করতে হবে। এটা অভিক্ষেপের মধ্য দ্রাঘিমা হিসেবে পরিচিত। উল্লম্ব রেখার শীর্ষবিন্দু কে কেন্দ্র করে ১ম চিত্রের 'ঙঙ' স্পর্শকের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করতে হবে। উক্ত বৃত্তচাপের ওপর 'চছ' এর সমান ব্যবধান নিয়ে মূল দ্রাঘিমার উভয় পাশে বিন্দু চিহ্নিত করতে হবে। ১৫° ব্যবধানে (খঘ) দ্বিতীয় চিত্রে মধ্য দ্রাঘিমারেখায় ৪৫° পরিমিত অক্ষরেখার বৃত্তচাপের ওপরে পরপর দুইটি বৃত্তচাপ ও নিচে পরপর তিনটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করতে হবে। ৪৫° পরিমিত অক্ষরেখার বৃত্তচাপের ওপর চিহ্নিত বিন্দুগুলো 'প' শীর্ষ বিন্দুর সাথে যোগ করে দ্রাঘিমারেখাগুলোর মান চিহ্নিত করা যায়। সবশেষে অক্ষরেখা চিহ্নিত করতে বৃত্তচাপগুলোর মান যথাক্রমে ০°, ১৫°, ৩০°, ৪৫°, ৬০°, ৭৫° এবং দ্রাঘিমা রেখাগুলোর মান যথাক্রমে ০°, ১৫°, ৩০°, ৪৫° ৬০° লিখতে হয়। দুইটি চিত্রের নিচের মাঝামাঝিতে প্র. অ. ১: ১৬৭,০০০,০০০ লিখতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫ ভূগোল শিক্ষক উত্তম শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আরও একবার বোঝাতে চেয়েছে জিআইএস ব্যবহারে আজকাল তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সব উপাত্ত অতি সহজেই পাওয়া যায়। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. জিআইএস কী? ১

খ. জিআইএস এর উপাত্ত কয়ভাগে ভাগ করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জিআইএস উপাত্ত কীভাবে ব্যবহার করা হয়? ৩

ঘ. জিআইএস এর দৃষ্টিভঙ্গি তোমার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভৌগোলিক তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থাই জিআইএস।

খ জিআইএস এক বিশাল তথ্যভাণ্ডার যা ভৌগোলিক উপাত্ত থেকে প্রাপ্ত।

জিআইএস (GIS) এর উপাত্ত দুইভাগে ভাগ করা হয়। যেমন– ১. স্থানিক: ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত; ২. অস্থানিক: স্থানিক তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত।

গ GIS এর তথ্য ও উপাত্ত সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়।

ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরি করে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন, জনসংখ্যার মানচিত্র তৈরি করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করা, পরীক্ষিত ও যানজটমুক্ত সড়ক মানচিত্র তৈরি প্রভৃতি জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হচ্ছে।

GIS প্রযুক্তির প্রথমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করার পরে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে মানচিত্রে উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর সফটওয়্যারের মাধ্যমে জিআইএস ডাটাবেজ গড়ে তোলা হয়। আর এই ডাটাবেজ থেকে তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে একজন পরিকল্পনাবিদ খুব সহজেই নিজের এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। এভাবে জিআইএস এ প্রয়োজন অনুসারে উপাত্ত ব্যবহার করা হয়।

ঘ জিআইএস এর দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্তিকে আশ্রয় করে ব্যাপক রূপ লাভ করেছে। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কলাকৌশল ব্যবহার করছে; এ প্রেক্ষাপটেই GIS এর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে।

জিআইএস প্রযুক্তির উদ্দেশ্য ব্যাপক, দৃষ্টিভঙ্গিও তাই বিস্তৃত। জিআইএস প্রযুক্তির উদ্দেশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের স্থানিক ও অস্থানিক তথ্য উপাত্ত মানচিত্রে উপস্থাপন করে একটি মডেল তৈরি করা। যেমন : ভূগোলের পঠন ও পাঠনে জিআইএস প্রযুক্তি যুক্ত হয়েছে যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্থানিক পার্থক্য অনুসন্ধান করা এবং মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা। সুতরাং GIS প্রযুক্তি ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে।

জিআইএস প্রযুক্তিতে ব্যবহারকারীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রযুক্তিটির দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে বন্ধুভাবাপন্ন (user friendly)।

মোটকথা জিআইএস প্রযুক্তির সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে সরবরাহকৃত তথ্য উপাত্ত নিয়ে একটি ডাটাবেজ গড়ে তোলে এবং প্রত্যাশিত ফলাফল উপস্থাপন করে। এ প্রেক্ষিতেই জিআইএস-এর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ 'আধুনিক প্রযুক্তিতে মানচিত্রাঙ্কন' বিষয়ক একটি সেমিনারে একজন ভূগোলবিদ বললেন, কম্পিউটারের কিছু বিশেষ সফট্ওয়্যারসমূহ ভূমি জরিপ, আকাশ থেকে গৃহীত আলোকচিত্র, ভৌগোলিক বিষয়াদি বিশ্লেষণে ব্যবহার করা যায়।

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. গ্রাটিকুল কী? ১

খ. বেলনাকার অভিক্ষেপ বলতে কী বোঝ? ২

গ. ভূগোলবিদের বলা বিশেষ সফট্ওয়্যারসমূহের কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ভূগোলবিদের বলা বিশেষ সফট্ওয়্যারসমূহের প্রয়োজনীয়তা নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভিক্ষেপ প্রধানত তিন প্রকার।

খ একটি ভূগোলক কোনো বেলন বা নলের মধ্যে স্থাপন করে বেলনের উপর ভূগোলকের ছায়া প্রতিফলিত করে যে অভিক্ষেপ অঙ্কন করা হয় তাকে বেলনাকার অভিক্ষেপ বলে।

বেলনাকার অভিক্ষেপ নিরক্ষীয় অঞ্চলের স্বল্প পরিসর স্থানের মানচিত্র অঙ্কনে ব্যবহৃত হয়।

গ ভূগোলবিদের বলা বিশেষ সফট্ওয়্যারটি হলো জিআইএস।

জিআইএস কর্মপদ্ধতিকে চারটি ধাপে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। সেগুলো হলো— ১. উপাত্ত সংগ্রহ, ২. উপাত্ত মজুদকরণ, ৩. উপাত্ত ব্যবহার ও ৪. ফলাফল।

১. উপাত্ত সরবরাহ : উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবর্তন, পরীক্ষণ, পরিমার্জন করে থাকে।

২. উপাত্ত মজুদকরণ দ্বিতীয় পর্যায়ে GIS উপাত্ত মজুদকরণ করে। এক্ষেত্রে সাময়িক মজুদকরণ ও তুলনামূলক স্থায়ী মজুদকরণ করে থাকে।

৩. দক্ষতা সহকারে উপাত্ত ব্যবহার : মানচিত্র অঙ্কন সম্পর্কিত কাজ, উপাত্ত একত্রীকরণ, কাঠামোগত পরিমাপ, পারিসরিক বিশ্লেষণ, পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ এ পর্যায়ে করা হয়।

৪. ফলাফল: এ পর্যায়ে মানচিত্র অঙ্কন সম্পর্কিত কাজ করা হয়। বিভিন্ন উপাত্তগুলোকে একত্রীকরণ করা হয়। কাঠামোগত পরিমাপ ছাড়াও প্রয়োজন অনুসারে পারিসরিক ও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করা হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে উপাত্তসমূহের ব্যবহারযোগ্য উপস্থাপন করা হয়। ফলাফলস্বরূপ GIS মানচিত্র, স্তম্ভলেখ, সারণি প্রভৃতি প্রকাশ করে।

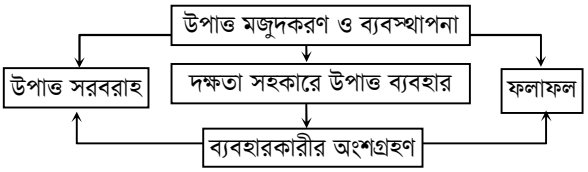

চিত্র: জিআইএস এর কর্মপদ্ধতি

পরিশেষে বলা যায়, জিআইএস মূলত একটি কম্পিউটারভিত্তিক পদ্ধতি। এটি এমন একটি সমন্বিত পদ্ধতি যার মাধ্যমে ভৌগোলিক তথ্যাদি সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা যায়।

ঘ ভূগোলবিদের বলা বিশেষ সফট্ওয়্যারটির নাম জিআইএস।

সমগ্র বিশ্বজুড়ে জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান যুগে GIS এর প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক।

ভূমির নকশা তৈরি করতে, নতুন করে মানচিত্র তৈরি করতে GIS প্রয়োজন। ভূমির সঠিকভাবে দূরত্ব পরিমাপ করতে, খনিজ সম্পদ

সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করতেও GIS প্রয়োগ করা হচ্ছে। মানচিত্র নির্ভুলভাবে তৈরি করার জন্য বর্তমানে GIS বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া মানচিত্রে বিভিন্ন স্থান সঠিকভাবে নির্দেশ করার জন্য, নগর পরিকল্পনার নকশা প্রণয়নে, রোড নেটওয়ার্ক সঠিকভাবে উপস্থাপনেও GIS এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশের উপর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রভাব বিশ্লেষণে GIS ব্যবহৃত হচ্ছে। পারিসরিক পরিবর্তন নির্ণয়েও GIS কাজে লাগছে। জলবায়ু সম্পর্কিত গবেষণাতেও জিআইএস ব্যবহৃত হচ্ছে।
এছাড়া ভূপৃষ্ঠের ওপর অবস্থিত যেকোনো বস্তুর মানচিত্র অঙ্কন, দূরত্ব, আয়তন, অবস্থান নির্ণয় ও বিশ্লেষণ এবং গবেষণায় জিআইএস এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৭ ১৯৮৬ সালের দিকে Arc Info সফট্ওয়্যারটি বাজারে আসে। এ সময় থেকে এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। এ সফট্ওয়্যারের বৈশিষ্ট্য হলো– কমান্ড লেখার মাধ্যমে এর বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে হয়। বর্তমানে এর চেয়েও অনেক উন্নত সংস্করণের সফট্ওয়্যার বাজারে এসেছে, যার মাধ্যমে আরও নিখুঁত পদ্ধতিতে মানচিত্রের কাজ করা যায়।

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. অভিক্ষেপ কী? ১
খ. বেলনাকার অভিক্ষেপের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ উল্লেখ করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি বাংলাদেশে প্রয়োগের ক্ষেত্রটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অগ্রগতিতে উদ্দীপকের বিষয়টির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমতল ক্ষেত্রের উপর পৃথিবী বা তার অংশবিশেষের মানচিত্র অঙ্কনের জন্য নির্দিষ্ট স্কেল ও পদ্ধতিতে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা দ্বারা সৃষ্ট জালের ন্যায় বিন্যস্ত ছকই হলো অভিক্ষেপ।

খ বেলনাকার অভিক্ষেপে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলোর সবই সরলরেখা।
রেখাগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল। দ্রাঘিমারেখাগুলো, অক্ষরেখাগুলোকে সমকোণে ছেদ করে। প্রত্যেকটি অক্ষরেখা নিরক্ষরেখার সমান বলে নিরক্ষরেখা থেকে উভয় মেরুর দিকে পূর্ব-পশ্চিমে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। নিরক্ষরেখার আশপাশের দেশসমূহ দেখানোর জন্য এ অভিক্ষেপ অধিক উপযোগী।

গ উদ্দীপকে GIS এর একটি সফট্ওয়্যার এর বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানে GIS বা ভৌগোলিক তথ্য সিস্টেমের মাধ্যমে Arc Info এর মতো বিভিন্ন সফট্ওয়্যার বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন ও তা বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ে প্রয়োগ করা হচ্ছে।
সফট্ওয়্যার ভৌগোলিক তথ্য সিস্টেমের চারটি উপাদানের মধ্যে একটি, যা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমন্বয় সাধনের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কনে কাজ করছে। Arc Info সফট্ওয়্যার GIS এর এমন একটি সফট্ওয়্যার যা বাংলাদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাত্ত ও মানচিত্র অঙ্কনে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলির সংরক্ষণ, উন্নয়ন, বিশ্লেষণ, প্রদর্শন ও বর্তমান সাপেক্ষে ভবিষ্যৎ অবস্থার অনুমান এবং পরিকল্পনা গ্রহণ কৌশল বা সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান জানা যায়। তাই বাংলাদেশের কৃষি, পরিবেশ, নগর উন্নয়নে বর্তমানে Arc Info GIS এর প্রয়োগক্ষেত্র উন্মোচিত।

ঘ বাংলাদেশের অগ্রগতিতে GIS সফট্ওয়্যারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
Arc Info এর মতো GIS সফট্ওয়্যারের ব্যবহার বাংলাদেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি জমির অবস্থান, উৎপাদন ও বর্তমান অবস্থা চিহ্নিতকরণে GIS ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় GIS সফট্ওয়্যার এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। দেশের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনায় GIS বর্তমানে অধিক গুরুত্বের সাথে ব্যবহার শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন ও পরিকল্পনায় GIS ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্রামের রাস্তাঘাট, কৃষিজমি, বসতি, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র ইত্যাদি চিহ্নিতকরণে এই সফট্ওয়্যার অধিক উপযোগী।
বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে GIS ব্যবহৃত হচ্ছে। দুর্যোগের মাত্রা ও মানচিত্রায়নে GIS ভূমিকা পালন করে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে পানির অবস্থান, গুণগত মান ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহের জন্য GIS ভূমিকা রাখছে। সামরিক ক্ষেত্রে শত্রুর অবস্থান, যোগাযোগ, রসদ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে GIS সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশের অগ্রগতিতে পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা কার্যে GIS এর সঠিক ব্যবহার ভূমিকা পালন করতে পারে।
পরিশেষে বলা যায়, Arc Info বা GIS এর অন্যান্য সফট্ওয়্যার এর সঠিক প্রয়োগ বাংলাদেশের অগ্রগতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৮ সাতক্ষীরায় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পর ঢাকা থেকে সেনাবাহিনী উক্ত এলাকায় যায় এবং এক ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ এলাকার ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নিরূপণ করে সকলের নিকট ত্রাণ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে। ◀ *শিখনফল: ৯ ও ১০*

ক. গ্রাটিকুল কাকে বলে? ১
খ. মানচিত্র অভিক্ষেপের ব্যবহার ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সেনাবাহিনী কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে উক্ত এলাকার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে- ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে উক্ত প্রযুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূগোলককে অক্ষ ও দ্রাঘিমারেখা দ্বারা সৃষ্ট জালের ন্যায় বিন্যস্ত ছককে গ্রাটিকুল বলে।

খ সমগ্র পৃথিবী বা এর কোনো অংশের মানচিত্র আপেক্ষিক সঠিকতার সাথে অঙ্কন করার জন্য মানচিত্র অভিক্ষেপ ব্যবহৃত হয়। গোলাকার পৃথিবী বা এর অংশবিশেষের মানচিত্র সমতল কাগজে অঙ্কন করলে স্থানভেদে আকার ও আয়তন বিকৃত হয়। এ সমস্যা দূরীকরণে নির্দিষ্ট অভিক্ষেপের মাধ্যমে মানচিত্র অঙ্কন করতে হয়। এর ফলে মানচিত্র অঙ্কনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী আকার অথবা আয়তন বজায় রাখা সম্ভব হয়। তাই মানচিত্র অঙ্কনে অভিক্ষেপের ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

গ সেনাবাহিনী GIS প্রযুক্তির মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে।

ভৌগোলিক তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে GIS বলে।

GIS প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো দুর্যোগপ্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণ ও আঞ্চলিকীকরণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নিরূপণ, দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। এজন্য GIS প্রযুক্তির মাধ্যমে সেনাবাহিনী সাতক্ষীরা জেলায় আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং সকলের নিকট ত্রাণ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে।

ঘ উদ্দীপকে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি হলো GIS (Geographical Information Sysem)|

GIS এমন একটি আধুনিক পদ্ধতি যা গৃহ থেকে শুরু করে দেশ পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। এর ব্যবহার বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামের হাট বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে GIS প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। এছাড়া গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ প্রয়োজন। উক্ত বিষয়গুলো পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন করার জন্য জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর। এর মাধ্যমে মানচিত্র অঙ্কন ও পরিকল্পনা করলে সহজেই বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে GIS প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৯ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক রফিককে প্রশ্ন করলেন, মানচিত্র কীভাবে অঙ্কন করা হয়? রফিক বলল, অক্ষ ও দ্রাঘিমারেখাগুলোকে সমতল কাগজে উপস্থাপনের পর মানচিত্র তৈরি করা হয়। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. কানাডাতে প্রথম যে জিআইএস গড়ে তোলা হয়, তার নাম কী ছিল? ১

খ. বাংলাদেশের কোন প্রকল্পে সর্বপ্রথম জিআইএস ব্যবহার করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত পদ্ধতির শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কানাডাতে প্রথম জিআইএস গড়ে তোলা হয়েছিল। এর নাম "Canada Geographic Information System" বা CGIS।

খ ১৯৯০ সালের দিকে বাংলাদেশে জিআইএস-এর আবির্ভাব ঘটে।

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে ISPAN (Irrigation Support Project for Asia and the Near East) ফ্লাড অ্যাকশন প্লান-১৯ (ফ্যাপ-১৯) প্রকল্পে সর্বপ্রথম জিআইএস ব্যবহার করে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ মানচিত্র অভিক্ষেপের শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা করো।

ঘ মানচিত্র অভিক্ষেপের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ১০ ক্লাসে অভিক্ষেপ পড়ানোর সময় শিক্ষক বললেন, ইউরোপ মহাদেশের যুক্তরাজ্য, বুলগেরিয়া, অস্ট্রিয়া, তুর্কেমেনিস্তান, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের মানচিত্র অঙ্কনে একটি অভিক্ষেপ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। তবে কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমারেখা এ অভিক্ষেপে ভালোভাবে অঙ্কন করা যায়। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. আলোক সম্পাত অনুযায়ী অভিক্ষেপ কত প্রকার? ১

খ. সরল বেলনাকার অভিক্ষেপের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত অভিক্ষেপের সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রতিভূ অনুপাত ১ ঃ ১৬৭,০০০,০০০ দ্বারা ১৫° ব্যবধানে অক্ষরেখা দ্বারা অঙ্কিত উদ্দীপকে আলোচিত অভিক্ষেপের অঙ্কন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই প্রকার। যেমন– ত্রিনুপাত ও অচিত্রানুপাত অভিক্ষেপ।

খ সরল বেলনাকার অভিক্ষেপের বৈশিষ্ট্য: ১. অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলোর সব কয়টি সরলরেখা এবং একটি অপরটির সাথে লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে। ২. অক্ষ ও দ্রাঘিমারেখা বরাবর স্কেল সর্বদা ঠিক থাকে এবং সমকোণে ছেদ করে। ৩. অক্ষ ও দ্রাঘিমারেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব বা ব্যবধান সমান।

সরল বেলনাকার অভিক্ষেপের বৈশিষ্ট্যের আলোকে স্পষ্ট যে, এ ধরনের অভিক্ষেপ কেবল নিরক্ষরেখার সন্নিকটস্থ স্বল্প পরিসর স্থানে ব্যবহৃত হয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সরল শাঙ্কব অভিক্ষেপের সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করো।

ঘ প্রতিভূ অনুপাত ১ ঃ ১৬৭,০০০,০০০ দ্বারা ১৫° ব্যবধানে একটি সরল শাঙ্কব অভিক্ষেপের অঙ্কন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করো।